বেলাভূমি

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

রচনাকাল : শ্রাবণ, ১৩৬৭—মাঘ, ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—সমরেশ বসু

মুদ্রাকর :

এম. এম. দত্ত

মা শীতলা কম্পোজিং ওয়াকর্স

৭০, ডবলু. সী. ব্যানার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

করকমলেষু

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থরাজি

পোড়া মাটি ভাঙ্গা ঘর
তোমাকে নমস্কার
এক ভজন রহস্য
মারীচ সংহার
পলাশের রঙ
কুসুমের দিন
নগরনটী
জতুগৃহ
রক্তজবা
তিনকন্যা
মৃত্যুবাণ
পলিমাটি
মানসী তুমি
সন্ধ্যা মালতী
সামনে সমুদ্র নীল
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
সবুজ পাতা লাল ধুলো

উঃ কি বর্ষাই না নেমেছে আজ দু' দিন ধরে এখানে এই কলকাতা শহরে।

সত্যি পাগল করে দেবে এই বর্ষা।

বাড়ির সামনে গলি-পথটায় এক হাঁটু জল নেমেছে সন্ধ্যাবেলাতেই দেখেছি। এতক্ষণে বোধ হয় সামনের গলি পার হয়ে জল ট্রামরাস্তাটাও ভাসিয়ে দিল।

ভুবনবাবুর টিনের চালার উপর একটানা বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, বিচিত্র একটা শব্দ।

আমাদের ঘরের ময়লা ঝাপসা কাচের শার্সির গায়ে বৃষ্টির ধারা গড়িয়ে পড়ছে। রাস্তার ইলেকট্রিকের আলোয় সেই ধারার শেষ প্রান্তে জলের বিন্দুগুলো ঘরে বসে বসে সন্ধ্যাবেলা মনে হচ্ছিল যেন রুপার তারের শেষ প্রান্তে টলটলে মুক্তার মত।

কবিত্ব করে ফেললাম বোধহয় তোমার সেই কবিবন্ধু সুধাকান্তের মত তাই না!

সত্যি, এক-এক সময় ভাবি তোমার সেই বন্ধুর কথা, নিছক পেট চলা ও মাথা গোঁজবার মত সামান্য কটা টাকারও একটা চাকরি চার বছর ঘুরে আজও যোগাড় করতে পারল না, তার কলমে এখনও কবিতা আসে কি করে।

জান প্রবীর, মাত্র দিন সাতেক আগে অফিস থেকে হেঁটে হেঁটে ফিরছি, ধর্মতলা স্ট্রীটে তোমার সেই বন্ধু সুধাকান্তের সঙ্গে দেখা হল।

তোমার সেই কবিবন্ধুই অবিশ্যি প্রথমে আমার নাম ধরে ডেকেছিল, মিতালী দেবী না!

কিন্তু প্রথমটায় কিছুতেই চিনতে পারি নি তোমার সেই বন্ধু ভদ্রলোকটিকে।

আরও রোগা হয়ে গিয়েছে, আরও লম্বা হয়ে গিয়েছে। মাথার চুলগুলো রুক্ষ এলোমেলো। কেবল তার সেই চোখ দুটো আর নাকটা, তার নীচে মেয়েমানুষের মত আশ্চর্য পাতলা দুটো ঠোঁট। সেই বাদামের মত দুটো কালো চোখ, সেই খড়্গের মত খাড়া নাক। সরু চিবুকে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রোমশ দুই যুগ্ম ভ্রূর মাঝখানে লাল সেই জরুল চিহ্নটা যাকে সে নাকি বলত রাজটিকা।

ইচ্ছা হয়েছিল সেদিন তাকে জিজ্ঞাসা করি, আজও কি আপনি আপনার ঐ কপালের চিহ্নটাকে বলেন রাজটিকা।

কিন্তু পারলাম না জিজ্ঞাসা করতে ঐ মুহূর্তে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে।

ময়লা ধুতির উপরে সেই ছেঁড়া শার্টটা! গায়ে ধুলোয় ঢাকা ছেঁড়া স্যাণ্ডেলটা!

কেমন আছেন সুধাকান্তবাবু?

খুব ভাল। যাকে বলে সত্যি ভাল, নির্মম ভাল। হাসতে হাসতে জবাব দিল।

সত্যি, বুঝি না তোমার বন্ধুর কথাগুলো।

কিন্তু সুধাকান্ত বাবুর কথা বলছি, একশো ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি করেও আমারই বা কি এমন উন্নততর অবস্থা।

এক দিন কামাই করেছি বর্ষার অজুহাতে, কিন্তু কাল পৃথিবী ভেসে গেলেও যেতে হবেই, আর বর্ষায় ভিজে ভিজে জুতো জোড়াটার আমার যে অবস্থা হয়েছে। ধ্যাৎ, কি সব লিখছি। তোমাকে চিঠি লিখছি তার মধ্যে জীর্ণ জুতো, তার চাইতে লিখি না কেন :

তিমির দিগ্ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া।

কিংবা সেই যে—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥

শূন্য মন্দিরই বটে।

আড়াইখানাই ঘর। তা ছাড়া কিইবা বলতে পারি। নীচের তলায় অন্ধকার সেই ভাঁড়ার ঘরটা, যত রাজ্যের অকেজো জিনিসপত্রে এবং অগুনতি আরশুলা ও ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে পা দেয় কার সাধ্যি। সংলগ্ন রান্নাঘরটি তো দম বন্ধ করে আনে। বাসোপযোগী মাত্র উপরের তলার এই আড়াইখানা ঘর। এবং সেই আড়াইখানা ঘরের মধ্যে সরকার বাহাদুরের থার্ড ক্লাস কামরার যাত্রীদের মত ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে কাকা, কাকীমা, টেঁপী, মণি, ছেনী, বুলা, আন্না, মানা, নোনাই এবং গোদের উপর বিষফোড়া আমি তৎসহ। ও হরি, তুমি তো আবার শেষোক্ত তিনটির কথা জানই না, দেখও নি।

ওরা হচ্ছে কাকীমার পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

ওদের নামগুলোর অবিশ্যি একটা অর্থ আছে। টেঁপী, মণি, ছেনী ও বুলা পর পর চার মেয়ের পর কাকীমার যখন পঞ্চম বারও মেয়েই হল, দুঃখ করে বললেন কাকীমা, আর না—ওর নাম আন্না রাখ। অর্থাৎ 'আর না'র অপভ্রংশে আন্না।

কিন্তু তবুও পর বৎসরটি যখন ষষ্ঠটিও কন্যাই হল, বললেন, মাগো, আর না। ষষ্ঠী দেবী মানা কর মা।

তাই থেকে হল মানা।

হায় রে, তবু এল সপ্তমা। কাকীমা বললেন, ইংরাজীর নো, বাংলার 'নাই' অর্থাৎ ডবল না—নো-নাই। কিন্তু ভগবান—অবশ্য কাকা-কাকীমার মতে—রেহাই দেন নি বেচারী কাকীমাকে—অষ্টম সন্তান অত্যাসন্ন।

ভাবতে পার প্রবীর এই আড়াইখানা ঘরের মধ্যে কেমন করে ঠিক ঘড়ির কাঁটার মত চলেছে কাকা-কাকীমার সন্তান উৎপাদনের প্যারেড এই এতগুলো মানুষের ভিড়ের মধ্যেও।

মধ্যরাত্রি সত্যিই যাদুকরী।

শোক, তাপ, দুঃখ, বেদনা ও লজ্জা-অপমান হারিণী মধ্যরাত্রি।

অশ্লীল মনে হচ্ছে না?

কিন্তু উপরোক্ত ব্যাপারটার চাইতেও অশ্লীল কি আমার কথাটা!

চোখ কান নাক বুজে তবু এক দিন ফাঁকে বলেছিলাম কাকীমাকে সরকারের বর্তমান ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের কথাটা।

কিন্তু কাকীমা কি বললেন জান!

মুয়ে আগুন, মুয়ে আগুন।

দ্বিতীয় বার একটি শব্দও উচ্চারণ করতে সাহস হয় নি।

পালিয়ে গিয়েছিলাম। কারণ ঠিক কার মুখে আগুন তিনি দিতে চেয়েছিলেন বুঝতে পারিনি, সরকার বাহাদুরের না আমারই।

কিন্তু কাকা-কাকীমা-সংবাদ থাক।

নিজের কথাই বলি। অর্থাৎ মিতালী-সংবাদই বিবৃতি করি।

আগামী শনিবার অর্থাৎ আর তিন দিন পর রামধন মিত্র লেনের ঠিকানা থেকে এক নতুন ঠিকানায় উঠে যাচ্ছি।

ধন্যবাদ সরকার বাহাদুরকে। সরকার বাহাদুর আমাদের মত মেয়েদের, মানে, আজকালকার তথাকথিত স্বাধীন ভারতের অনন্যপন্থা চাকুরীজীবনী অনূঢ়া

মেয়েদের জন্য এক পান্থনিবাস অর্থাৎ মেস বল মেস, বোর্ডিং বল বোর্ডিং, নির্মাণ করে স্বল্প মূল্যে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে আমাদের মুশকিল আসান করেছেন।

অতএব এবার আর কলকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তোমাকে কোন তকলিফ্ পেতে হবে না।

তকলিফ্, কেমন হিন্দি বুলি শিখেছি বল তো।

তকলিফ্, বেয়াকুফ্ বুদ্ধু, আওয়ারা, বাওরা—কত সব নয়া নয়া হিন্দি কথা শিখে ফেলেছি জান।

আর শিখেছি কি করে জান! বোম্বাই আগত হিন্দি পিকচার দেখে দেখে।

দেখ না এবারে যখন লখনউ থেকে তুমি ছুটিতে কলকাতায় আসবে, তোমার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতে বিলকুল তকলিফ্ হবে না। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো, কি হল তোমার কলকাতায় বদলী হয়ে আসার! সেবারে যে লিখেছিলে মাত্র দিন আষ্টেকের মধ্যেই বদলী হয়ে কলকাতায় আসছ। তার পর যে চার মাস উত্তীর্ণ হতে চলল।

একি! উঃ অনেক রাত হয়েছে। ঘড়িতে দেখছি রাত প্রায় দুটো। চিঠি শেষ হবে না আজ আর। অতএব—

হাত বাড়িয়ে শিয়রের উপর একটা খালি ব্রিটানিয়া বিস্কুটের টিনের উপর বসানো প্রবীরেরই তার জন্মদিনে প্রেজেন্ট দেওয়া টেবিল ল্যাম্পটার বোতামটা টিপে আলোটা নিবিয়ে দিল মিতালী।

অন্ধকার নেমে এল ঘরটার মধ্যে। নিঃছিদ্র রূঢ় অন্ধকার।

কিন্তু থেকে থেকে মিষ্টি একটা সুবাস আসছে ঘরের মধ্যে।

অন্ধকারে এদিক ওদিক তাকায় মিতালী।

পরিচিত মিষ্ট গন্ধ এবং অত্যন্ত প্রিয় গন্ধ তার।

ওঃ, মনে পড়ে যায় হঠাৎ মিতালীর, সন্ধ্যাবেলায় একটা লোক ভিজতে ভিজতে তাদের গলিতে এসেছিল রজনীগন্ধার ষ্টিক বিক্রি করতে। বৃষ্টির জন্য বেচারী বিক্রি করতে পারে নি বলেই হয়তো দোরে দোরে ঘুরে বিক্রি করতে বের হয়েছিল বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শেষ পর্যন্ত। খুব সস্তায় তাই পাওয়া গিয়েছিল। মাত্র তিন আনায় দু' ডজন ষ্টিক।

কোন বিলাসিতাই আজ আর মিতালীর বাইশ বছরের জীবনে অবশিষ্ট নেই। কিন্তু এখনও শুভ্র রজনীগন্ধার স্টিক দেখলে, তার মিষ্টি গন্ধটা নাকে এলে কেমন যেন নেশা জাগায় মিতালীর প্রাণে।

ছোট প্লাষ্টিকের ব্যাগটায় পয়সা থাকলে এবং সাধ্যাতীত দাম না হাঁকলে কিনে ফেলে কিছু স্টিক।

তারপর শিয়রের ধারে তার নিজস্ব তাকটায় একটা মুখভাঙা হরলিক্স-এর শিশির মধ্যে জল দিয়ে সেগুলো রেখে দেয় এবং চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত যতক্ষণ না একেবারে শুকিয়ে ঝরে যায় একটার পর একটা ফুল স্টিক থেকে, সযত্নে জল বদলে বদলে সেগুলো বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে।

কাকীমা অবিশ্যি কিছু বলেন না, কিন্তু কাকা মধ্যে মধ্যে বক্রোক্তি করতে ছাড়েন না।

একদা ইকনমিক্স-এর ছাত্র ছিলেন শশিভূষণ চক্রবর্তী—মিতালীর কাকা। বলেন, Wastage of money.

বেচারী শশিভূষণ অবিশ্যি চিরকালই কিন্তু অমনি ছিলেন না। এক সময়ে এক টাকা খরচ করলে যেখানে চলে যায়, সেখানে দশ টাকা খরচ করে ফেলতেন। অর্থাৎ অমিতব্যয়ীই ছিলেন।

অবশ্য ছাত্রজীবনে।

কিন্তু ইকনমিক্স-এ সেকেণ্ড ক্লাস নিয়ে বি. এ. পাশ করার পর এবং বছর তিনেক আপ্রাণ চেষ্টার পর এক বিদেশী সওদাগরী অফিসে আশি টাকা মাইনের চাকরি জুটোবার পরই বিবাহ করে এবং পরবৎসর থেকেই একে একে তিনটি কন্যার পিতৃত্ব চার বৎসরের মধ্যে অর্জন করার পরই কেমন যেন হয়ে গিয়েছেন।

হয়তো এত দিন একদম বানচালই হয়ে যেতেন, যদি না ইতিমধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রী মিতালী বি. এ পাশ করে ঐ চাকরিটা জোটাতে পারত এবং তার আয়ের দুই এর তিন অংশ কাকার সংসারে ব্যয় করত।

মিতালির অবস্থাও তো নান্যপন্থা এবং অকৃতজ্ঞও সে নয়।

মিতালীর মাত্র চার বৎসর বয়সের সময় মণিভূষণ—মিতালীর বাবা আকস্মিক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর মাতা-পুত্রীকে সাদরে শশিভূষণ স্থান তো দিয়েছিলেনই, মিতালীকে লেখাপড়াও শিখিয়েছিলেন।

মিতালীর মা অবিশ্যি বেশীদিন শশিভূষণের ভারস্বরূপ হয়ে থাকেন নি।

মিতালী যেবারে ম্যাট্রিক পাশ করে, সেই বারই দুদিনের জ্বরে মারা যান মিতালীর মা।

কালো মেয়ে মিতালী। তা ছাড়া শশিভূষণেরও অর্থবল ছিল না। তাই বি. এ. পাশ করবার পরও অনেক চেষ্টা করেও পাত্রস্থ করতে পারেন নি মিতালীকে শশিভূষণ। এবং চেষ্টা হয়তো আরও দীর্ঘকাল চালিয়ে যেতেন যদি না মিতালী নিজেই অকস্মাৎ এক দিন বেঁকে দাঁড়াত।

চিরদিনের রাশভারী প্রকৃতির লোক শশিভূষণ। বাড়ির কেউই কখনও তাঁর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বড় একটা সাহস পেত না।

কিন্তু মিতালী সেদিন কাকাকে কথাটা বলতে এতটুকু দ্বিধা করে নি। সোজাসুজিই সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, বিয়ের চেষ্টা তুমি আর করো না কাকা।

দুই ইঞ্চি বাই সাড়ে তিন ইঞ্চি একটা ভাঙা ঝাপসা আর্শি নিয়ে দাড়ি কামাচ্ছিলেন শশিভূষণ।

খুরটা হাতে নিয়ে কামানো বন্ধ করে ভাইঝির মুখের দিকে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দুটো ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন, তার পর বললেন, কেন?

বিয়ে আমি করব না।

করবে না!

না।

বেশ করো না। কিন্তু বিয়ে তো করবে না, তবে করবেটা কি?

চাকরি করব।

বেশ চেষ্টা কর।

ইতিমধ্যে গালটা শুকিয়ে গিয়েছিল, খানিকটা জল দিয়ে দাড়িটা বার কতক ভিজিয়ে নিয়ে খুরটা বাগিয়ে ধরলেন পুনরায় শশিভূষণ।

চেষ্টা অবশ্যই করতে হয়েছিল এবং তার মাস পাঁচেকের মধ্যেই চাকরি একটা জুটে গিয়েছিল মিতালীর।

তারপর প্রথম মাসের মাইনে পঁচাশি টাকার সবটাই যেদিন কাকার হাতে এনে তুলে দিল, শশিভূষণ নোটগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে শুধালেন, কি?

প্রথম মাসের মাইনে পেয়েছি।

তার পরই হঠাৎ শশিভূষণের দু চোখের কোল বেয়ে দু ফোঁটা অশ্রু টপ্ টপ্ করে তাঁর গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়ল।

কিন্তু কোন কথা বললেন না।

সেদিন অফিস থেকে ফেরবার পথে এক টিন মাখন এনে স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে শশিভূষণ বললেন, এটা রাখ—

কি এটা—মাখন?

হ্যাঁ, মিতাকে রোজ ভাতের সঙ্গে দিও আর রামদীন গোয়ালাকে বলে দিয়েছি এক পো করে রোজ দুধ দিতে, ওকে দিও। এ বাড়ির খাওয়া তো মানে পিণ্ডি, ঐ পিণ্ডি গিলে অফিসের খাটুনি খাটতে গেলে মেয়েটার টি. বি. হতে খুব বেশী দেরি হবে না।

শশিভূষণের স্ত্রী সরস্বতী এমনিতে বেশির ভাগ সময়ই শান্ত ও নির্বিকার। এবং সংসারের জোয়ালটা তারই কাঁধে বটে তবে যেমন ভাবে শশিভূষণ দিগ্‌দর্শন করান তেমনি ভাবেই তিনি জোয়াল টেনে চলেন। তবে মধ্যে মধ্যে সেই শান্ত মিতভাষিণী যখন মুখ খোলেন, তখন তাঁর কথার মধ্যে তীক্ষ্ণ হুলের ধার যেন ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে।

স্বামীর কথায় তার মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে সরস্বতী বললেন, তা রাজভোগের ব্যবস্থা করলেই তো রাজভোগ তুলে দিতে পারি সবার মুখে।

শশিভূষণ আর কথা বাড়ান না। কলতলার দিকে এগিয়ে যান।

কারণ জানতেন তিনি, মিতভাষিণী মুখর হলে সহজে তাঁকে নিষ্কৃতি দেবে না।

কিন্তু সরস্বতীরও হৃদয় বলে একটা বস্তু ছিল, তাই সেদিন ঐখানেই চুপ করে গেলেন।

মা-মরা মেয়েটাকে তিনিও ভালবাসতেন।

মিতালীর চাকরি হওয়ায় অবিশ্যি সংসারের কিছুটা সুরাহাই হল।

কিন্তু পরের মাসে যখন মিতালী তার মাইনের দুইএর তিন অংশ কাকার হাতে এনে তুলে দিল শশিভূষণ বললেন তুই আর দশটা টাকা রাখ মিতু।

না, না—যা আমি রেখেছি তাতেই চলে যাবে। মিতালী বলে।

আপত্তি জানিয়ে মিতালী সরে গেল।

শশিভূষণও আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

এমনি করেই পাঁচটা বছর কেটে গেল। মিতালীর মাইনে হল একশ ত্রিশ।

কিন্তু হঠাৎ যেদিন মিতালী এসে জানাল, সরকার থেকে তাদের থাকবার মেসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সামনের মাসেই সেই মেসে চলে যাচ্ছে, শশিভূষনের মুখটা শুকিয়ে গেল।

মিতালী সংসার থেকে চলে যাওয়া মানেই মাসান্তে সংসারে একশটি টাকার ঘাঁকতি। দরিদ্রের সংসারে একশটি টাকার মূল্য অনেকখানি।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে শশিভূষণ যতই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠুন, মুখে কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না। অর্থাৎ কোন কথাই মুখে আসে না।

মিতালী তখন সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, চলে গেলেও মাসে চল্লিশ টাকা করে তোমাকে আমি দেবো কাকা।

কথাটা শশিভূষণের কানে গেল কি গেল না বোঝা গেল না। তিনি কলতলার দিকে পা বাড়িয়েছেন তখন নিঃশব্দে।

মিতালী কথাটা সর্বপ্রথম কাকীমাকে জানাবে ভেবেছিল এবং তা হলে কাকীমার মুখ থেকেই কাকা শুনবেন। কিন্তু কি ভেবে পরে কাকাকেই বললে প্রথমে।

তার পর দিন দুই কেটে গেল কিন্তু কাকা বা কাকীমার দিক থেকে কোন শব্দই পাওয়া গেল না।

মিতালী মনে মনে একটু অস্বস্তিই অনুভব করে কিন্তু কাকা ও কাকীমার দিক থেকে কোনরূপ সাড়া শব্দ না পাওয়ায় সেও শেষ পর্যন্ত চুপ করেই থাকে।

ক্রমশঃ যাওয়ার দিন এগিয়ে আসে।

আর তিন দিন আছে যাওয়ার।

॥ ২ ॥

মণি আর টেঁপীর পাশে কোনমতে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়েছিল মিতালী। কিন্তু ঘুম আর আসে না।

বহুব্যবহৃত মলিন শয্যা থেকে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর গন্ধ অন্ধকার ঘরের গুমোট বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

নাকটা জ্বালা করে। শরীরটা যেন কেমন ঘোলায়।

বিশ্রীভাবে শশিভূষণ নাক ডাকাচ্ছেন পাশের ঘরে।

ক্লান্ত অবসন্ন শশিভূষণ শয্যায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঘুমিয়ে পাথর হয়ে যান।

কাকার কথা চিন্তা করলে আজকাল মধ্যে মধ্যে কেমন যেন একটা বেদনা অনুভব করে মিতালী। পনের-ষোল বছরের আগেকার শশিভূষণের সঙ্গে যেন আজকের শশিভূষণের কোন মিলই কোথাও নেই।

আমূল পরিবর্তন ঘটেছে যেন মানুষটার।

ষোল বছর আগেকার শশিভূষণকে আজ আর বুঝি চেনবারও উপায় নেই।

তাঁর চেহারা কথাবার্তা চালচলন ব্যবহার সব কিছুরই যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে। একেবারে বদলে গিয়েছেন যেন মানুষটা।

প্রবীর বলে, মধ্যবিত্ত পরিবারের এক আজীবন সংগ্রামী সৈনিকের নাকি একটি নিখুঁত ছবি তার কাকা শশিভূষণ। এবং শুধু তার কাকা শশিভূষণই নয়, আজকের দিনে এ দেশের ঘরে ঘরে নাকি অমন অসংখ্য শশিভূষণ আছে। আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, অসহায় ক্লীব কতকগুলো মানুষের মিছিল। সেই মিছিলের মধ্যে গিয়ে আর এক জন হয়ে দাঁড়াতে তাই নাকি প্রবীরের আদৌ কোন ইচ্ছা নেই। অমন করে সে নাকি অপমৃত্যুর অভিশাপের মধ্যে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যেতে পারবে না।

মিতালী জবাবে বলেছিল, তার মানে তুমি ওদের ব্যতিক্রম হতে চাও!

তা যদি বল তাই। সুখে স্বচ্ছন্দে সকলেই কিছু আর জীবনের ঐশ্বর্যকে করায়ত্ত করতে পারে না ঠিকই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে অপমানের মধ্যে, অবক্ষয়ের মধ্যে, নিঃস্বতার মধ্যে মনুষ্যত্বটুকুও বিসর্জন দিতে হবে।

তোমার কথাটা ঠিক আমি বুঝলাম না প্রবীর।

কেন। কোন অস্পষ্টতাই তো নেই আমার কথাগুলোর মধ্যে কোথাও।

তার মানে তুমি কি বলতে চাও প্রবীর, আজকের দিনে মধ্যবিত্ত সংসারের প্রতিটি মানুষের মনুষ্যত্বের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, নিঃস্ব—অপমানিত এবং শুধু ক্ষয়ই হয়ে চলেছে তাদের—

তাই নয় কি। পেট পুরে আহার জোটে না আমাদের, লজ্জা নিবারণের অধিক একখণ্ড বস্ত্র নেই, ছেলেমেয়েদের আমরা মনের মত উপযুক্ত শিক্ষা দিতে

পারি না, রোগে ঔষধ পাই না, চিকিৎসা হয় না, চরম অপমানেও লজ্জাবোধ করি না, মার খেয়ে দেঁতো হাসি হাসি, লজ্জাকর স্তাবকতায় প্রতি মুহূর্তে নিজের সর্বস্ব এতটুকু লাভের আশায় আর এক জনের পায়ের নীচে নামিয়ে আনতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করি না—

কথাগুলো বলতে বলতে যেন একটা অবরুদ্ধ বেদনায় প্রবীরের সমস্ত মুখটা নীলাভ হয়ে উঠেছিল সেদিন। শেষের দিকে গলার স্বরটাও যেন কেমন ধরে এসেছিল।

প্রবীর আরও বলেছিল, এই পরিচয়ের মিথ্যা জের আর আমরা নাই বা টানলাম মিতা।

তবে ?

কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে অতঃপর তাকিয়ে ছিল মিতালী প্রবীরের মুখের দিকে।

তবে আর কি! তার চাইতে যেমন আছি আমরা তেমনিই না হয় থাকলাম—তবু তো একটা সান্ত্বনা থাকবে, একটা প্রত্যাশা নিয়ে না পাওয়ার সংগ্রামটাই চালিয়ে গিয়েছি।

তার পরও প্রশ্ন করেছিল মিতালী, কিন্তু কত দিন ?

যত দিন সম্ভব তত দিন। তার পর যদি কখনও এ সম্পর্ক আমাদের ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়ায়ই, আত্মবিশ্বাসের অভাবে, সংশয়ে থামতে আমাদের বাধা হতে হয়ই, থেমেই না হয় যাব। দুজনা দুজনের কাছ থেকে হাসিমুখে সেদিন বিদায় চেয়ে নেবো। পারবে না বিদায় দিতে সেদিন মিতা ?

কি জানি, জানি না।

মৃদু কণ্ঠে জবাব দিয়েছিল সেদিন মিতালী।

তার পরই যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সত্যিই জানে না মিতালী সেদিনকার প্রবীরের কথার জবাব।

সেদিনও যেমন জবাব খুঁজে পায়নি, আজও তেমনি পায় না।

তবে প্রবীরের আকর্ষণটাও সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

অফিসেই এক দিন বছর পাঁচেক আগে পাশাপাশি টেবিলে কাজ করতে করতে দুজনার মধ্যে আলাপের সূত্রপাত হয়েছিল।

দুজনাই লেজার ডিপার্টমেণ্টের কেরানী তখন।

তবে প্রবীরের চাকরি তার চাকরির বছর তিনেক আগে বলে প্রবীর মাইনে পেত মিতালীর চাইতে টাকা চল্লিশ বেশী।

অফিসের কাজের অভিজ্ঞতা প্রবীরের কাছ থেকে সঞ্চয় করতে করতেই উভয়ের মধ্যে আলাপটা সহকর্মী হিসাবে কেমন করে না জানি ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল।

প্রবীরের ছিল একটা অদ্ভুত আকর্ষণ। তার চেহারায় তো বটেই, চরিত্রেও।

রোগা লম্বা চেহারা। গায়ের বর্ণ কালোই। কিন্তু রোগা চেহারা ও কালো বর্ণের মধ্যেও প্রবীরের মুখের মধ্যে, চোখের মধ্যে ছড়ানো ছিল যেন একটা রূপের আগুন।

তৈলহীন রুক্ষ অযত্নবিন্যস্ত মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। প্রশস্ত ললাটের উপরে সেই চুলের কিছু অংশ সর্বদাই লেপটে থাকত অথবা হাওয়ায় উড়ত। জোড়া ভ্রু। দুটি বড় বড় চোখে যেন অক্লান্ত যুদ্ধবত সৈনিকের আশাদীপ্ত বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি। চোখে কালো মোটা সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা। খড়্গের মত নাকটা। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ ও চিবুক।

পরিধানে থাকত একটা স্ল্যাক্ ও হাফ হাতা সাদা শার্ট। চওড়া কব্জিতে রিস্টওয়াচ। পায়ে সাধারণ একজোড়া চপ্পল।

কি শীত কি গ্রীষ্ম ঐ ছিল প্রবীরের একমাত্র বেশ।

শীতকালে এক দিন শুধিয়েছিল মিতালী একটু যেন ঠাট্টার সুরেই।

ডিসেম্বরের শেষাশেষি সেটা, বাইরে সেদিন প্রচণ্ড শীত পড়েছে।

অফিসের ছুটির পর মিতালী সেদিন খুচরো কয়েকটা নিজের জিনিস কেনবার প্রয়োজন থাকায় ড্যালহাউসি স্কোয়ার থেকে হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রীটে এসেছিল।

সেদিন সঙ্গে প্রবীরও ছিল।

কেনা কাটার পর দু জন গিয়ে ঢুকেছিল ছোট একটা চায়ের রেস্তোরায়।

গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতেই মিতালী কথাটা বলেছিল, আচ্ছা প্রবীর হাতকাটা একটা টুইলের শার্ট গায়ে দিয়ে শীত করে না তোমার?

দু আঙুলের ফাঁকে একটা অর্ধদগ্ধ ক্যাপস্টেন সিগারেট, প্রবীর একটু যেন অন্যমনস্ক হয়েই রেস্তোরাঁর খোলা দরজা পথে বাইরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল।

মিতালীর প্রশ্নে ফিরে তাকাল প্রবীর মিতালীর মুখের দিকে।

কিছু বলছিলে ?

বলছিলাম, আমার গায়ে উলের ব্লাউজ আছে, তার ওপর রয়েছে আলোয়ান, তবু তো শীত করছে। তোমার শীত করে না ?

না।

সত্যিই আশ্চর্য !

আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই !

না। কারণ শীত গ্রীষ্ম বোধের ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষের কিছুটা আরাম-বিলাসের ব্যাপার আর কিছুটা সহ্যশক্তি আর অভ্যাসের ব্যাপার।

আরাম-বিলাসই যদি বল তো জীবন-ধারণের পক্ষে সেটার কি কোনই প্রয়োজন নেই মনে কর ?

প্রয়োজন নেই তা তো বলছি না মিতা—

তবে ?

আমার কাছে আরও অনেক কিছুই আছে যার প্রয়োজন ওই আরামটুকুর চাইতেও ঢের বেশী।

তোমার সব কথাবার্তা, নীতি শুনলে আমার কি মনে হয় জান ?

কি ?

গৃহী না হয়ে তোমার সন্ন্যাসী হওয়াই বোধ হয় উচিত ছিল।

স্বীকার কর আর না কর আজকের দিনে এই যে আমাদের বেঁচে থাকবার প্রচেষ্টা, এটাও তো এক ধরনের সন্ন্যাসই আমরা সকলে পালন করছি মিতা।

এক-এক সময় মনে হয়েছে মিতালীর, কথাগুলো যেন সেদিন একবারে মিথ্যা বলে নি প্রবীর।

তার কথার মধ্যে সত্যিই বুঝি কোন অতিশয়োক্তি ছিল না।

সন্ন্যাসীরই রুক্ষতা, সন্ন্যাসীরই বৈরাগ্য যেন ওর সব কিছুতে।

অথচ আবার ঐ প্রবীরেই যখন সঞ্চয়ের কথা বলেছে, কেমন যেন আশ্চর্য অদ্ভুত মনে হয়েছে মানুষটাকে মিতালীর।

যা আয় করব দুই হাতে তার সবটা ব্যয় করে যাব—সেটা নাকি এক ধরনের চরিত্রহীনতা !

তবু সব কিছু জড়িয়ে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ অনুভব করেছে মিতালী প্রবীরের

প্রতি সেই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই এবং কিছুতেই যেন সে আকর্ষণকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছে কেন এ আকর্ষণ প্রবীরের প্রতি তার।

প্রবীরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে সত্য, কিন্তু এত দিনে এই দীর্ঘ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার মধ্যে দিয়েও কি অন্তত সে বুঝতে পারে নি তাকে, সেই ঘনিষ্ঠতাকে কোন দিনই প্রবীর স্বীকৃতি দেবে না।

কোন দিনই তাকে নিয়ে প্রবীর ঘর বাঁধবে না।

এবং কোন দিনই হয়তো একান্ত আপনার করে তাকে যে পাবে না।

তবু কেন এই অন্ধ আকর্ষণ তার প্রতি। কেন এই অহেতুক কাঙালপনা।

এই যে দীর্ঘ চার বছর প্রবীর কত দূরে চলে গিয়েছে—এই চার বছরে বলতে গেলে প্রতিটি রাত্রেই শয্যায় এসে শুয়ে প্রবীরের কথা তার সুনিশ্চিত ভাবেই মনে পড়েছে, কিন্তু প্রবীরের কি তার কথা তেমনি করে মনে পড়েছে।

নিশ্চয়ই না। সে হলফ্ করে বলতে পারে প্রবীরের তাকে মনে পড়ে নি। এই চার বছরের বিরহবেদনা তার বুকের মধ্যে যেমন করে জমাট বেধে উঠেছে প্রবীরের বুকের মধ্যে তেমনি করে জমাট বেধে উঠেছে কি।

নিশ্চয়ই না।

কে জানে হয়তো তারই মত অন্য কোন এক মিতালী আজ সেই নিষ্ঠুর আত্মসর্বস্ব মানুষটার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং আজ হয়তো তার সঙ্গেই আবার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে, যেমন করে গড়ে উঠেছিল ঘনিষ্ঠতা এক দিন চার বছর আগে তার সঙ্গে।

প্রবীর নিষ্ঠুর।

হৃদয় বলে তার কোন বস্তুই নেই।

হঠাৎ এক সময় মিতালীর খেয়াল হয় অন্ধকারে নিঃশব্দ অশ্রু ফোঁটার পর ফোঁটা তার গণ্ড ও চিবুক ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ছিঃ ছিঃ একি দুর্বলতা মিতালীর!

সে কাঁদছে!

বালিশের তলায় হাতটা রেখে শুয়েছিল মিতালী, হাতটা চোখের জল মুছবে বলে বালিশের তলা থেকে টেনে বের করতে গিয়ে, কিছুক্ষণ আগে লেখা প্যাডের অর্ধসমাপ্ত চিঠিটা হাতে লেগে খস খস করে উঠল।

অন্ধকারেই কি যেন মনে হল মিতালীর, প্যাডটা বের করে লেখা পাতা দুটো প্যাড থেকে ছিঁড়ে নিল।

তার পর অন্ধকারেই বিছানা থেকে উঠে নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে এসে দাঁড়াল,—ঘরের সংলগ্ন ছোট এক চিলতে ছাতটায়।

ইতিমধ্যে কখন এক সময় যেন বৃষ্টি থেমে গিয়েছে।

বর্ষণক্লান্ত আকাশে ভাঙা মেঘের ফাঁকে বাঁকা একফালি চাঁদও উঠেছে।

বিষণ্ণ ম্লান আলোয় জলসিক্ত প্রকৃতি যেন অদ্ভুত স্বপ্নালু মনে হয়।

রেলিংএর সামনে এসে দাঁড়াল মিতালী।

নীচের রাস্তায় তখনও জল জমে আছে।

রাস্তার গ্যাসের আলো সেই জলের বুকে পড়ে থির থির করে কাঁপছে। ঝিরঝিরে ভিজে ভিজে বাতাসে মিতালীর যেন কেমন শীত শীত করে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিতালী, তার পর হাতের চিঠিটা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করল, ঝুঁকে পড়ে ঐ টুক্‌রো টুক্‌রো কাগজগুলো নীচে ফেলে দিল।

কাগজের ছেঁড়া টুক্‌রোগুলো নীচে জলের বুকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে ভাসতে লাগল।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ যেন মিতালীর দু চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসে।

পা বাড়ায় মিতালী ঘরের দিকে।

শয্যায় শুয়ে চোখ বুজল মিতালী।

কাকার নাক ডাকার শব্দটা হঠাৎ যেন মনে হল মিতালীর আর শোনা যাচ্ছে না।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা।

চোখ বুজে অন্ধকারে নিজের মনেই যেন বলতে থাকে মিতালী, আর প্রবীরকে সে চিঠি দেবে না। কোন দিনও না, আর কোন দিনও না।

কিন্তু কথাটা মনে মনে বার দু-একের বেশী বলতে পারল না। তার আগেই কাকার ঘর থেকে কাকীমার গলা—অত্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বরটা ও তাঁর কথাগুলো মিতালীর কানে আসতেই যেন মধ্যরাত্রির অন্ধকারে শয্যায় তাকে একেবারে অসাড় করে দিল।

আঃ কি কর, একটু কি ঘুমোতেও দেবে না?

এক পক্ষেরই কণ্ঠস্বর অন্য পক্ষের কোন সাড়া নেই।

তার পরই শুনতে পেল মিতালী কাকীমা বলছে, মেরে ফেল, আমাকে একেবারে মেরে ফেল, শেষ করে দাও—

স্তব্ধতা, তার পর যেন একটা অখণ্ড স্তব্ধতা।

নিজের অজ্ঞাতেই যেন মিতালীর বোজা চোখের পাতায় অসহায় এক নারীর এবং স্বার্থপর অবিবেচক এক পুরুষের আদিম ও জৈবিক ক্ষুধার্ত চেহারাটা বার বার ভেসে উঠতে থাকে। আর সেই সঙ্গে সমস্ত পুরুষ-জাতটার উপরে একটা আকণ্ঠ ঘৃণায় তার সমস্ত দেহটা পাথর হয়ে যায়।

কিন্তু আশ্চর্য।

পরের দিন সকালে কাকীমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিতালীর যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে ভিজে চুল পিঠের উপরে ছড়িয়ে কাকার কাছে প্রসন্ন মুখেই সেদিনকার বাজারের ফর্দ পেশ করছেন। তাঁর চোখে মুখে কোথায়ও কোন গ্লানি, আক্রোশ, বিরক্তি বা লজ্জার লেশ মাত্রও যেন নেই।

আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর।

স্বামী-সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী।

টুথব্রাশ, তোয়ালে এবং সাবানের বাক্সটা হাতে নিয়ে নীচের কলতলার দিকে পা বাড়াল মিতালী।

অফিসে আজ সে একটু তাড়াতাড়িই যাবে।

একদিন কামাই করেছে অফিসে, কে জানে কতগুলো ফাইল এসে টেবিলের মধ্যে গতকাল জমা হয়েছে। সব ফাইলগুলোই আজ শেষ করতে হবে।

॥ ৩ ॥

তাড়াহুড়ো করে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগেই বের হয়ে পড়ল মিতালী।

ছোট গলিটা পার হয়ে ট্রাম-রাস্তায় পৌঁছে সামনের কমলা ভাণ্ডার স্টেশনারী শপটার ভিতর উঁকি দিল, দোকানের ঘড়িটায় ঠিক সময়টা দেখবার জন্য।

ফুটপাথ থেকেই দোকানের ভিতরে ঘড়িটা দেখা যায়।

ট্রাম-রাস্তায় এসে ঐ ঘড়িটার সময় দেখা অনেক দিনের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়াছে মিতালীর।

বাড়িতে একটি মাত্র ঘড়ি—কাকার পকেটওয়াচটা। ঘড়িটা সাধারণতঃ কাকার জামার পকেটেই থাকে। তাই বাড়িতে যতক্ষণ থাকে সময়টা মোটামুটি একটা আন্দাজেই করে নিতে হয়।

অবিশ্যি তাতে করে বড় একটা মিতালীর ভুল হয় না।

পূবে মিত্তিরদের তিনতলা বাড়িটার ছাতের আলসে ছুঁয়ে ওদের নীচের রান্নাঘরের সামনে এসে যখন রৌদ্রের একটা ফালি পড়ে, মিতালী বুঝতে পারে বেলা তখন আটটা।

অফিসে বেরুবার জন্য এবারে তাকে প্রস্তুত হতে হবে।

রোদটা কয়েক মিনিট পরেই আবার সরে যায়, যাতে করে কোন কোন সময় নজর না রাখলে সময়ের গোলমাল হয়ে যায় মিতালীর।

কিন্তু কেবল অফিসে বেরুবার সময়টাই তো নয়, সময় সঠিক জানবার প্রয়োজন আরও অনেক সময়ই হয়, বিশেষ করে আজ-কালকার দিনে সময়ের প্রয়োজনটা বড় বেশী।

তাই মিতালী কত দিন ভেবেছে একটা ঘড়ি কিনতে পারলে কত সুবিধা হত। কিন্তু মাসান্তে মোট এক শ ত্রিশটি টাকার মাইনে থেকে কাকার হাতে একশটা টাকা তুলে দেবার পর এবং নিজের বাস খরচা, টিফিন খরচা ও অন্যান্য টুকিটাকি খরচা বাদে এই ত্রিশটা টাকা চালিয়ে হাতে যা অবশিষ্ট থাকে—তাও সব মাসে নয় কোন কোন মাসে, সে টাকা দিয়ে আর যাই হোক হাতঘড়ির বিলাসিতার স্বপ্নটা বাতুলতা ছাড়া আর কি।

নিছক বাতুলতা।

মনের মত একটা শাড়ি বা ব্লাউজের কাপড় কিনবারই পয়সা উদ্বৃত্ত থাকে না তা হাতঘড়ি।

মনকে তাই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে মিতালী, কি হবে অতগুলো টাকার ঘড়ির বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে।

সময় জানবার জন্য ঘড়ির কি অভাব ?

সর্বত্রই তো দোকানে, রাস্তায় এদিকে ওদিকে ঘড়ি দেখা যায়।

তবু কখনও মার্কেটে গেলে বিশেষ করে ঘড়ির দোকানগুলোর সামনে ঘড়ি

সাজানো আলো ঝলমল শো-কেসগুলোর দিকে চোখ পড়লে আপনা হতেই যেন তার চলার গতি থেমে গিয়েছে।

দাঁড়িয়ে পড়েছে মিতালী।

শো-কেসের কোন্ ঘড়িটা তার কব্জিতে মানাত ভাল, তারই স্বপ্নে ক্ষণেকের জন্য হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।

তার পর এক সময় খেয়াল হলে হয়তো আপন মনেই মৃদু হেসেছে।

হাতঘড়ির বিলাসিতার স্বপ্ন দেখছে সে।

বিলাসিতা বৈকি। তার পক্ষে চরম বিলাসিতা।

নিদেন পক্ষে একটা মাঝারী ভাল লেডিস্ ঘড়ির দাম এক শ কুড়ি পঁচিশের কম তো নিশ্চয়ই নয়। সে ক্ষেত্রে তার পক্ষে ঘড়িটা নিছক বিলাসিতা ছাড়া আর কি।

ক্ষমতার বাইরে বিলাসিতা চূড়ান্ত মূর্খামি।

শ্লথ অনিচ্ছুক পা দুটোকে টেনে টেনে আবার এগিয়েছে মিতালী।

তবু আশ্চর্য, সেই বিলাসিতারই স্বপ্ন দেখেছে মিতালী যখনই মার্কেটে গিয়েছে।

কেবল কি ঘড়ির বিলাসিতারই স্বপ্ন।

শাড়ির দোকানে আলো-ঝলমল শো-কেসে সাজানো নানা বর্ণের নানা পাড়ের শৌখিন দামী দামী শাড়ি ও ব্লাউজগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়েও কি স্বপ্ন দেখে নি মিতালী।

শহরের সর্বত্র যেন ঘরে ঘরে লোভনীয় বিলাসিতার সব উপকরণ সাজানো। শাড়ি, ব্লাউজ, গহনা, প্রসাধন-দ্রব্য—নারীর দেহকে সুসজ্জিত ও সুশোভন করবার কত না উপকরণ।

অথচ সব তার কাছে স্বপ্ন। সব তার নাগালের বাহিরে।

মনকে যতই সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করুক মিতালী, অসমর্থতার ক্ষোভ কি তার মনে জাগে নি।

মনে কি হয় নি সে আজকের দিনের বঞ্চিতারই এক জন।

কিছুই সে পেল না। ঐশ্বর্যের খুদকুড়োও তার ভাগ্যে জুটল না।

কিন্তু কেন, কেন সে পেল না। কেন সে পাচ্ছে না।

অধিকার তার অন্যের চাইতে কিসে কম।

কে তাকে তার ন্যায্য সহজ প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করল।

প্রবীর বলে, আজকের সমাজ, সমাজব্যবস্থা। অর্থনৈতিক অসাম্য। এই অব্যবস্থা আর অসাম্যের বিরুদ্ধেই তো আমাদের প্রত্যেকের—প্রত্যেক বঞ্চিত, অবহেলিত মধ্যবিত্তের সংগ্রাম।

কথাটা যে একেবারে বোঝে না মিতালী তো নয়, কিন্তু সবটা পরিষ্কার বোঝে না।

সমাজ আর অর্থনীতির ভারী ভারী কথাগুলো এক এক সময় মিতালীর কাছে এমন দুর্বোধ্য ঠেকে, কিছুতেই যেন সেগুলোকে সহজ-বোধগম্য ভাবে গ্রহণ করতে পারে না।

মিতালীর মনে হয়, কি মূল্য আছে ঐ সব নীতির তাদের মত শতকরা নিরানব্বই জন সাধারণ ঘরোয়া মেয়ের কাছে।

তারা বোঝে মোটা সুখ, মোটা স্বাচ্ছন্দ্য।

একটি ঘর, স্বামী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি সংসার।

যে সংসারের সে গৃহিণী, কর্ত্রী।

ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল অন্যান্য দিনের চাইতে আজ প্রায় মিনিট কুড়ি আগেই বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েছে।

একটা বাস এসে দাঁড়াল।

ভিড় আছে বাসে তবে এখনও অফিস-যাত্রীদের সেই প্রাণান্তকর ভিড় শুরু হয় নি।

উঠে পড়ল প্রথম বাসটাতেই মিতালী।

অফিসে এসে যখন পৌছল মিতালী, বেশির ভাগ কর্মচারীই তখন এসে পৌছায় নি, কারণ অফিস শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের তখনও আধ ঘণ্টা প্রায় বাকী।

বিরাট হলঘরটা।

সমস্ত হলঘরটা জুড়েই প্রায় নানা আকারের সব টেবিল ও চেয়ার। টেবিলের উপরে স্তূপীকৃত সব কাগজপত্র।

মিতালীকে অত সকালে অফিসে ঢুকতে দেখে দু-চার জন কর্মচারী যারা এসে পৌছেছিল অথচ কাজকর্ম শুরু করে নি—গল্প করছে, তাদের মধ্যে দু-এক জন চোখ তুলে তাকাল।

মিতালী সোজা এসে নিজের টেবিলটার সামনে চেয়ারটা টেনে বসল।

অফিসের হাফইয়ার্লি ক্লোজিংএর সময় এসে গিয়েছে। কাজের চাপ এ সময়টা একটু বেশীই থাকে।

টেবিলের ডান দিকে যে ফাইগুলো স্তূপীকৃত করা ছিল সেগুলো নাড়াচাড়া করতেই মিতালী দেখল, গোটা পাঁচেক নতুন ফাইল এসে জড়ো হয়েছে তার মধ্যে। এবং তার মধ্যে আবার গোটা দুই ফাইলে ভেরি আর্জেন্ট 'ইয়ার মার্ক' দেওয়া।

তারই একটা টেনে পাতা ওল্টাতে শুরু করে মিতালী।

টেবিলের সামনে এসে ফাইলগুলো নিয়ে বসলেই যেন মিতালী সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যায়। তখন কোন কিছুই যেন আর তার মনে থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে কাজের সময়টা অফিসে যেন মিতালী অন্য এক জগতে চলে যায়। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি হয় তার।

কিন্তু আজ টেবিলের সামনে বসে ফাইলটা খুলে ওল্টাতে ওল্টাতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায় মিতালী।

মনটা যেন ফাইলের মধ্যে কিছুতেই আনতে পারে না।

কাল রাত্রে যে চিঠিটা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল সেই চিঠিটার কথাই মনে পড়তে থাকে।

হঠাৎ চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতেই বা গেল কেন সে।

চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললেই কি সে প্রবীরকে আজ ভুলে যেতে পারবে।

কালকের চিঠিটাই না হয় সে ছিঁড়ে ফেলেছে কিন্তু তার আগের চিঠিগুলো, সে তো একটা-আধটা চিঠি নয়।

গত চার বছরে প্রতি সপ্তাহে একখানা করে চিঠি লিখেছে সে প্রবীরকে। অর্থাৎ মাসে চারখানা চিঠি। গড়ে প্রতি বছরে তা হলে মিতালী আটচল্লিশটা চিঠি তো লিখেছেই প্রবীরকে কমপক্ষে।

সেই আটচল্লিশটা চিঠির মধ্যে কত কথাই তো সে লিখেছে প্রবীরকে। কত কাঙালপনাই না সে চিঠির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ করেছে।

সে চিঠিগুলো কি আর প্রবীর ছিঁড়ে ফেলেছে। তারই মত হয়তো সযত্নে বাণ্ডিল বেঁধে রেখে দিয়েছে।

কে জানে খেয়ালের মাথায় নেশার ঘোরে কি সব সে চিঠিতে লিখেছে।

তার নিজের হাতের জবানবন্দী।

কিরে, আজ এত সকাল সকাল যে?

চিত্রাদির কণ্ঠস্বরে চম্‌কে মুখ তুলে তাকাল মিতালী।

চিত্রা রায় ঐ অফিসেই তার সহকর্মিণী।

পাশাপাশি টেবিলে বসে একই ডিপার্টমেণ্টে তারা আজ দু বছর চাকরি করছে।

চিত্রাদি তার চেয়ারটা টেনে মিতালীর কাছ ঘেঁষে এসে বসল।

ফাইলটা বন্ধ করে রাখল মিতালী। ঘুরে বসল। নিঃশব্দ হাসিতে অভ্যর্থনা জানাল চিত্রাদিকে মিতালী।

কাল আসিস নি কেন রে? চিত্রাদি প্রশ্ন করে।

যা বৃষ্টি।

তা যা বলেছিস। যা বৃষ্টি শুরু হয়েছিল কাল!

কথাটা বলতে বলতে চিত্রাদি হাতের হ্যাণ্ডব্যাগটা খুলে তার মধ্যে যেন কি খুঁজতে থাকে।

প্রায় সাড়ে ছ বছর হল চিত্রাদি ঐ অফিসে চাকরি করছে। বিচিত্র জীবন চিত্রাদির। বয়স প্রায় আটত্রিশ-উনচল্লিশ হবে। কিন্তু দেখলে মনে হবে ত্রিশের কোঠা বুঝি এখনও ছোঁয় নি।

সামান্য একটু মেদবাহুল্য হলেও দেহের গঠন এখনও রীতিমত আটসাঁট। কোথাও বুঝি ভাঙনের ছোঁয়া লাগে নি।

খুব লম্বা না, বেঁটেও না। গায়ের বর্ণ টক্‌টকে গৌর। চোখে-মুখে একটা বালিকাসুলভ চাপল্য। তার উপরে সর্বক্ষণই এক্‌টা খুশী খুশী ভাব।

চিত্রাদির সব কথা জানত না মিতালী অনেক দিন। প্রথম আলাপের পর থেকেই ভাল লেগেছিল চিত্রাদিকে মিতালীর। কেবল মিতালীর কেন, অনেকেরই ভাল লাগে চিত্রাদিকে।

অফিসের মেয়ে কর্মচারী তারা পাঁচ জন—চিত্রাকে নিয়েই। সে নিজে, রমা বোস, মিনতি সরকার ও নন্দিতা সেন।

সকলেরই প্রিয় চিত্রা রায়।

কেবল ওদের মেয়েদেরই নয়, পুরুষ কর্মচারীরাও সকলেই চিত্রা রায়কে ভালবাসে। প্রৌঢ় তরুণ সকলেই। তার মধ্যে আবার বিশেষ জন হচ্ছে রঞ্জিৎ চৌধুরী। একাউণ্টস্ ডিপার্টমেণ্টের রঞ্জিৎ চৌধুরী।

রঞ্জিৎ চৌধুরীর সঙ্গে চিত্রা রায়ের সম্পর্কটা বিশেষ সম্পর্ক। সকলেই অফিসের সেটা জানে। এবং সে সম্পর্কটা যে এক দিন অদূর ভবিষ্যতে বিবাহবন্ধনে

পরিণত হবে তাও জানতে কারও বাকী নেই।

টিফিনের সময় ওরা দু জনে এক সঙ্গে বের হয়ে যায়, আবার অফিসের ছুটির পরও এক সঙ্গেই বের হয়। কোনদিন এক সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে অফিসেও আসে।

ওদের পরস্পরের সম্পর্কটা সকলেই জানে বলে রঞ্জিতের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই চিত্রাকে বৌদি বলেও সম্বোধন করে।

বয়সে কিন্তু রঞ্জিৎ আসলে বছর চার-পাঁচের ছোট চিত্রার থেকে। রঞ্জিৎ দেখতে মোটামুটি ভালই। যদিচ গায়ের রঙটা কালো। রোগা পাতলা চেহারার উপরে বেশ উঁচু লম্বা। শৌখিন প্রকৃতির মানুষ রঞ্জিৎ। সংসারে বিশেষ কোন দায় ঝামেলা নেই। রঞ্জিতের বাপ কোন এক সওদাগরী অফিসে মোটা মাইনের ক্যাশিয়ার ছিলেন। অনেক কাল আগে শিশু বয়সেই রঞ্জিতের মার মৃত্যু হয়েছিল।

রঞ্জিতের বাপ আর দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নি। মোটা মাইনে পেতেন, কিন্তু খরচে বিলাসী ও শৌখিন প্রকৃতির মানুষ হওয়ায় চিরদিন তাঁর যত্র আয় তত্র ব্যয় ছিল। তার উপর শনিবার শনিবার ছিল রেসের নেশা।

একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, শৌখিনভাবে মানুষও করে-ছিলেন, কিন্তু আকস্মিকভাবে এক রাত্রে সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হওয়ার পর দেখা গেল অফিসে তাঁর সিকিউরিটি ডিপোজিটের হাজার ছয়েক টাকা ছাড়া একটি কপর্দকও একমাত্র ছেলের জন্য তিনি রেখে যেতে পারেন নি।

কাজেই বাপের মৃত্যুর পর রঞ্জিৎ বুঝতে পারল বাপের এত কালের এস্টাব-লিশমেন্টটা রাখা তো তার পক্ষে সম্ভব নয়ই—কিছু দিনের মধ্যে একটা চাকরি না জুটিয়ে নিতে পারলে, বাপের মৃত্যুর পর হাতে যে কয়েক হাজার টাকা এসেছে তা দিয়েও দীর্ঘদিন চালান যাবে না।

রঞ্জিৎ তাই সোজা গিয়ে বাপের অফিসের বড় কর্তার সঙ্গেই দেখা করল। সে অফিসে চাকরি হল না বটে, তবে বর্তমান চাকরি সেই বড় কর্তারই সুপারিশে পেয়ে গেল। মাইনে এক শ কুড়ি টাকা।

বাড়ি ছেড়ে দিয়ে হাতের টাকাগুলো একটা ভাল ব্যাংকে জমা দিয়া রঞ্জিৎ বৈঠকখানা রোডে একটা মেস বাড়িতে একটি সিংগল্ সীটের রুমে এসে আশ্রয় নিল।

সামান্য কিছু একান্ত প্রয়োজনীয় ফার্নিচার রেখে বাদবাকী ফার্নিচার রঞ্জিৎ বিক্রি করে দিয়েছিল। সেই ফার্নিচার দিয়েই চিরদিনের শৌখিন প্রকৃতির মানুষ রঞ্জিৎ মনের মত করে ঘরটা সাজিয়ে নিল।

বর্তমানে রঞ্জিতের মাইনে ছ শ হলেও সে সেই মেসের বাসা ছাড়েনি।

একা মানুষ কোন দায় ঝামেলা নেই, যা পেত তাতে করে তার সচ্ছলভাবেই চলে যেত। বিলাসিতাটুকুও সে বজায় রেখেছিল। ভাল সুট, দামী জুতো ছাড়া রঞ্জিৎ কখনও পরে না। তার চেহারায় বেশভূষায় একটা পরিচ্ছন্ন রুচির বিকাশ ছিল।

মধ্যে মধ্যে অফিসের বন্ধু সহকর্মীদের রেস্তোরাঁয় হোটেলে খাওয়াত, সিনেমা দেখাত পকেট থেকে টাকা খরচ করে।

সেই কারণে অফিসে সকলেরই প্রিয় রঞ্জিৎ চৌধুরী।

চিত্রা রায় থাকত শ্যামবাজার অঞ্চলে এক ভদ্রপরিবারের বাসাবাড়ির নীচের তলায় একখানা ঘর নিয়ে। চিত্রা রঞ্জিতের মেসের ঘরে প্রায়ই যেত, কিন্তু রঞ্জিত কখনও চিত্রার বাসায় যেত না।

চিত্রা রায়ের জীবনটা বিচিত্র।

বিবাহিত সে।

স্বামী ছিল, সংসার ছিল, একমাত্র মেয়ে মমতাও ছিল। দীর্ঘ চোদ্দ বছর ঘর করেছে চিত্রা। তারপর নাকি এক দিন স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছে এক রাত্রে। প্রথমে এসে উঠেছিল হোটেলে, সেখান থেকে শ্যামবাজারের ঐ বাড়িতে। ছ বছর পূর্বের সে কাহিনী।

স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘটনাটা ঘটে চিত্রা ঐ অফিসে এসে চাকরি নেওয়ার মাস কয়েক আগে এবং প্রথম দিকে যখন অফিসে চাকরি করতে আসে চিত্রা সেদিন সিঁথিতে ও কপালে এয়োতির চিহ্ন সিঁদুর নিয়েই এসেছিল। তারপর এক বছর বাদে সিঁদুর মুছে ফেলল, হাতের নোয়া ও শাঁখা খুলে ফেলল। অফিসের সহকর্মীরা ও অন্যান্য সকলে কানাঘুষোয় শুনল, স্বামীর সঙ্গে চিত্রার ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে।

কি করে ডিভোর্স হল, কেন হল সেটা অবিশ্যি কেউ জানতে পারল না।

কিছু দিন চিত্রার স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের ব্যাপারটা একটা মুখরোচক সংবাদ হিসাবে সারা অফিসময় গুঞ্জন তুলেছিল তার পর ক্রমশঃ সে গুঞ্জন থিতিয়ে এল। সংবাদটা পুরানো হয়ে গেল। ভুলে গেল সবাই।

তারও অনেক পরে রঞ্জিৎ চৌধুরীর সঙ্গে চিত্রার নামটা জড়িয়ে নতুন কৌতূহলের সৃষ্টি হল। কিন্তু কৌতূহলটা বেশী দিন রইল না। কারণ তাদের

পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে কোন ঢাকাঢাকি বা গোপনতা তারা রাখেনি বলেই হয়তো।

সকলের মত মিতালীও ঐ অফিসে চাকরি করতে এসে ব্যাপারটা জানতে পারে।

তুমিও আসবে না ভেবেছিলে?

চিত্রাদির মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললে মিতালী।

তা-ই, আসব নাই ভেবেছিলাম—

তবে এসেছিলে যে?

সে দুঃখের কথা আর বলিস কেন? অফিসে আসব না ঠিক করে ঐ বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সি নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম চৌধুরীর মেসে। কিন্তু গিয়ে দেখি ঐ বৃষ্টির মধ্যেও সে অফিসে চলে এসেছে।

তাই বুঝি তুমিও অফিসে চলে এলে?

মৃদু হেসে প্রশ্নটা করে মিতালী।

অগত্যা। বেরই হয়েছি যখন—ভাল কথা, তুই এই শনিবারই যাচ্ছিস তো গভর্নমেণ্ট হোস্টেলে?

হ্যাঁ—

ঘর দেখে এসেছিস?

হ্যাঁ।

কোন্ তলায় সীট্ দিল তোকে?

দোতলায়। তুমি কোথায় সীট্ পেলে!

চার তলায়। দশ বার করে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতেই প্রাণান্ত হবে দেখছি।

তা তুমি এক বার হোস্টেল সুপারিনটেনডেণ্ট চারু সিংহীকে বললেই তো পারতে দোতলায় তোমাকে সীট্ দিতে।

বলি নি ভেবেছিস।

তা কি বললেন?

সে মাগীর দেমাকে মাটিতে পা-ই পড়ে না। তবু যদি না বছর দুই আগে—যাক্ গে মরুক গে। কথাটা আর শেষ করে না চিত্রাদি?

মিতালী কৌতূহলে চিত্রার মুখের দিকে তাকায়।

কি বলতে বলতে থেমে গেলে চিত্রাদি?

সে অনেক কেচ্ছা, আর এক দিন বলব।

কি শুনিই না।

কেন, জানিস না! এ-জি-বি'তে ওই চারু সিংহী যখন কাজ করত, ওর ছেলের বয়সী এক ছোকরাকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারিটাই করলে। ছেলেটা শেষ পর্যন্ত সায়ানাইড খেয়ে সুইসাইড করল।

তাই নাকি!

তবে আর বলছি কি?

ইতিমধ্যে অফিসে অনেকেই পৌঁছে গিয়েছে তখন। অফিস রীতিমত সরগরম হয়ে উঠেছে। চিত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, চলি, অনেক কাজ জমে আছে। চিত্রা রায় চলে গেল তার নিজের টেবিলের দিকে।

মিতালীও সামনের ফাইলটা টেনে নিল। কিন্তু ঘণ্টাখানেক তার পর কেটে গেল, মিতালী যেন কিছুতেই কাজে মন বসাতে পারে না।

আকাশটা আবার মেঘলা হয়ে উঠছে। আজও হয়তো বৃষ্টি নামবে। কি বর্ষাই যে এবারে শুরু হয়েছে।

॥ ৪ ॥

বালিগঞ্জের দিকে সি. আই. টি. স্কীমে বিরাট পাঁচতলা একটা বাড়িতে গভর্নমেন্ট অবিবাহিত মেয়ে চাকুরেদের জন্য একটি হোস্টেল খুলছে।

থাকা খাওয়া ও অন্যান্য ব্যবস্থা ভালই। ফোর সীটেড একোমোডেশন থেকে সিংগল্ সীটেড একোমোডেশন পর্যন্ত আছে। দক্ষিণারও অবিশ্যি তারতম্য করা হয়েছে সে কারনে।

বড় ঘরগুলোতে চারটে করে সীট, তার পরের সাইজের ঘরে তিনটে সীট, ডাবল সীট ও ছোট ঘরে একটি সীট।

মাঝখানে বিরাট বাঁধানো উঠান, পূর্বদিকে প্রাচীর সীমানা, অন্য তিন দিকে সব ঘর। তু'দিক দিয়ে তুটো সিঁড়ি চারতলা পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেক মেম্বার বা বোর্ডারের জন্য একটি করে শয্যাশূন্য খাট, একটি আলনা ও একটি সেল্ফ।

বড় ঘরগুলোতে তুটো করে ফ্যান, অন্য ঘরে একটা করে। নীচের তলায়

বিরাট ডাইনিং হল। ভিজিটার্স রুম ও সুপারিনটেনডেন্ট চারু সিংহীর ঘর।

কিচেন ও সারভেণ্ট কোয়ার্টার বাড়ির বাইরে, অবিশ্যি কম্পাউণ্ডের মধ্যেই। হোস্টেলটা একটু ভিতরের দিকে, একেবারে ঠিক রাস্তার উপরে নয়। রাস্তার উপরে কতকগুলো বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ি, তারই পিছনে হোস্টেলটা।

আট জন ভৃত্য, দু জন ঝি, দু জন দারোয়ান, তিন জন রাঁধুনী ও দু জন সুইপার। নতুন তৈরী একেবারে বাড়িটা। এখনও দেওয়াল থেকে চুনের গন্ধ যায় নি, জানালা-দরজার নতুন রঙের গন্ধটা নাকে পাওয়া যায়।

হোস্টেলে উঠে এসে মিতালীর কিন্তু সত্যিই ভাল লাগে। বিরাট বাড়ি, সর্বক্ষণই প্রায় নানারকম কণ্ঠস্বরে গমগম করছে। নানা বয়সী, নানা ধরনের নানা জাতের মেয়ের একটা ভিড়। বাঙালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, উড়িয়া, অ্যাংলো নানা জাতের মেয়ে। বেশির ভাগ মিতালীদের মত চাকুরিজীবিনী হলেও অন্যান্য আরও অনেক মেয়েই সেখানে স্থান পেয়েছে। যেমন বিদেশ থেকে সরকারী বৃত্তি নিয়ে যারা পড়তে বা কিছু টেকনিক্যাল ট্রেনিং নিতে এসেছে তারা এবং কিছু এম, এ, ও ডাক্তার ছাত্রীও স্থান পেয়েছে সেখানে।

মিতালীর ঘরটা দক্ষিণমুখো।

সামনেই চোখে পড়ে অনেকখানি খোলা জমি, তার মধ্যে গোটা দুই বাড়ি হয়েছে, আরও গোটা দুই বাড়ি হচ্ছে। পূবে বস্তি একটা। তারও ওদিকে অনেকটা খোলা মাঠের মত পার হয়ে রেলের লাইন।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ট্রেনের শব্দ শোনা যায়। ছাতে উঠলে তো ট্রেনই দেখা যায়। দূরে দূরে নারকেল গাছ আর তাল গাছ। তার ওদিকে রেলের লাইনের ওপারে কতকগুলো পাকা বাড়ি।

চারদিকে যেন একটা মুক্তির প্রাচুর্য আর আনন্দ।

রামধন মিত্র লেনের সেই আলো-বাতাসহীন স্যাঁতস্যাঁতে ঘুপচি বাড়িটা, ব্যাপ্তি নেই, হাওয়া নেই, রাস্তা নেই, আকাশ নেই, যেন শ্বাস বন্ধ করে আনত।

একঘেয়েমির জড়তায় ভরা ছিল যেন একটা অন্ধকূপের মত।

কত সময় মনে হয়েছে মিতালীর ছুটে বের হয়ে আসে। মনে হয়েছে ওর যেন ও মৃত্যুর নরকে পচে ক্ষয়ে গলে যাচ্ছে।

হোস্টেলে এসে মিতালী যেন সত্যিই বেঁচে গিয়েছে। ডবল সীটেড ঘর পেয়েছিল মিতালী। রুম মেট কৃষ্ণা মৈত্র, এ-জি-বি'তে কাজ করে। মিতালীর বয়সীই হবে।

না। এই হোস্টেলে নিশ্চয়ই কেউ সেতার বাজাচ্ছে।

হ্যাঁ, এই দোতলায় আমাদের একখানা ঘরের পরের ঘরেই বার নম্বর ঘরে।

বার নম্বর ঘরে কারা থাকে ?

রাণুদি। একা সিংগল্ সীটেড রুম নিয়ে থাকে। চমৎকার সেতার বাজায়। আর এই বাগেশ্রী রাগটা আমার এত ভাল লাগে।

বাগেশ্রীই তো বটে।

কৃষ্ণার কথায় সুরটা মনে পড়ে যায় মিতালীর। চেনা সুর বাগেশ্রী, তবু যেন কিছুতেই মনে পড়েও পড়ছিল না এতক্ষণ।

আবার চুপচাপ।

কারও চোখেই ঘুম নেই। দু জনেই অন্ধকারে শুয়ে যেন কান পেতে শুনছে সেতারে বাগেশ্রীর আলাপ।

কৃষ্ণা—

কি ?

কোন্ মেয়েটি বল তো তোমার রাণুদি ? আজ ডাইনিং হলে দেখেছি তাকে ?

না দেখ নি। রাণুদি তো রাত্রে খায় না।

খায় না মানে !

এক বেলা খায়, তাও নিরামিষ।

কেন ? বিধবা বুঝি ?

বিয়েই করে নি তা বিধবা। মৃদু হাসির সঙ্গে কথাটা বলে কৃষ্ণা।

ওঃ বিয়েই করে নি বুঝি ?

না।

কি করে কি ?

গভর্ণমেণ্ট গালর্স কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপিকা।

আরও অনেক দিন পরে জেনেছিল রাণু সেনের কাহিনী মিতালী।

রাণু সেনকে দেখেছিল অবিশ্যি পরের দিনই খুব ভোরে হোস্টেলের বারান্দায়। রাত থাকতেই চিরকাল শয্যা ত্যাগ করা অভ্যাস মিতালীর। হোস্টেলেও সেদিন প্রথম প্রথম ঘুমটা খুব ভোরেই ভেঙেছিল।

হোস্টেলের কেউ তখনও জাগে নি। সব ঘরেই তখনও দরজা বন্ধ।

শেষরাত্রির আবছা আলো ছায়ায় যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল সমস্ত হোস্টেলটা।

সিঁড়ি দিয়ে সোজা ছাতে চলে গিয়েছিল মিতালী। দূরে রেল লাইনের ধারে ধারে নারকেল গাছগুলি তখনও আবছা আবছা।

পূব আকাশটা একটু একটু করে তখন বুঝি সবে ফর্সা হচ্ছে।

প্রথমটায় নজরে পড়ে নি মিতালীর।

ছাতের আলিসার একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল রাণু সেন। হোস্টেলের সকলের রাণুদি।

সাদা ধুতি পরিধানে। মাথার তৈলহীন রুক্ষ কেশ তার সারা পিঠ ব্যেপে ছিল! রুক্ষ মাথার কেশ হাওয়ায় উড়ছিল।

ক্রমশঃ আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে তখন। চারিদিকে আবছা ভাবটা কেটে গিয়ে যেন আরও কিছু ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পূব আকাশে একটা লালচে ছোপ ধরে।

ক্রমে সূর্যোদয় হল!

লাল থালার মত সূর্য আকাশে দেখা দিল। ছাতের আলসে ঘেঁষে যে মূর্তি এতক্ষণ প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে ছিল সেই মূর্তি যেন নড়ে উঠল, দুটি হাত তুলে নবোদিত রক্তিম সূর্যকে প্রণাম জানাল।

গুন গুন কণ্ঠে সূর্যস্তব কানে আসে মিতালীর।

নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ-সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে।
ইদম্ অর্ঘ্যং নমঃ শ্রীভগবতে সূর্যনারায়ণায় নমঃ।
জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

হাত জোড় করে আবার প্রণাম জানিয়ে ঘুরে ছাত থেকে যখন চলে যাচ্ছিল রাণুদি—সর্বপ্রথম সেই দিনই রাণুদিকে মিতালী দেখে।

কোন মানুষের গাত্রবর্ণ যে অমন শ্বেতশুভ্র হতে পারে মিতালীর বুঝি তা জানা ছিল না, বিশেষ করে কোন ভারতীয় মেয়ের!

রোগা লম্বা চেহারা। নিরাভরণ দুটি শঙ্খধবল হাত। পরিধানে শুভ্র ধুতি।

বাঙালীর মত পরিধানে শাড়ি না থাকলে এবং পূর্ব থেকে বাঙালী মেয়ে বলে জানা না থাকলে ইংরেজের মেয়ে বলে ভুল করাটা বিচিত্র নয়, কিন্তু মিতালীর মত হোস্টেলের প্রায় কেউই জানত না, আসলে রাণু সেনের দেহে ছিল সাগরপারের এক আইরিশ মেয়ের রক্ত। বাঙালী বাপের রোগা লম্বা চেহারা ও

আইরিশ মায়ের দেহের রঙ পেয়েছিল জন্মস্বত্ব রাণু সেন। কিন্তু সে অন্য কাহিনী।

সেদিন মিতালীর ছাতে রাণুদিকে দেখে মনে হয়েছিল যেন জীবন্ত কোন বিষাদের মূর্তি তার অল্প দূর দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

চলে গেল রাণুদি। একটি বারের জন্যও এদিক ওদিক কোন দিকেই তাকাল না। পায়ে বোধ হয় ছিল ঘাসের চপ্পল।

তার পরও আরও অনেক দিন দেখেছে মিতালী দূর থেকে রাণুদিকে ঐ হোস্টেলে, কিন্তু কথা বলতে বা সামনে কখনও এগিয়ে যেতে সাহস হয় নি।

জগতে এমন এক-এক জন থাকে যার কাছে সকলেই শ্রদ্ধায় আপনা হতে যেন মাথা নত করে। রাণুদিও ছিল সেই জাতের।

হোস্টেলের প্রায় দেড় শত মেয়ের মধ্যে একক অনন্যা, কারও সঙ্গে কথা বলে না রাণুদি। কারও সঙ্গে মেশে না। কারও ঘরে যায় না।

॥ ৫ ॥

কোন এক মন্ত্রীর অকাল মৃত্যুতে সেদিন বেলা তিনটে নাগাদ অফিস ছুটি হয়ে গিয়েছিল।

আগের দিন মাইনে পাওয়া গিয়েছে। মিতালী ভেবেছিল হোস্টেলে গিয়ে জামা-কাপড়টা বদলে রামধন মিত্র লেনে যাবে। যে টাকাটা কাকাকে প্রতিমাসে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল সেই টাকাকা গিয়ে দিয়ে আসবে।

কিন্তু হোস্টেলে ফিরে তখুনি আর বেরুতে ইচ্ছা হল না। কেমন যেন আলসেমি লাগছিল।

জামা-কাপড়ও ছাড়া হয় না, মিতালী শয্যার উপরে শুয়ে পড়ে। থাক গে, বিকেলে যাওয়া যাবে'খন।

বোজা চোখের পাতায় বোধ হয় একটু তন্দ্রা মত এসে গিয়েছিল। চিত্রার কণ্ঠস্বরে চোখ মেলে তাকাল-মিতালী।

ঘুমোলি নাকি মিতা?

কে, ও চিত্রাদি। না, এমনিই একটু চোখ বুজে ছিলাম।

অফিসের ঠিকানায় তোর একটা চিঠি এসেছিল, নে—বলতে বলতে হাতে ধরা পুরু খামের একটা চিঠি এগিয়ে দেয় চিত্রা মিতালীর দিকে।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে চিঠির লেখাটার উপর বারেক মাত্র তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে কষ্ট হয় না মিতালীর, কার চিঠি।

চিত্রার ওষ্ঠের প্রান্তে বিচিত্র হাসি, কার চিঠি রে? প্রবীরবাবুর বুঝি?

না।

প্রবীরের নয়! আমি তো ভেবেছিলাম বুঝি তারই।

না। বোধ হয় করণ সিংয়ের চিঠি।

করণ সিং। সে আবার কে? ক' ঘাটের জল খাচ্ছিস এক সঙ্গে রে? খা বাবা, খা। ছেলেরাই যদি একসঙ্গে দশ ঘাটের জল খেতে পারে তো মেয়েরাই বা বাদ যাবে কেন?

কথাটা বলে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল চিত্রা।

কিন্তু মিতালী তখন ভাবছিল সম্পূর্ণ অন্য কথা।

যে চিঠিটা এই মাত্র চিত্রা তার হাতে পৌঁছে দিয়ে গেল সেই চিঠির প্রেরক ও লেখক করণ সিংয়ের কথাই ভাবছিল।

আশ্চর্য কাঙালপনা মানুষটার, আর কি অসীমই না ধৈর্য্য। আজ নিয়ে বোধ হয় গত এক মাসে দশ-পনেরোখানা চিঠি লিখল তাকে। প্রথম চিঠিখানা খুলে পড়েছিল মিতালী, কিন্তু তার পরের আর একখানাও চিঠিও পড়া তো দূরে থাক খোলে নি পর্যন্ত।

খাম সমেত ছিঁড়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে পুড়িয়ে ফেলেছে।

ওদেরই অফিসে একাউন্টস্ সেকশনে মাস দুই হল নতুন চাকরি নিয়ে এসেছে করণ সিং। সাজ-পোশাকের জাঁকজমক আছে। এবং যে ধরনের সাজ-পোশাক সে করে তাতে করে স্পষ্টই বোঝা যায় সেটা তার অফিস থেকে যা মাইনে পায় তাতে কুলোয় না। বাড়ির অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল।

কিন্তু আর না, একটা মাস ধরে মুখ বুজে সে অনেক সহ্য করেছে, এবারে সত্যিই একটা পরিসমাপ্তির প্রয়োজন।

কারণ চিঠির পর চিঠি পেয়েও এইভাবে চুপ করে থাকার মধ্যে স্পষ্টই আর এক ধরনের প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত থেকে যায়। কালই মিতালী অফিসের ছুটির পর এর একটা হেস্তনেস্ত করবে।

এত দিন চুপ করে ছিল, ভেবেছিল চিঠির জবাব না পেলে আপনা থেকেই

হয়তো উৎসাহ ঝিমিয়ে আসবে, কিন্তু তার যখন কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, মীমাংসার অন্য পথ নেওয়া ব্যতীত আর উপায়ই বা কি।

চিঠিটা এক পাশে ফেলে রেখেছিল মিতালী। উঠে বসতে গিয়ে চিঠিটা আবার হাতে ঠেকল। নিজের অজ্ঞাতেই যেন চিঠিটা হাতে করে তুলে নিল।

প্রথম চিঠি ছাড়া আর পরবর্তী একখানি চিঠিও পড়েনি বটে মিতালী, তবু গণনায় তার ভুল হয় না—পনের নম্বর চিঠি এটা। আশ্চর্য অধ্যবসায় কিন্তু মানুষটার।

একটা চিঠিরও জবাব পাচ্ছে না, তবু ঠিক চিঠির পর চিঠি দিয়ে যাচ্ছে। হয়তো এই চিঠির মধ্যেও সেই একই অনুনয়ের পুনরাবৃত্তি।

আপনার সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই। আপনাকে আমার ভাল লাগে, এত ভাল লাগে যে, সে কথা চিঠিতে, ভাষায় প্রকাশে আমি অক্ষম।

মনে মনে হাসল মিতালী।

পুরুষদের যাবতীয় শোনা কাহিনীর সেই একঘেয়ে কাঙালপনার পুনরাবৃত্তি। আশ্চর্য! ওরা কি ভাবে মেয়েদের। তাদের মত বুঝি দেখলেই প্রেমে পড়ে যায়। প্রেমে পড়ার ব্যাপারটা কি এতই সহজ! এতই সুলভ!

অন্যমনস্ক ভাবেই কখন এক সময় যে চিঠিটা খাম ছিঁড়ে বের করে চোখের সামনে মেলে ধরেছে, মিতালী নিজেও জানতে পারে নি।

কিন্তু একি! চমকে ওঠে মিতালী, এ তো করণ সিংয়ের চিঠি নয়।

এ যে প্রবীরেরই চিঠি।

গত এক মাস ধরে প্রবীরকে সে কোন চিঠিই দেয়নি। তবে কি আগের চিঠিগুলো সব প্রবীরেরই চিঠি ছিল, করণ সিংয়ের লেখা চিঠি ভেবে ভুল করে সব পুড়িয়ে ফেলেছে।

আপসোস হয় মিতালীর কিন্তু চিঠিটা পড়তে গিয়ে তার ভুল ভেঙ্গে যায়।

ইতিমধ্যে প্রবীর আর তাকে চিঠি দেয় নি।

প্রবীর লিখেছে!

কি ব্যাপার বল তো, গত একটা মাস একখানা চিঠি দাও নি কেন! একেবারে চুপ কেন! আমিও অবিশ্যি চিঠি দিতে পারিনি, কারণ এখানে ছিলাম না। দিল্লীতে ট্রেনিংয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে ঐ মাসটা কাজের চাপ এত ছিল যে একটা চিঠি লেখবার মতও সময় পাই নি। কিন্তু তা হলেও সত্যি বলছি তোমার চিঠি আশা করেছিলাম।

মিতালী মনে মনে ভাবে, আশা করে ছিলে আমার চিঠির। কিন্তু কেন? তুমি কি ভাবো চিরকালটা হ্যাংলার মত আমিই তোমার পিছনে ছুটব।

চিঠির বাকী অংশটা আর পড়ল না মিতালী, দলামোচা করে চিঠিটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এবং ফেলে দিয়েই উঠে দাঁড়াল। বেলা চারটে বাজে প্রায়। এখন বেরুলে শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জে ফিরতে ফিরতে সেই রাত দশটা বেজে যাবে। হাত মুখ ধোয়ার জন্য, টেবিল থেকে সাবানের বাক্সটা তুলে নিয়ে ও আলনা থেকে তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল মিতালী।

ঢং ঢং করে হোস্টেলের ডাইনিং হলের ঘণ্টা পড়ল।

হোস্টেলের টী-টাইম।

ঘরের মধ্যে একটা চিঠি হাতে করে শয্যার উপরে অন্যমনস্কভাবে বসে ছিল চিত্রা।

তার এক পূর্ববান্ধবী, অমিয়া চ্যাটার্জী চিঠি দিয়েছে।

সেদিন রাস্তায় মনোতোষবাবুর সঙ্গে দেখা হল চিত্রা। সত্যিই ভদ্রলোককে আজ আর যেন চেনাই যায় না।

কি বিশ্রী রোগা হয়ে গিয়েছেন। গালদুটো ভেঙে গিয়েছে। ঘাড়ের ও রগের সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। চিরকেলে সেই লম্বা মানুষটা, আগে দেখেছি কেমন সিধে হয়ে চলতেন, এখন যেন কুঁজো হয়ে গিয়েছেন। আমি তো প্রথমটায় মনোতোষবাবুকে দেখে চিনতেই পারি নি।

ভদ্রলোক যে তোর উপরে কতখানি নির্ভরশীল ছিলেন এখন দেখলে বোঝা যায়। কি হয়েছিল তোদের জানি না। জানবার ইচ্ছাও নেই, জানতে চাইও না। কিন্তু তবু বলব এইভাবে তোদের পৃথক হয়ে যাওয়া ছাড়া কি সত্যিই আর কোন পথ ছিল না। যদি কোন মতের অমিল বা কলহের জন্য তোরা পরস্পরের থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে থাকিস তো বলব, সংসারে থাকতে গেলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন্ ঘরে না মতের অমিল হয়, কোন্ ঘরে না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ হয়। তাই বলে সেটাই হবে অবিসংবাদী ভাবে সত্যি আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা হয়ে যাবে মিথ্যে।

জানি না স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স করে গিয়ে তুই সুখী হতে পেরেছিস কিনা, কিন্তু মনোতোষবাবু সে সুখী হতে পারেন নি, কথাটা আমি হলপ করে বলতে পারি। তা ছাড়া এই যে চাকরি করছিস দশটা-পাঁচটা, কোথায় কোন্

আত্মীয়বান্ধবহীন মেসে বা হোস্টেলে পড়ে আছিস এর মধ্যে সত্যি করে বল তো, তুইই কি কোন সুখ পেয়েছিস বা পাচ্ছিস ?

কথায় কথায় মনোতোষবাবু বললেন, তোর মেয়ে অনীতা নাকি এবারে থার্ড ইয়ারে উঠল। লেখাপড়ায় নাকি খুব ভাল হয়েছে।

কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করতে বললেন, কলকাতার বাসা নাকি তুলে দিয়ে এখন গিয়ে আগরপাড়ায় আছেন।

অনীতা আগরপাড়া থেকেই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলেজ করে।

ভারী দেখতে ইচ্ছা হয় তোর সেই ফুলের মত মেয়ে অনীতাকে আজ। সেই ছয়-সাত বছরের মেয়ে অনু—অনীতা আজ কত বড় হয়েছে! কলেজে পড়ছে!

অন্যমনস্ক হয়ে যায় চিত্রা অনীতার কথা ভাবতে গিয়ে।

সুন্দর সে দেখতে হয়েছে নিশ্চয়ই। কত বছর বয়স হল অনীতার। আঠের পার হয়ে এবারে উনিশে পড়বে। সে সময় ক্লাস এইটে পড়ত অনীতা। বার বছর বয়স তখন, তারই মত মাথার ঘন লম্বা চুল হয়েছে অনীতার। সাদা রিবন দিয়ে হর্সটেল করে চুল বাঁধলে চমৎকার দেখাত অনীতাকে।

প্রথম বিভাগে অনীতা ম্যাট্রিক পাশ করেছিল সংবাদ নিয়ে জেনেছিল চিত্রা; কিন্তু তার পর কোন্ কলেজ থেকে যে আই. এসসি পাশ করেছে জানে না। আই. এসসি পাশ করে ডাক্তারি পড়বার ইচ্ছা ছিল অনীতার। কত দিন তাকে সে বলেছে।

বলেছে, মা, আমি কিন্তু ডাক্তারি পড়ব।

বেশ তো। চিত্রা বলেছে।

বেশ তো নয়। তখন কিন্তু বাধা দিতে পারবে না।

না, না—আগে ম্যাট্রিক পাশ কর, আই. এসসি পাশ কর তার পর তো ডাক্তারি পড়বি।

যত আদর আব্দার ছিল অনীতার তার মায়ের কাছেই। এমন কি রাত্রে এক শয্যায় চিত্রার গলা জড়িয়ে ধরে না শুলে ঘুমই হত না।

ছ বছর হয়ে গিয়েছে। একটা-আধটা দিন নয়, দীর্ঘ ছ-ছটা বছর। এই ছ বছর অনীতাকে সে চোখের দেখাও দেখে নি। যেদিন রাত্রে বাড়ি ছেড়ে চলে আসে শুধু তার বাপের দেওয়া গয়নাগুলো সুটকেসে ভরে নিয়ে এক কাপড়ে, সেদিন অনীতা তখনও বাড়িতে ফেরে নি।

তার এক বান্ধবীর জন্মদিনের উৎসবে টালায় গিয়েছিল। বান্ধবীই তার বাড়ির গাড়ি নিয়ে এসে তুলে নিয়ে গিয়েছিল অনীতাকে। বলে গিয়েছিল রাত দশটার পর ফিরিয়ে দিয়ে যাবে গাড়িতে করেই।

কিন্তু রাত দশটার অনেক আগেই, রাত পৌনে নটা নাগাদ সে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল। এসে সোজা উঠেছিল শিয়ালদহের এক হোটেলে।

অনীতা তো জানে না, অনেক চেষ্টা করেছিল সে মনোতোষকে নিয়ে সুখী হতে।

বাপ যার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই স্বামীরই ঘর করতে, তাকে নিয়ে সুখী হতে। সে বলে তবু দীর্ঘ তের বছর ঐ স্বামীকে নিয়ে ঘর করেছে। সংসারধর্ম, স্ত্রীর ধর্ম পালন করবার চেষ্টা করেছে।

উঃ ভাগ্য ভাল যে মনোতোষের দুরারোগ্য যৌন ব্যাধি তার বা তার একমাত্র কন্যার দেহে সংক্রামিত হয় নি। রূপ ছিল তার দেহ ভরা আর বাবার পয়সাও ছিল প্রচুর, তাই ধনী বাপের একমাত্র শিক্ষিত পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল।

কিন্তু ধনীর সেই একমাত্র শিক্ষিত পুত্রের যে সবটাই ফাঁকি সেটাই সেদিন সে বা তার বাপ জানতে পারে নি। একমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ এম. এ ফাস্ট ক্লাস ডিগ্রীটাই ছিল। বসত-বাড়িটা ও বড়বাজারের ব্যবসা তখন দেনার দায়ে এক মহাজনের কাছে বন্ধক। ব্যাপারটা প্রকাশ পেল বিবাহের বৎসর খানেকের মধ্যেই। অনীতা তখন গর্ভে। আসন্নপ্রসবা সে। হঠাৎ এক রাত্রে মনোতোষের বাবা মারা গেলেন করোনারী অ্যাটাকে।

তার পরই সব প্রকাশ পেল। এক মাসের অনীতাকে নিয়ে বসত-বাড়ি ও ব্যবসা সেই মহাজনের হাতে তুলে দিয়ে সব ধার-দেনা শোধ করে একপ্রকার কপর্দকহীন অবস্থাতেই ভাড়াটে বাড়িতে এসে উঠল ওরা।

ভাগ্যে ডিগ্রীটা ছিল, তাই মাসখানেকের মধ্যেই একটা ভাল মাইনের চাকরি জুটিয়ে নিতে পেয়েছিল মনোতোষ। কিন্তু তার পর বছরও ঘুরল না, দেহমধ্যস্থিত পুরাতন যৌন ব্যাধি মনোতোষের দেহে চরম প্রতিশোধ নিল, তার পৌরুষকে চিরদিনের মত গ্রাস করে। সে কথা তো কেউ জানে নি। কাউকে বলতেও পারে নি চিত্রা।

দীর্ঘ দশ বছর তার পর তাকে বেদনা আর চরম হাহাকার নিয়ে কাটতে

হয়েছে। তার সেদিনকার সেই দুঃখের ইতিহাসের একমাত্র সাক্ষী সে নিজে তার অন্তর্যামী।

ঐ সময় তাদের পাশের বাড়িতেই প্রায় বলতে গেলে থাকত রঞ্জিৎ চৌধুরী। রঞ্জিতের শোবার ঘরটা তাদের দোতলার শোবার ঘর থেকে স্পষ্ট সবটাই দেখা যেত। রঞ্জিৎ তাকে তার ঘর থেকে জানালা-পথে কত দিন দেখেছে কত ভাবে কত বার দিনের পর দিন, আর সেও দেখেছে রঞ্জিৎকে।

শেষের দিকে সর্বক্ষণ বাড়িতে টিকতে না পেরে মধ্যে মধ্যে চিত্রা রাত্রের শো'তে বা সন্ধ্যার শো'তে একা একা সিনেমায় যেত। সেই সিনেমাতেই এক দিন ঘটনাচক্রে দু জনের পাশাপাশি সীট পড়ে এবং সেই দিনই প্রথম আলাপ-পরিচয়। সেই পরিচয়ই দুই বৎসরে পরবর্তীকালে নিবিড় ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি করে।

দেখা হত দু জনায় কখনও পার্কে, কখনও রেস্তোরাঁয়, কখনও হোটেলে, কখনও গঙ্গার ধারে, ময়দানে, কখনও বা রাত্রের সিনেমায়। ইতিমধ্যে রঞ্জিতের বাপ মারা গেলেন। বাড়ি ছেড়ে রঞ্জিৎ উঠে চলে গেল মেসে বৈঠকখানা রোডে।

তখন থেকে প্রায়ই চিত্রা রঞ্জিতের মেসের ঘরেই যেত। রঞ্জিৎই তো তাকে দিয়েছে নতুন এক জীবনের আস্বাদ। ভুলিয়েছে তার ঘর, স্বামী, সমাজ, সংস্কার —এমন কি একমাত্র সন্তান অনীতাকেও।

অনেক দিন ব্যাপারটা মনোতোষ জানতে পারে নি। কারণ সর্বক্ষণই সে তার ব্যর্থতা ও লজ্জায় স্ত্রী চিত্রার কাছে যেন ছোট হয়েই থাকত। স্ত্রীর অবাধ গতিবিধিতে যে কিছুটা প্রশ্রয় দিয়েছিল সেও ঐ একই কারণে। তা ছাড়া অগাধ বিশ্বাস ছিল চিত্রার প্রতি তার।

তাই চিত্রার সেই পদস্খলনের, তার উচ্ছৃঙ্খলতার কথা প্রথম যেদিন জানতে পারল, বেদনায় যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারে নি। সে রাত্রে ব্যাপারটা ঘটেছিল তাদেরই ঘরে। তারই শোবার ঘরে।

অনীতা গিয়েছে বান্ধবীর জন্মতিথিতে টালায়, রাত দশটার আগে ফিরবে না, মনোতোষেরও অফিস-কর্মীদের দমদমায় একটা বাগানপার্টি ছিল, ফিরবার কথা ছিল অনেক রাত্রে।

সামনের পোস্ট অফিস থেকে পাবলিক ফোন থেকে ফোন করে সে দিন তার নিজের ঘরে রঞ্জিৎকে ডেকে নিয়ে এসেছিল চিত্রাই। কিন্তু সেই জমাট ঘনিষ্ঠতার মধ্যে অকস্মাৎ যে রাত সাড়ে আটটার মধ্যেই অসময়ে মনোতোষ এসে দাঁড়াবে, চিত্রার কল্পনাতীতই ছিল।

রঞ্জিৎ অবিশ্যি মনোতোষকে সামনে দেখে লজ্জায় মাথা নীচু করে কোনমতে সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছিল। কিন্তু চিত্রা পালাতে পারে নি এবং স্বামীর মুখোমুখিই সে রাত্রে দাঁড়াতে হয়েছিল চিত্রাকে জবাবদিহি দেবার জন্য।

কিন্তু আশ্চর্য, মনোতোষ কোন জবাবদিহি চায় নি স্ত্রীর কাছে। অনেকক্ষণ বোবা হয়ে থাকবার পর শুধু দুটি কথাই বলেছিল, প্রথম কথা, যা আমার কানে এসেছে তা হলে তা সত্যি চিত্রা!

তার পর কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি করে মনোতোষ।

মাথার মধ্যে একটা অবোধ্য যন্ত্রণা যেন ছুঁচ বিঁধোচ্ছিল।

চিত্রার ততক্ষণে সমস্ত লজ্জা আর দ্বিধা কেটে গিয়েছে। লজ্জার বালাই ততক্ষণেই থাকে যতক্ষণ আড়াল থাকে, গোপন থাকে। কিন্তু সে আড়াল বা গোপনতার প্রাচীরটুকু যখন ধ্বসে যায় তখন বোধ হয় সেই বালাইটুকু খোয়াবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মরীয়া, বেপরোয়া হয়ে ওঠে। চিত্রারও মনের অবস্থা তখন ঠিক তাই। তা ছাড়া তার বুঝি ফেরবার সত্যিই কোন আর উপায় ছিল না সেদিন। শেষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছিল সে। তাই সোজা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়, কতটুকু তুমি আমার আর রঞ্জিৎ সম্পর্কে জেনেছ জানি না, তবে তোমার স্ত্রী হয়ে থাকা যে আর আমার চলবে না কথাটা সত্যি। আর কেন যে তা চলবে না, আশা করি তোমাকে সেটা আর বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না।

বেশ, তাই যদি বুঝে থাক, তা হলে আজ এই মুহূর্তে এইখানেই সব শেষ হোক্।

কঠিন কণ্ঠে দ্বিতীয় ও শেষ কথাটি উচ্চারণ করেছিল অতঃপর মনোতোষ এবং কথাটা বলে আর দাঁড়ায় নি, ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

চিত্রাও আর মুহূর্তকাল দেরি করে নি, আলমারি খুলে নিজের গয়নাগুলো একটা ছোট অ্যাটাচি কেসে ভরে স্বামীর গৃহ ছেড়ে চলে এসেছিল সেই রাত্রেই।

॥ ৬ ॥

কি আশ্চর্য! সুদীর্ঘ ছ বছর পরে আজ কিনা সে আবার সেই মনোতোষের কথাই ভাবছে।

চিত্রার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

যে ব্যাপার চিরদিনের মত চুকে গিয়েছে, যে অধ্যায়টা তার জীবনের পাতা থেকে সে এ জন্মের মতই ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিয়েছে, সেই অধ্যায়টাই কিনা আবার মনের মধ্যে এসে নাড়াচাড়া করছে। কে মনোতোষ?

মনোতোষ কে তার? যে তার জীবনটাকে শুধু কতকগুলো মিথ্যে অর্থহীন সামাজিক সংস্কারের দাবিতে ব্যর্থ—একেবারে শেষ করে দিতে বসেছিল।

ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ যে রঞ্জিৎ, রঞ্জিৎকে সে পেয়েছে। অজস্র ধন্যবাদ ভগবানকে যে রঞ্জিৎ তাকে চরম ব্যর্থতার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

অনীতা। হ্যাঁ, মেয়েটার কথা সে সত্যিই আজও ভুলতে পারে নি। মাত্র বার বছরের তাকে রেখে চলে এসেছিল এক দিন। বার বছর তখন অনীতার বয়স হলে কি হবে, এমন রোগা আর পাতলা ছিল মেয়েটা যে দেখলে মনে হত তখন, বছর আষ্টেকের বেশী বয়স বুঝি কিছুতেই হবে না।

বাপের সঙ্গে তো কোন সম্পর্কই ছিল না, যত সম্পর্ক ছিল তারই সঙ্গে। আদর আব্দার করলে কত দিন বলেছে চিত্রা, তোর বাবাকে বলতে পারিস না—

এমন দুষ্ট মেয়ে কোন জবাব না দিয়ে সে কথায় কেবল মুখ টিপে হেসেছে।

আজ মেয়েটার বয়স হয়েছে, বড় হয়েছে মনোতোষ তো যে প্রকৃতির আত্মভোলা, অন্যমনস্ক, তাপ-উত্তাপহীন, কোন ব্যাপারে কোন খেয়াল নেই, মেয়েটা হয়তো সেই বিচিত্র প্রকৃতির মানুষটার কাছে কোন কথা বলতেও পারে না।

মেসের চাকর ভোলা এসে দরজার সামনে দাঁড়াল দিদিমনি।

কে রে? চমকে ওঠে চিত্রা।

আপনি ট্যাক্সি ডাকিয়ে এনেছিলেন, সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা তাগাদা দিচ্ছে।

সত্যিই তো কি এতক্ষণ সব আবোল-তাবোল ভাবছে। বাইরে বেরুবে এখনি, ট্যাক্সি ডেকে এনেছে, সব ভুলে গিয়েছিল।

লজ্জিত হয়ে বলে চিত্রা, আসছি আমি, তুই যা।

ভোলা চলে গেল।

তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে হাত-পা-মুখে সাবান দিয়ে টার্কিশ টাওয়েলটা দিয়ে মুখ ঘষতে ঘষতে আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল চিত্রা।

মিনিট দশেকের মধ্যে প্রসাধন এবং আরও দশ মিনিটে জামা কাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে নীচে নেমে এল চিত্রা।

সিঁড়ির পাশেই হোস্টেল সুপারিন্টেনডেন্ট চারু সিংহীর ঘর।

আজ রাত্রে ফিরবে না হোস্টেলে চিত্রা, চারু সিংহীকে সে কথাটা জানিয়ে যেতে হবে। চারু সিংহীর ঘরে ঢুকে তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বের হয়ে এল চিত্রা।

আজ বেলতলায় মৃণালিনী সখরেল, অর্থাৎ মিনুদির ওখানে রাত কাটাবে চিত্রা আর রঞ্জিৎ। ভাগ্যে মিনুদি অগতির গতি ছিল সকলের, নচেৎ কি যে হত চিত্রাদের মত অনেকের অবস্থা। রঞ্জিতের আবার যত সব প্রেজুডিস্। তার মেসের ঘরে রাত কাটালে নাকি মেসের অন্যান্য বোর্ডারদের বিরূপ মন্তব্যে সেখানে তার পক্ষে টেঁকা দায় হবে।

রঞ্জিৎ যেন দিনেকে দিন একের নম্বরের ভীতু হয়ে উঠেছে। লোক লজ্জা, লোকে কি বলবে! কি আবার বলবে, আর বললেই কি এসে যাচ্ছে তাদের। দু দিন বাদে বিয়ে করে যারা স্বামী-স্ত্রী হতে চলেছে তাদের মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতা নিয়ে লোকে কে কি বললে না বললে তাতে কিই বা এসে গেল।

সে যাই হোক্, মিনুদির বাড়ির দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটা কিন্তু সত্যিই চমৎকার কোজি, নিরিবিলি। এক রাত্রির জন্য অবিশ্যি একটু বেশী দাবি করে মৃণালিনী সখরেল। চক্ষুলজ্জার কোন বালাই নেই। তবে এক রাত্রের জন্য ভাড়াটা বেশী নয় বটে, কিন্তু অমন একটি নিরিবিলি ঘর কোথায়ই বা পাওয়া যাবে।

অনেক হোটেলে অবিশ্যি ওরকম ঘর পাওয়া যায় কিন্তু তার চাইতে মৃণালিনী সরখেলের ঘরটা অনেক ভাল। মাঝারী সাইজের ঘরটা, ঘরের সঙ্গেই এ্যাটাচড বাথরুম। সব পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে।

ঘরে ডাবল বেড। স্প্রিংয়ের খাট, ডানলোপিলো গদি, ধবধবে চাদর। ড্রেসিং টেবিল, দুটো রকিং চেয়ার। আরামের সর্বরকম ব্যবস্থাই রয়েছে সেখানে। আর তাই বোধ হয় নিত্য বার মাস রাত-খদ্দেরের অভাব হয় না মৃণালিনী সরখেলের।

বাড়িটায় লোকজনের ভিড় বা ঝামেলা নেই, একটা চাকর, একটা ঝি, ঠাকুর ও স্বামী স্ত্রী। হরগোবিন্দ সরখেল নাকি আলীপুর আদালতে ওকালতি করেন আর মৃণালিনী কোন্ এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। চারটি সন্তান। চারটিই মেয়ে। মেয়েদের কাছে রাখেন না ওঁরা। তারা বাগনান না কোথায় এক স্কুলে পড়ে এবং সেই স্কুলেরই বোর্ডিংয়ে থাকে। ছুটি-ছাটায় মা বাপের কাছে আসে।

চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে আপন মনেই মৃদু মৃদু হাসে চিত্রা, মন্দ ব্যবসা ফেঁদে বসে নি ঐ সরখেল দম্পতি।

সরখেলের বাড়িতে রাত-ঘরের সংবাদটি দিয়েছিল মিস্ জুলিয়া। ওদের অফিসের স্টেনো ছিল এক সময়। জুলিয়ার এক বাঙালী বয়-ফ্রেণ্ড ছিল। জুলিয়াকে নিয়ে মধ্যে মধ্যে নাকি মৃণালিনী সরখেলের ঐ নিশ্চিন্ত, নিরিবিলি রাত-ঘরে গিয়ে অর্থের বিনিময়ে রাত কাটিয়ে আসত।

জুলিয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে চিত্রাকে বলেছিল, এ নাইস্ কোজি প্লেস্। ইউ উড্ লাইক ইট্ আই ক্যান টেল ইউ চিত্রা।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে বন্ধ দরজার গায়ে কলিং বেলটা টিপতেই মৃণালিনী সরখেল এসে দরজা খুলে দিল।

ওষ্ঠপ্রান্তে স্মিত অভ্যর্থনার হাসি, এসো—তা একা দেখছি, কপোতটি কই।

মৃণালিনী সরখেলের ঐটিই চিরাচরিত সম্ভাষণ অতিথিদের।

হেসে হেসে বলত সে, কপোত কপোতী।

রঞ্জিৎ এখনও আসে নি! চিত্রা শুধায়।

কই না তো।

বেশ লোক যা হোক, বলতে বলতে হাতঘড়ির দিকে চেয়ে কথাটা শেষ করে চিত্রা, ছটা বাজে, তার তো সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই এখানে আসার কথা।

হয়তো তা হলে এবারে এসে পড়বে। তা ঘরে যাবে না এখানেই আমার বাইরের ঘরে বসবে?

কথাটার মধ্যে চিত্রা জানে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

অর্থাৎ ঘরের ভাড়াটি অগ্রিম মিটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত মৃণালিনী সরখেল তার রাত-ঘরের তালা কখনও খোলে না।

না, ঘরেই যাব। বলতে বলতে হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে দশ টাকার তিনখানি নোট ও একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে মৃণালিনীর দিকে এগিয়ে দেয়।

হাতে টাকাটা নিয়ে মৃদু হেসে বলে মৃণালিনী, তা হলে চল, তোমাদের ঘরেই বসবে চল—একটু দাঁড়াও, চাবিটা নিয়ে আসি।

মৃণালিনী চাবি আনতে চলে গেল।

ঘর খুলে মৃণালিনী বলে, কিছু রান্না হবে না হোটেল থেকে খাবার আসবে ভাই তোমাদের?

রঞ্জিৎ খাবার নিয়ে আসবে।

রাত্রের খাবার নিতে হলে আরও পাঁচটি মুদ্রা দিতে হয়। অর্থাৎ পুরোপুরি চল্লিশ।

যদিচ মৃণালিনী সরখেলের রাতের অতিথিদের এক রাত্রির জন্য কিছুটা বেশীই দিতে হত তবু তাদের সেজন্য কোন নালিশ ছিল না। কারণ নিরিবিলি ও ভদ্র পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং দুজনের খাওয়া ও অমন চমৎকার একটি ঘর রাত্রের জন্য পাওয়া যায় বলে যারা ওখানে রাত কাটাতে আসে তারা বেশির ভাগই খাওয়াটা ওখানেই আরও পাঁচটি মুদ্রা দিয়ে মিটিয়ে নেয়।

চিত্রা ও রঞ্জিৎও দু-এক বার ওখানেই খেয়েছে। কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারটা বিশেষ তেমন সুবিধার নয় বলে এবং রাত দশটার মধ্যে মিটিয়ে নিতে হয় বলে ওরা হোটেল থেকেই খাবার নিয়ে আসে বেশির ভাগ সময়।

মৃণালিনী চলে যাবার পর চিত্রা ঘরের দরজা বন্ধ করে এসে একটা রকিং চেয়ারে বসল।

ঐখানে এলে ঐ রকিং চেয়ারটার উপর গা ঢেলে দিয়ে দোল খেতে চিত্রার বেশ লাগে।

কিন্তু সাতটা, সাড়ে সাতটা—আটটাও প্রায় বাজে, রঞ্জিতের তখনও দেখা নেই।

ভিতরে ভিতরে চিত্রা অস্থির ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

এখনও আসছে না, কি করছে এখনও সে।

ক্রমশঃ আটটা বেজে মিনিট পনের হয়ে গেল।

আশ্চর্য! রঞ্জিৎ ভুলে গেল নাকি! অফিস থেকে দু জনের এক সঙ্গেই বেরুবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেক্রেটারীর ঘরে রঞ্জিতের ডাক পড়ায় রঞ্জিৎ তাকে বলেছিল, তুমি যাও, আমার বেরুতে বোধ হয় একটু দেরি হবে।

চিত্রা বলেছিল, আজকের কথা মনে আছে তো!

কোন্ কথা বল তো?

বাঃ, আজ আমাদের বেলতলায় যাবার কথা না।

ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে আছে।

আগে কখনও এই সামান্য ভুলটুকু হত না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আজকাল এমনিই দেখছে ভুল হয় রঞ্জিতের। শেষ পর্যন্ত আবার ভুলে যায় নি তো কথাটা। কিন্তু সে আজ আসবার আগে বার বার মনে করিয়ে দিয়ে এসেছে।

চিত্রা এসে রঞ্জিতের কথা ভাবতে ভাবতেই ঘরের ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল। অন্যমনস্ক ভাবেই হাত দিয়ে মাথাটা সামনের চুলটা একটু ঠিক করে নিল।

শুধু ভুল নয়, রঞ্জিতের মধ্যে চিত্রা যেন আজকাল প্রথম দিককার ক বছরের সেই আবেগটা আর দেখতে পায় না। রঞ্জিতের আলিঙ্গনের মধ্যেও যেন আজকাল কিছুদিন ধরে সেই নিবিড়তার স্পর্শ খুঁজে পায় না চিত্রা।

দীর্ঘ আট বছরের ঘনিষ্ঠতা রঞ্জিতের সঙ্গে তার। তার মধ্যে তো কোন পরিবর্তনই হয় নি। আজও রঞ্জিতের মধ্যে সে আগের মতই রোমাঞ্চ অনুভব করে। তা ছাড়া চিত্রা জানে রঞ্জিৎ আজও তার প্রতি একনিষ্ঠ।

অবিশ্যি বিয়েটা এতদিনে তাদের করে ফেলা উচিত ছিল। ডিভোর্সও হয়ে গিয়েছে আজ তাদের বছর কয়েক হল।

হঠাৎ যেন মনোতোষের মুখখানা মনের পাতায় ভেসে ওঠে। অমিয়া তার চিঠিতে লিখেছে মনোতোষ নাকি অত্যন্ত রোগা হয়ে গিয়েছে।

ঘাড়ের ওপর রগের দু পাশে সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে। লম্বা মানুষটা চিরদিন সোজা হয়ে হাঁটত, এখন আর তা হাঁটে না। একটু কুঁজো হয়ে চলে। মনোতোষের সঙ্গে তার শেষ দেখা সেই যেদিন আদালতে ডিভোর্স হয়ে গেল। চার বছর আগেকার একটা দিন।

এই চার বছর কখনও কোথাও তার সঙ্গে আর মনোতোষের দেখা হয় নি। অবশ্য দেখা যাতে না হয় সেই চেষ্টাই বরাবর সে করেছে।

মনোতোষ বুড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার নিজের বয়সও তো কম হল না। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় সামনের আয়নায় প্রতিবিম্বিত নিজের চেহারাটার দিকে আবার তাকাল নিজের অজ্ঞাতেই চিত্রা। যেন দৃষ্টি পড়ল তার মসৃণ আয়নার কাচে প্রতিফলিত নিজের চেহারাটার দিকে।

কত বয়স হল তার। মনে মনে হিসাব করে, আটত্রিশ। হোস্টেলে সেদিন তিনতলার একুশ নম্বরের ঘরের মাধবী বলছিল, তোমাকে দেখলে মনে হয় চিত্রা,

তোমার বয়স এখনও যেন কুড়ি পার হয় নি।

নিজের বয়সটা কখনও যেন মনে করতে চায় না চিত্রা। জীবনের যে তার এখনও সবটাই বাকী। তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলে তো চলবে না।

মাধবী ঠাট্টা করে বলেছিল, হরমোন চিকিৎসা করাও নাকি চিত্রা, যৌবনকে ধরে রাখবার জন্য।

সত্যিই এমন কোন ওষুধ আছে নাকি মাধবী!

আছে বৈকি। নইলে বুড়ো ডাক্তার ভরনহপ্‌কে কুড়ি-একুশ বছরের সুন্দরযৌবনা নারী বিয়ে করে কি করে?

ঢং ঢং ঢং....

চমকে ওঠে চিত্রা, মৃণালিনীদের বাড়ির সিঁড়ির মাথার ঘড়িটা ঢং ঢং করে রাত্রি নটা ঘোষণা করছে।

এবার সত্যি সত্যিই যেন রীতিমত চিন্তিতই হয়ে ওঠে চিত্রা রঞ্জিৎ সম্পর্কে। রাত নটা, এখনও রঞ্জিত এল না। ব্যাপারটা কি!

এমন তো কখনও হয় নি আগে।

এক-আধ বার সে-ই আগে এসেছে বটে এখানে, কিন্তু তা ছাড়া অন্যান্য বার রঞ্জিৎই আগে এসে এখানে এই ঘরে তার জন্য অপেক্ষা করেছে।

তবে কি সত্যি সত্যিই ভুলে গেল রঞ্জিৎ এখানে আসবার কথা!

রঞ্জিত ভোলে নি।

শনিবার অফিসের ছুটি হয়েছে সেদিন আড়াইটায়, ঠিক পৌনে তিনটের সময় কাজ শেষ করে রঞ্জিৎ গোবরডাঙায় গিয়েছিল। পিসীমা বার বার করে চিঠি দিচ্ছিলেন রঞ্জিৎকে এক বার গোবরডাঙ্গায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য।

বাল্যবিধবা পিসীমা জগদ্ধাত্রী, সারাটা জীবন তাঁর শ্বশুরগৃহেই কাটল। এখন অবিশ্যি আর শ্বশুর-শাশুড়ী কেউ বেঁচে নেই, দেওর মণিমোহনবাবু, তাঁরই সংসারে আছেন পিসীমা।

মণিমোহনবাবু নাকি পাকিস্থানে সর্বস্ব ফেলে রেখে প্রৌঢ় বয়সে এখানে এসে ঐ গোবরডাঙায় কিছু জমিজমা সংগ্রহ করে একতলা একটা ছোট বাড়ি করে বসবাস করছেন এবং শেষ জীবনে ঐ বাড়ি করবার পর অবশিষ্ট যা কিছু ছিল তাই নিয়ে ঐখানেই বাজারে একটা ছোট স্টেশনারী দোকান দিয়েছেন। তিনটি মেয়ে ও এক ছেলে।

ছেলে অবিনাশ প্রতাপগড়ে এ. এস্. এম। সে বাপকে প্রায় কিছুই সাহায্য করতে পারে না। সে তার সংসার ও স্ত্রী পুত্র নিয়েই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। বড় দুটি মেয়ের পাকিস্থানে থাকতেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তাদের এক জন পাকিস্থানে শ্বশুরবাড়িতেই রয়েছে। জামাই সেখানে তামাকের ব্যবসা করে। আর এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে আসামের টী গার্ডেনের এক এল্ এম্ এফ ডাক্তারের সঙ্গে—সে সেখানেই থাকে।

ছোট মেয়েটির এখনও বিয়ে হয় নি। ম্যাট্রিক পাশ করে নাকি আই এ. পড়ছে।

মণিমোহনের স্ত্রী জপমালা দীর্ঘ দিন বাতব্যাধিতে পঙ্গু, শয্যাশায়িনী। দীর্ঘ দশ বছর প্রায়। সংসার দেখাশোনা করেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধু জগদ্ধাত্রী দেবী—রঞ্জিতের পিসীমাই।

তিনটে পঁচিশের ট্রেনে রঞ্জিৎ গোবরডাঙায় গিয়ে হাজির হল। স্টেশন থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে বাড়ি করেছেন মণিমোহন। মণিমোহন বাসায় ছিলেন না। ঐ সময়টা তিনি বাসায় থাকেন না, দোকানেই থাকেন। রাত্রে একেবারে আটটা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরেন।

হুট্ করে চলে এসেছিল রঞ্জিৎ, জগদ্ধাত্রীও সে সময় বাড়িতে ছিলেন না, পাশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ছিল পঙ্গু শয্যাশায়িনী জপমালা আর মণিমোহনের ছোট মেয়ে উমা।

ছোট একতলা বাড়ি। রাস্তার ধারেই একটা পুকুর। পুকুরের ওধারে বাড়িটা। সামনে চাঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে কিছুটা জায়গা ঘেরা। সেখানে কিছু তরিতরকারি ও ফুলের গাছ। মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে চলার পথ।

শনিবার অনেক আগেই কলেজে ছুটি হয়ে গিয়েছিল। উমা শাড়ির আঁচলটা পাক দিয় কোমর বেঁধে—বাগানে নতুন বেলের ও মল্লিকার চারা এনে পোঁতা হয়েছিল, তারই তদারক করছিল। বাগানটা তারই শখের।

কাঠের তৈরী ছোট গেটটা ঠেলে রঞ্জিৎ এসে ভিতরে প্রবেশ করল। রঞ্জিৎ উবু হয়ে বসে কর্মরত উমাকে প্রথমটা দেখতে পায় নি। দেখতে অবিশ্যি না পাওয়ারই কথা, কারণ চন্দ্রমল্লিকার ঝোপটার আড়ালে ঢাকা পড়েছিল উমা। কিন্তু গেট খোলার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটা উমার কাণে যাওয়ায় কৌতূহলী হয়ে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

দু হাতে কাদা মাখা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, কয়েকটি চূর্ণ কুন্তল-

সরু সিঁথির দু পাশ থেকে স্থানভ্রষ্ট হয়ে ঘর্মসিক্ত কপালের উপরে লেপটে আছে। সেই অবস্থাতেই দু পা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে, কাকে চান ?

এটা কি মণিমোহনবাবুর বাড়ি।

হ্যাঁ, কিন্তু বাবা তো এখন বাড়িতে নেই, দোকানে আছেন।

আপনি ?

আমি তাঁর ছোট মেয়ে।

ও। আচ্ছা আপনার জেঠাইমা বাড়িতে আছেন নিশ্চয়ই ?

আপনি—

তিনি আমার পিসীমা হন। বলুন তো রঞ্জিৎ এসেছে—

আসুন আপনি—

কথাটা বলে রঞ্জিৎকে নিয়ে এগুতে গিয়ে যেন উমার খেয়াল হয় তার বেশটা ঠিক কোন বাইরের অপরিচিত পুরুষের কাছে বেরুবার মত নয়।

শাড়ির আঁচলটা পেঁচিয়ে গাছ-কোমর বাঁধা, দু হাতে কাদামাটি, উমা যেন একটু বিব্রতই হয়ে পড়ে।

ওদিকে যাবার জন্য আহ্বান করা সত্ত্বেও রঞ্জিৎ তখনও তার দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়েছিল। এবং তার সেই নিঃশব্দ তাকানোর মধ্যে যে মুগ্ধ ভাবটা ফুটে উঠেছিল সেটা উমার দৃষ্টিতে এড়ায় না। সত্যিই রঞ্জিৎ যেন মুগ্ধ হয়েই গিয়েছিল উমার দিকে তাকিয়ে।

উমা গত আড়াই বছর মাত্র এখানে আসার পূর্বাবধি পূর্ববঙ্গের গ্রামেই বড় হয়েছে। নদীর ধারে গ্রাম ছিল উমাদের। গ্রামের সেই নদীর শ্যামলতা যেন এখনও উমার দেহে, চোখে-মুখে জড়িয়ে রয়েছে।

দু বছরের বেশী তারা শহরবাসী হলেও শহরের কৃত্রিমতা যেন আজও উমাকে এতটুকু স্পর্শ করতে পারে নি। রোগাও নয়, মোটাও নয়, স্বাস্থ্যটি চমৎকার। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। মুখখানির মধ্যে সরল কৈশোরের মাধুর্য যেন এখনও ছড়ানো। টানা টানা দুটি চোখ। ছোট কপাল, নাকটা সামান্য একটু ভোঁতা হলেও সমগ্র মুখখানির মধ্যে আল্‌গা একটু সুন্দর শ্রী রয়েছে। মাথার পর্যাপ্ত কেশ উমার যেন অন্যতম ঐশ্বর্য বা সম্পদ।

আল্‌গা খোঁপাটা ভেঙে কাঁধের উপরে লুটোচ্ছে। অতি সাধারণ কালো পাড় মিলের একখানি শাড়ি ও নীল ভয়েলের একটা ব্লাউজ পরিধানে। হাতে একগাছি করে সোনার চুড়ি। ঐ সামান্য বেশেই যেন উমাকে ঐশ্বর্যময়ী মনে

হচ্ছিল রঞ্জিতের।

আসুন—

উমার ডাকে যেন রঞ্জিৎ চমকে ওঠে। বলে, হ্যাঁ—হ্যাঁ চলুন—

উমা আগে আগে যায়, রঞ্জিৎ পা বাড়ায় তাঁর পিছনে পিছনে।

॥ ৭ ॥

বাড়িতে উমার নিজের ঘরটিই সব চাইতে সাজানো গোছানো এবং পরিচ্ছন্ন। এক ধারে একটি তক্তাপোশের উপর একক নিভাঁজ শয্যাটি পরিষ্কার একটি বেডকভার দিয়ে ঢাকা। অন্য এক পাশে ছোট একটি টেবিল, তারপাশে একটি সেল্‌ফ। বই খাতায় ঠাসা। একটি ছোট টুল।

টুলের উপর না বসলে উমার নাকি পড়ায় মনই বসে না। সামনেই দক্ষিণমুখো জানালাটি। জানালার ওপাশেই বোধ হয় একটি শ্বেতকরবীর গাছ। কিছু ডালপালা থোকা থোকা সাদা ফুল নিয়ে জানালাটার সামনে এসে যেন উঁকি দিচ্ছে।

এক কোণে ছোট একটি আলনায় উমার নিত্য ব্যবহৃত জামা ও শাড়িগুলো সুন্দর করে পাট করে রাখা। দেওয়ালে ঝুলছে খাপে ভরা একটি বাদ্য যন্ত্র। সেতার বলেই মনে হল রঞ্জিতের।

ছোট বাড়ি। বসবার মত ঘর তো নেই। উমা রঞ্জিৎকে তারই ঘরে এনে টুলটায় বসতে বলে সলজ্জ ভঙ্গিতে। বলে, বসুন, আমি জেঠীমণিকে ডেকে দিচ্ছি।

নিজের বেশভূষার দৈন্যে উমা যেন নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছে। কোন মতে রঞ্জিতের সামনে থেকে পালাতে পারলে তখন বুঝি বাঁচে। রঞ্জিতকে বসিয়ে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে চলে গেল উমা।

বৈকালের পড়ন্ত রৌদ্রালোকে চারিদিক তখন ম্লান হয়ে আসছে। রঞ্জিৎ টুলটার উপরে বসে ঘরের চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। শান্ত সুন্দর একটি পরিবেশ যেন। কেমন যেন অদ্ভুত ভাল লাগে রঞ্জিতের।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় পাঁচটা বাজে। নতুন করেই যেন এতক্ষণে আবার চিত্রার কথা মনে পড়ে রঞ্জিতের। এতক্ষণে নিশ্চয়ই চিত্রা বেলতলায় মৃণালিনী সরখেলের ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছে।

কেন যে হঠাৎ আজ এমন করে চিত্রাকে এড়িয়ে চলে এল রঞ্জিৎ নিজেই তা এখন জানে না। পূর্বে কিছু ভাবে নি বা মন স্থিরও করে নি। হঠাৎই চলে এসেছে গোবরডাঙায়।

ট্রেনে ওঠবার পর এক বার মনে হয়েছিল বটে, চিত্রা বেলতলার বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করবে, কাজটা হয়তো ভাল হল না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ঠকে নি সে। সেই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি, সেই একই কথা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা, যেন কোন একটি চেনা সুরের বার বার পুনরাবৃত্তি।

প্রাণটা নিশ্চয় হাঁপিয়ে উঠেছিল তার অজ্ঞাতেই, নচেৎ এমন করে এখানে চলে এল কেন। পিসীমার টানে বা তার আহ্বানের কর্তব্যবোধে নিশ্চয়ই নয়, কারণ গত এক বৎসর ধরেই তো পিসীমা তাকে চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছেন, সময় করে একটি বার তার সঙ্গে এসে দেখা করে যেতে। কিন্তু সে তো আসে নি। একখানা চিঠির জবাবও দেয় নি। তবু হঠাৎ আজ চলে এল কেন?

পিসীমার গলা শোনা গেল, কোথায় রণু—বলতে বলতে জগদ্ধাত্রী এসে ঘরে ঢুকলেন।

সেই ছোট বেলায় রঞ্জিতের যখন বছর বার বয়স, জগদ্ধাত্রী এক বার প্রয়াগে কুম্ভ স্নান করতে যাবার পথে তাদের কলকাতার বাড়িতে দিন দু-একের জন্য উঠেছিলেন। তার পরের এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান। আবছা আবছা মনে ছিল জগদ্ধাত্রীকে রঞ্জিতের। কৈশোরের আবছা স্মৃতি।

কিন্তু এই দীর্ঘ বৎসরের ব্যবধানেও জগদ্ধাত্রীর চেহারার তেমন কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। তেমনি রোগা, তেমনি লম্বা। অটুট স্বাস্থ্য, আজও তেমনি আঁটসাট গঠন জগদ্ধাত্রীর। বন্ধ্যা নারীর দেহ, বয়সেও বুঝি ভাঙন ধরে না।

রঞ্জিত তাড়াতাড়ি উঠে পিসীমাকে প্রণাম করল।

থাক, থাক—তা হ্যাঁরে—আত্মীয়জনকে কি এমনি করেই ভুলে থাকতে হয় নাকি।

নিঃশব্দে হাসে রঞ্জিত।

বোস্, বোস্—তা আমার চিঠিগুলো পেয়েছিলি না পাস নি?

পেয়েছিলাম।

একটা জবাব দিতেও তো পারতিস।

রঞ্জিত আবার হাসে।

তা বিয়ে-থা করেছিস, না এখনও করিস নি?

বিয়ে করব যে তা খাওয়াব কি! হাসতে হাসতে রঞ্জিত বলে।

রাখ তো বাজে কথা। বিয়ে করে খাওয়াব কি! খাওয়াবি কি তুই—

বল কি। খাওয়াবেটা তবে কে আমার বৌকে।

ওরে জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনিই। তোর বাবা ক বছর বয়সের সময় বিয়ে করেছিল তোর মাকে জানিস? দাদার বয়স মাত্র আঠের—সবে এফ এ পাশ দিয়েছে।

তোমাদের সে মান্ধাতার আমল কি আর আছে পিসীমা। এখন বৌ ঘরে এসেই বলে, লিপষ্টিক দাও, রুজ দাও হাতখরচা দাও—

বাইরে একটা মিষ্টি হাসির ঝর্না যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

উমা চা নিয়ে ঐ ঘরের দরজা পর্যন্ত এসেছিল, রঞ্জিতের কথায় সেই হাসি চেপে রাখতে পারে নি। জগদ্ধাত্রী উমার হাসির সাড়া পেয়ে শুধান, কি হল রে উমা, চা হল?

আর উমার সাড়া পাওয়া গেল না, এক হাতে এক কাপ ধূমায়িত চা অন্য হাতে প্লেটে করে গোটা চারেক মিষ্টি নিয়ে পরমুহূর্তেই এসে ঐ ঘরে প্রবেশ করল।

আপনা হতেই যেন রঞ্জিতের সাগ্রহ উৎসুক দৃষ্টি গিয়ে উমার উপরে পড়ে। বেশের অবশ্যই পরিবর্তন হয়েছে ইতিমধ্যে। সেই শাড়ীটাই অবিশ্যি এখনও পরিধানে, কিন্তু পরবার ঢংটি পরিবর্তিত হয়েছে। হাত দুটি পরিচ্ছন্ন। কাদামাটি নেই আর।

চা আমি খাব পিসীমা কিন্তু মিষ্টি খাব না। ওগুলো আপনি নিয়ে যান। প্রথম কথাটা জগদ্ধাত্রীকে ও শেষটা উমার দিকে তাকিয়েই বলল রঞ্জিৎ।

উমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতেতোকায় তার জেঠীমণির মুখের দিকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বলে ওঠেন জগদ্ধাত্রী, খুব পারবি, অফিস থেকেই বরাবর আসছিস তো রে?

তা আসছি—

তবে ক্ষিধের মুখে ঐ চারটি মিষ্টি আর খেতে পারবি না, খুব পারবি। নে খেয়ে নে—

তা নয় ঠিক, মিষ্টি আমার ভাল লাগে না পিসীমা।

তবে যা না হয় উমা, দুটো লুচি ভেজে নিয়ে আয়।

না, না—সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানায় রঞ্জিৎ, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন বল তো পিসীমা। ঐ চা-তেই আমার হয়ে যাবে।

পিসীমা আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় করলেন না ঐ সম্পর্কে। উমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই বোস উমা এই ঘরে—

কথাটা বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন জগদ্ধাত্রী।

জগদ্ধাত্রী হঠাৎ ঘরে ছেড়ে চলে যাওয়ায় উমার মুখের দিকে কতকটা যেন বিব্রত হয়ে তাকিয়েই অতঃপর রঞ্জিৎ প্রশ্ন করে, কোথায় গেলেন ?

মৃদু হেসে উমা বলে, লুচি করে আনতে। কিন্তু চা যে আপনার জুড়িয়ে গেল—

হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা তুলে নিতে নিতে রঞ্জিৎ বলে, না না, গরম আছে। বলতে বলতে গরম চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বাকী কথাটা শেষ করে, মিষ্টিগুলো খেলেই হত, অসময়ে এসে দেখছি বিব্রতই করলাম পিসীমাকে। কিন্তু জেঠীমণি আপনাকে দেখে খুব খুশী হয়েছেন। মৃদুকণ্ঠে বললে উমা।

উমা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল। রঞ্জিৎ বলে, কিন্তু আপনি যে দাঁড়িয়ে রইলেন—

ব্যস্ত হবেন না। কোন কষ্ট হচ্ছে না আমার।

কিন্তু আমি বসে রইলাম, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন। রঞ্জিৎ চায়ের কাপটা হাতে নিয়েই টুলটা থেকে উঠে দাঁড়ায়।

উঠলেন কেন আপনি, বসুন—আমি বরং খাটে বসছি।

উমার সহজ ভাবটা রঞ্জিৎকে মুগ্ধ করে।

বসে বসে আপনার ঘরটা দেখছিলাম। এমন সুন্দর ছিমছাম।

উমা প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসল নিঃশব্দে।

জায়গাটা আপনাদের খুব নির্জন। রঞ্জিৎ আবার বলে।

হ্যাঁ, চিরদিন তো আমরা গ্রামে মানুষ, আমাদের ভালই লাগে।

কেন শহর আপনার ভাল লাগে না ?

না।

কেন বলুন তো ?

বড্ড ভিড় বড্ড ব্যস্ততা যেন সর্বক্ষণ সর্বত্র।

তা যা বলেছেন। আচ্ছা দেওয়ালে টাঙানো ঐ যন্ত্রটি নিশ্চয় আপনার ?

দাদার।

আপনার দাদার ?

হ্যাঁ, দাদা অবিশ্যি যাবার আগে আমাকেই দিয়ে গিয়েছিল, তবে—

তবে কি ?

দাদার হাতে ওটা কথা বলত, কিন্তু আমার হাতে পীড়িত হয়, বলতে বলতে মৃদু হাসে উমা।

পীড়িত হয় ?

তাই। চেষ্টা অবিশ্যি করি তবে মনে হয় বৃথা চেষ্টা।

চেষ্টা করতে করতেই তো মানুষের সাফল্য আসে।

কোন কোন বিষয়ে হয়তো আমরা যাকে সাফল্য বলি আসে, কিন্তু জন্মলগ্নে সুরাধিষ্ঠাত্রীর আশীর্বাদ না থাকলে কেবলমাত্র প্রচেষ্টাতেই কারও বোধ হয় দাদার হাতের মত সুর আসে না।

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনার দাদা সত্যিকারের একজন সুরজ্ঞ।

দাদার বাজনা শুনলে বুঝতে পারতেন তাঁর তুলনা খুবই বিরল। তার পর একটু থেমে আবার উমা বললে, দাদার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সঙ্গীত-সভায় গিয়েছি, অনেকের অনেক বাজানোও শুনেছি কিন্তু দাদার মত বাজাতে শুনেছি বলে বড় একটা যেন মনে পড়ে না। তাল লয় বা সুর সম্বন্ধে আমি বোদ্ধা নাই, কিন্তু দাদার বাজনা যেন অন্তরের একেবারে ভিতরটিতে গিয়ে প্রবেশ করত, যেখানে যুক্তি তর্ক বা কোন বুদ্ধি বিবেচনা নয়, কেবলমাত্র অনুভূতি দিয়ে স্বাদগ্রহণ করতে হয়।

উমাকে প্রথম দেখে রঞ্জিতের যে সহজ সরল মনে হয়েছিল, এখন তার কথা-গুলোর মধ্য দিয়ে অন্য এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেন উমা রঞ্জিৎকে মুগ্ধ করে।

অত্যন্ত স্বল্পপরিচিত কোন ছেলের সঙ্গে কোন মেয়ে বিশেষ করে উমার বয়সী মেয়ে যে এমন করে সহজ অনাড়ম্বর সৌজন্যে অকুণ্ঠ হতে পারে এ যেন কোন দিন ভাবতেও পারে নি রঞ্জিৎ।

কিন্তু গল্প করতে করতে সত্যিই যে আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মৃদু হেসে উমা আবার বলে।

না, না—বিশেষ ঠাণ্ডা হয় নি, তা ছাড়া ঠাণ্ডা চা-ই আমার একটু প্রিয়।

ঐ সময় জগদ্ধাত্রী এসে ঘরে ঢুকলেন।

হাত মুখটা ধুয়ে নে রেণু। সাহেব মানুষ, কলকাতায় তো যেতে পারবে না। রাঘুকে বলেছি হাত মুখ ধোয়ার জল সামনের বারান্দায় দিতে,—উমা, সঙ্গে করে নিয়ে যা ওকে বারান্দায়—

কথাগুলো বলে জগদ্ধাত্রী আর দাঁড়ালেন না। ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

চলুন, হাত মুখ ধুয়ে নেবেন চলুন। জেঠামণির পাল্লায় যখন একবার পড়েছেন তখন সহজে নিষ্কৃতি নেই। হাসতে হাসতে বলে উমা।

সে তো বুঝতেই পারছি, চলুন—

কথা কথা বলতে বলতে ইতিমধ্যে কখন সন্ধ্যারাত্রির অন্ধকার চারিদিকে ঘনিয়ে এসেছে রঞ্জিৎ টের পায় নি। ভৃত্য রাঘু ঘরে ঘরে আলো দিয়ে যায়।

হাত মুখ ধুয়ে তোয়ালে হাত মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ফিরে এসে দেখল রঞ্জিৎ ছোট টুলটার উপরে কাচের প্লেটে গরম লুচি, তরকারি, বেগুনভাজা মিষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং আর একটা টুল সামনে পেতে পিসীমা জগদ্ধাত্রী ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

খাদ্যবস্তুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রঞ্জিৎ বললে, একি করেছ পিসীমা। এখন এত খেলে রাত্রে আর কিছু খেতে হবে না!

নে তো, বোস—খান আষ্টেক তো মাত্র গরম গরম লুচি দিয়েছি, ও যেতে যেতেই রাস্তায় হজম হয়ে যাবে।

সত্যি বলছি পিসীমা, এত এখন খেতে পারব না।

খুব পারবি নে বোস। উমা, চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে এসেছি উনুনে—চাটা করে নিয়ে আয় তুই ততক্ষণ—

না, না—আপনাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না উমা দেবী, এক বার চা তো খেলাম, আর চায়ের দরকার নেই।

তা না খাস না খাবি। কতকগুলো চা না খাওয়াই ভাল। কিন্তু ওকে আবার আপনি আপনি করছিস কি! দেখতেই অমন ডাগর ডোগরটি হয়েছে, বয়সে ও তোর চাইতে অনেক ছোট। তা তুই বসে রইলি কেন, নে শুরু কর।

সত্যিই জগদ্ধাত্রীর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। রঞ্জিৎ সুরু করল খেতে।

খেতে খেতে পিসী ও ভাইপোর কথাবার্তা চলতে লাগল।

উমা ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

জগদ্ধাত্রী এক সময় বলেন, মাঝে মাঝে আসলে তো পারিস।

অফিসের যা কাজ, সময়ই পাই না মোটে! একটা লুচি ছিঁড়ে বেগুনভাজা দিয়ে মুখে দিতে দিতে রঞ্জিৎ বলে।

তা হলেও ওরই মধ্যে সময় করে নিতে হয় রে। আপনার জন আত্মীয়স্বজন তাদের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক তুলে দিলে কি ভাল লাগে। এমনিতে তো কার সঙ্গে কারও কোন লেন-দেনই নেই, দেখা শোনার সম্পর্কটা রাখলে অন্তত

ক্ষতি কি।

এই তো এলাম—

হ্যাঁ, এক বছর ধরে চিঠি দেবার পর। আমি তো ভেবেছিলাম পিসীমাকে বুঝি ভুলেই গিয়েছিস।

ভুলব কেন?

তা ভোলা ছাড়া আর কি। একটা চিঠির পর্যন্ত জবাব দিস না।

বেশ কথা দিচ্ছি এবারে মধ্যে মধ্যে আসব।

হ্যাঁ, আমার কথা কত মনে থাকবে। কলকাতায় ফিরে গেলেই সব ভুলে যাবি।

হাসতে হাসতে রঞ্জিৎ বলে, না না, ভুলব না। ভুলব না।

ওখান থেকে বেরুতে বেরুতে প্রায় পৌনে আটটা হয়ে গেল।

জগদ্ধাত্রী বললেন উমাকে খানিকটা রাস্তা এগিয়ে দিয়ে আসতে।

জায়গাটা আধা গ্রাম আধা শহরের মত। তবে দেশবিভাগের ফলে বাস্তুত্যাগীদের ভিড়ে ক্রমশঃ এখন একটু একটু করে গড়ে উঠছে।

ইলেকট্রিক লাইট এসেছে বটে তবে খালের ওপার পর্যন্ত। এপারে এখনও পৌঁছায় নি। পথে একটা ছোট নালা বা খালের মত পড়ে, যাতায়াতের জন্য উপরে বাঁশের সাঁকো পাতা।

কৃষ্ণপক্ষের রাত।

রাস্তাঘাট বেশ অন্ধকার।

আগে আগে চলছিল উমা, পিছনে হাঁটছিল রঞ্জিৎ। সাঁকোটা পার হওয়ার সময় উমা সাবধান করে দেয়, দেখবেন, একটু দেখে পার হবেন। পড়ে গেলে অবিশ্যি ডোববার ভয় নেই, কিন্তু জলে কাদায় আপনার দামী স্যুটটা নষ্ট হয়ে যাবে।

সন্তর্পণে সাঁকোটা পার হতে হতে রঞ্জিৎ বলে, আসার সময় তো এপথ দিয়ে আসি নি। একটা ভাল ব্রিজের মত ছিল—

হ্যাঁ, সেটা ঘুর পথ। এ পথটায় স্টেশনে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবেন।

শর্টকাট্ বলুন!

তাই।

আপনি বুঝি সর্বদা এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেন?

হ্যাঁ।

কোথায় যেন পথের পাশে ঘেঁস ফুল ফুটেছে, অন্ধকারে বাতাসে তাই গন্ধ ভেসে আসছিল। ঝোপের মধ্যে কয়েকটা জোনাকি আলোর ফুটকি কাটছিল। দু জনে নিঃশব্দে সাঁকোটা অতিক্রম করে পথ চলতে থাকে।

এক সময় রঞ্জিৎই আবার কথা বলে, একটা কথা কি মনে হচ্ছে জানেন উমা দেবী।

কি?

এখানে আসবার কোন প্ল্যান দুপুর পর্যন্ত আমার ছিল না। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় খেয়ালের বশেই চলে এসেছিলাম, কিন্তু—

কিন্তু কি?

মনে হচ্ছে এখন না এলে সত্যিই ঠকতাম।

ঠকতেন?

তাই। পিসীমার সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হল বটে, তবে আজ না এলেও পিসীমার সঙ্গে এক দিন না এক দিন দেখা তো হতই। তার জন্য ব্যস্ততার কিছু ছিল না, কিন্তু আজ না এলে আপনার সঙ্গে আলাপ হবার সৌভাগ্য হত না।

মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল উমা, অতিশয়োক্তি আর মিথ্যাচরণ কিন্তু কোন কোন সময়ে একই পর্যায়ে পড়ে।

না, না—আমি এক বিন্দুও অতিশয়োক্তি করছি না—

কিন্তু আর না রঞ্জিৎবাবু, এবার আমি ফিরব।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল উমা। উমা চলা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিৎও নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

ফিরবেন?

হ্যাঁ। এখান থেকে একটু এগুলেই আপনি বড় রাস্তা পাবেন। সেখানে রাস্তায় আলোও আছে, সাইকেল রিক্শাও পাবেন, আচ্ছা চলি, নমস্কার।

নমস্কার।

মুহূর্তও আর দাঁড়াল না উমা। ঘুরে চলতে শুরু করে দেয়। দেখতে দেখতে অন্ধকারে উমার ক্রমঅপসৃয়মাণ চলিষ্ণু দেহটা মিলিয়ে গেল।

রঞ্জিৎ যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

ঐ কথাটা ঝোঁকের মাথায় বলে অন্যায় করল কি সে? উমা তার কথাটায়

অসন্তুষ্ট হয় নি তো ?

ছি ছি, এত স্বল্প পরিচয়ে ঐ ধরনের কথাটা উমাকে তার সত্যিই বলা হয়তো উচিত হয় নি। কিন্তু কি যে হল কথাটা কেমন করে যেন মুখ দিয়ে বের হয়ে গেল হঠাৎ।

রঞ্জিৎ দ্রুত হাঁটতে শুরু করে।

উমা ঠিকই বলেছিল। কিছুটা পথ অগ্রসর হতেই বাঁকের মুখে বড় রাস্তার আলো দেখা গেল। গোটা দুই সাইকেল রিকৃশা ছিল, তারই একটায় উঠে বসে রিকৃশাওয়ালাকে বললে, স্টেশন চল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে আটটা পঁয়ত্রিশ। আটটা পঞ্চাশের ট্রেনটা যদি ধরতে পারে, প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ কলকাতায় পৌঁছতে পারবে।

এতক্ষণে আবার নতুন করে যেন চিত্রার কথা মনে পড়ে রঞ্জিতের। সাড়ে পাঁচটায় তার মৃণালিনী সরখেলের ওখানে যাওয়ার কথা ছিল। চিত্রা বলেছিল সে ছটা নাগাদ পৌঁছে যাবে। কিন্তু এই মাত্র যে মেয়েটিকে সে দেখে এল, উমা, ঘুণাক্ষরেও কি সে জানত এইখানে এলে তার দেখা পাবে!

চিত্রার অভিমান ভাঙানো এমন কিছু একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু আজ এখানে ঝোঁকের মাথায় আচমকা চলে না এলে উমার দুর্লভ সাক্ষাৎ তো তার মিলত না। আর ভবিষ্যতে কোন দিন পিসীমার সঙ্গে দেখা করতে এলেও উমার সাক্ষাৎ যে সে পেতই তারও কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

॥ ৮ ॥

সেদিন রামধন মিত্র লেনে পৌঁছতে পৌঁছতে মিতালীর প্রায় সওয়া পাঁচটা হয়ে গিয়েছিল। মধ্যপথে বাসে যেতে যেতে কি মনে হওয়াতে মিতালী বাস থেকে মার্কেটের কাছাকাছি নেমে পড়েছিল। বলতে গেলে প্রায় এক মাস বাদে কাকার ওখানে যাচ্ছে। একটা কথা হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায় তার।

খুড়তুত বোনদের জন্য বিশেষ করে ছোট ছোট চার জনের জন্য তাদের কিছু শখের জিনিস কিনে নিয়ে গেলে মন্দ হত না। নিত্য অভাব আর অনটনের সংসারে বেচারীরা মুখ ফুটে কোন শখের কথাই প্রকাশ করতে পারে না। আশ্চর্য শান্ত স্বভাবের হয়েছে মেয়েগুলো। ওখানে থাকতে ওদের জন্য সত্যিই মিতালীর মায়া হত বড্ড।

সংসারে অভাবের জন্য নিশ্চয়ই ওঁরা দায়ী নয়, যদিও কাকীমার ধারণা অভাবের মূলে ওরাই, এক পাল সন্তানই তাঁর সংসারে এনেছে নাকি অভাবের দারিদ্র্য।

কাকা অবিশ্যি সে ধরনের কোন কথাই বলেন না। সন্তানদের তিনি যথাসাধ্য স্নেহ ও মমতার চোখেই দেখেন এবং সাধ্যে কুলোলে তিনি যে মেয়েদের সমস্ত আদর-আব্দারকে প্রশ্রয়ই দিতেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই মিতালীর।

কিন্তু সত্যিই তাঁর সামর্থ্য নেই। আর সামর্থ্য নেই বলেই বোধ হয় ইদানীং 'ইকনমি'র ব্যাপারটা বেশী করে প্রচার করে নিজের অক্ষমতাটাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন শশিভূষণ।

আম্মা, মাম্মা, নোনাই—এদের জন্য মার্কেটের স্টল থেকে কিছু কিছু পছন্দ মত মাথার ফিতে, ক্লিপ, পাউডার, সাবান ইত্যাদি কিনে নিল মিতালী। কিনতে গিয়ে অবিশ্যি নিজেরই বরাদ্দ মাসের হাত খরচায় যে টান পড়ল, সেটা যেন উপেক্ষাই করল মিতালী। নিজেকে বঞ্চিত করে আর এক জনের মুখে আনন্দের, তৃপ্তির হাসি ফোটাবার মধ্যে যে তৃপ্তি আছে, সেই তৃপ্তির আনন্দেই মিতালী খুড়তুত বোনদের জন্য কিছু খরচ করে ফেলল।

তা ছাড়াও ঐ সময় মিতালীর অবচেতন মনের মধ্যে একটা অপরাধবোধ তাকে সর্বক্ষণ বিঁধছিল। কাকা শশিভূষণের সংসারের যে দায়িত্বের অংশটা স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছাতেই হোক তার উপার্জনের বেশির ভাগ অংশটা দিয়ে নিজের কাঁধে নিয়ে ফেলেছিল, গত এক মাস ধরে মেসে চলে যাওয়ায় সেটা সে নিজের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। সেই অপরাধবোধ যেটা এই গত এক মাসে তাকে পীড়ন থেকে নিষ্কৃতি দেয় নি, সেটা থেকে একটু মুক্তি পাবার হাস্যকর একটা প্রচেষ্টা যেন ছিল ঐ জিনিসগুলো কেনার মধ্যে। এবং যত সে গলিটা অতিক্রম করে বহুকালের পরিচিত বাড়িটার সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল ততই যেন বেশী করে মনে হচ্ছিল কথাটা তার।

শশিভূষণ গৃহেই ছিলেন।

মিতালীর সাড়া পেয়ে উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় মিতালী মেসে চলে যাওয়ায় সংসারের অভাব ও অনটনটা কতখানি উলঙ্গ হয়ে উঠেছে ইদানীং এই গত এক মাসের মধ্যেই এবং তার সমস্ত ঝক্কি সামলাতে গিয়ে তাঁকে ইদানীং কতখানি বিব্রত হতে হচ্ছে। যার ফলে অন্যায় হলেও মনটা

তাঁর মিতালীর উপরেই যেন কিছুটা বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

মিতালী কিন্তু বাড়িতে প্রবেশ করে প্রথমেই ঘনান্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে শশিভূষণের ঘরে এসে ঢুকল।

অন্ধকার মেঝেতে শয্যায় শুয়ে ছিলেন শশিভূষণ।

কয়েক বছর ধরে ইদানীং শশিভূষণ অফিস থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে শয্যায় এসে আশ্রয় নিতেন। কিছুক্ষণ ঐদিনকার সংবাদপত্রটা উল্টে-পাল্টে এক সময় ঘর থেকে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শয্যায় গা ঢেলে দিতেন। অবিশ্যি শয্যায় গা-ই ঢেলে দিতেন, ঘুমোতেন না। এবং এমন ভাবে নিঃশব্দে পড়ে থাকতেন যে ঘুমিয়েছেন কি জেগে আছেন বোঝবার উপায় ছিল না।

রাত সাড়ে নটা নাগাদ রান্না হয়ে গেলে স্ত্রী এসে ডাকেন, নিঃশব্দে উঠে নীচে নেমে যান এবং খেয়ে এসে হাত মুখ ধুয়ে আবার শয্যা নেন। উঠবেন সেই আবার পাঁচটায়। একমাত্র স্ত্রীর ছাড়া তখন কারোরই ঘুম ভাঙে না। বরাবরের জন্য এক জন ঠিকে ঝি ছিল। এত দিন সে এঁটো বাসন মেজে, রান্না ঘরটা ধুয়ে, কয়লা ভেঙে, মশলা বেটে রেখে যেত, কিন্তু মিতালী মেসে চলে যাবার পর সেই ঠিকে ঝিটিকেও তুলে দিতে হয়েছে।

মিতালীর কাকীমাকেই সে কাজগুলো অল্প একটু ভোর ভোর উঠে সেরে নিতে হয়।

মেয়েদের মধ্যে বড় টেঁপী মাকে কিছুটা সাহায্য করে। আগে অবিশ্যি মিতালী থাকতে সে-ই হাতে হাতে সকালে ও বিকেলে কাকীমার অনেক কাজ করে দিত। কিন্তু মিতালীর মত টেঁপী চটপটে নয়। সে চিরদিনই একটু ধীরস্থির। লেখাপড়াও তার বিশেষ হয় নি। বার তিনেক ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল, কিন্তু পাশ করতে পারে নি। তাই শশিভূষণ তার পড়া বন্ধ করে দিয়ে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছিলেন।

শান্ত মেয়ে বরাবরই টেঁপী। বড় একটা চেঁচামেচি করে বা জোর গলায় নিজের দাবি কোন দিনই পেশ করতে পারে নি। শশিভূষণ তাই পড়া বন্ধ করে তাকে বাড়িতে বসিয়ে রাখায় সে আপন মনে নির্জনে বসে কেবল কাঁদতেই লাগল।

মিতালীই তখন কাকাকে অনুরোধ জানায়। বলে টেঁপীর পড়ার বাড়তি খরচটা না হয় সে-ই মাসে মাসে দেবে।

কিন্তু শশিভূষণ বললেন, ভস্মে ঘি ঢালা হবে মাত্র। ও গোবর পোড়া মাথা,

দশ বছর পড়লেও কিছু করতে পারবে না। তোমার খরচ অপব্যয়ই হবে।

শশিভূষণই দেন নি খরচ করতে মিতালীকে।

অগত্যা মিতালীর চেষ্টাতেই টেঁপী ঐ পাড়ার এক নারীকল্যাণ সমিতিতে ভর্তি হয়ে সেলাই ফোঁড়াই শিখতে থাকে। দশটায় যায় ফেরে পাঁচটায়। বিনি পয়সার ব্যাপার। শশিভূষণ আর আপত্তি তোলেন নি। কাজেই টেঁপীও মাকে সংসারে সাহায্য করবার তেমন সময় পায় না।

বাদ বাকী বড়দের মধ্যে পরের দুটি মেয়ে তারা লেখাপড়ায় ভাল এবং সর্বক্ষণই লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। তারা তাড়াতাড়ি পাশ করে বেরুতে পারলে এবং একটা যা হোক কিছু কাজ পেলে সংসারের সুবিধা হবে, শশিভূষণের তাই কড়া নির্দেশ ছিল স্ত্রী যেন ওদের সংসারের কাজে না টানেন।

স্ত্রীর উপরে অবিশ্যি অতটা কড়া নিষেধ জারী না করলেও চলত কারণ নিজে থেকে কেউ তাঁর কাজে সাহায্যে এগিয়ে না এলে কোন দিন তিনি কারো কাছেই সাহায্যের প্রত্যাশী নন। মিতালী নিজে থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে সংসারের কাজে বরাবর সাহায্য করে এসেছে বলেই তিনি তার সাহায্য নিয়েছেন। না এলেও যেমন তিনি বলতেন না, তেমনি কোন অভিযোগও জানাতেন না।

কাকীমা তো বরাবর বলেই এসেছেন, গতর যত দিন আছে করে যা'ব, যখন থাকবে না যার কপালে যা আছে তখন তাই হবে।

শীতের বেলা না হলেও কার্তিকের শেষাশেষি, সাড়ে পাঁচটাতেই সন্ধ্যা হয়ে যায়। সায়াহ্নের আব্ছা আলোয় কাকীমা দাওয়ায় বসে রাত্রের তরকারি কুটছিলেন একটা থালায়। তরকারি তো ভারী, গোটা দু-তিন আলু আর বেশির ভাগই কুমড়ো। ঐ দিয়েই কোন মতে একটা ঘ্যাঁট আর ডাল হবে, তাই রাত্রের আহার। মাছ যা আসে, অগ্নিমূল্যের মাছ, এক বেলা অতগুলো প্রাণীর এক টুকরো করে হবার পর রাত্রের জন্য অবশিষ্ট একটি টুকরোও থাকে না।

অবিশ্যি মেয়েগুলো লক্ষ্মী। মাছ পায় না বলে কোন আপসোস নেই। জন্মাবধি যাদের দারিদ্র্যের সঙ্গে, অভাবের সঙ্গে পরিচয়, সংযম কতকটা বোধ হয় তাদের আপনা থেকেই জন্মায়। জীবনের সর্ব ব্যাপারে তারা বোধ হয় কিছুটা আপথ করে নিতে আপনা থেকেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

কাকীমা বঁটি পেতে থালায় তরকারি কুটে রাখছিলেন, পাশে বসে টেঁপী রাত্রের মশলাটা বাটছিল। মিতালীর প্রবেশ তাদের নজরে পড়ে না। অন্যান্য

মেয়েরা এ সময়টা থাকে না জানে মিতালী, সামনেই গলির মোড়ে একটা মাঠের মত আছে, সেখানে এ সময়টা খেলতে যায়।

বাড়ির মধ্যে তখনও কোথাও কোথাও আলো জ্বালানো হয় নি, একমাত্র শশিভূষণের অন্ধকার ঘরটা ছাড়া। ঘরটার মধ্যে এত কম আলো আসে যে বেলা সাড়ে চারটের পরই ঘরটা অন্ধকার হয়ে যায়। কম শক্তির বিদ্যুৎবাতির আলোয় মলিন শয্যাটার উপর বসে চোখে চশমা দিয়ে ঐ দিনকার বাংলা দৈনিক পত্রিকাটা পড়ছিলেন শশিভূষণ।

পায়ের জুতো জোড়া ঘরের চৌকাঠের ওধারে খুলে মিতালী ঘরে ঢুকে মৃদুকণ্ঠে ডাকে, কাকা।

কে ?

আমি মিতা।

কোন আহ্বান বা সাদর সম্ভাষণই জানালেন না শশিভূষণ ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। তার দিকে এক বার তাকিয়ে ধীরে ধীরে সংবাদপত্রটা ভাঁজ করে পাশে রাখলেন।

এগিয়ে এসে নীচু হয়ে কাকার পায়ের ধুলো নিল মিতালী।

থাক। থাক—

সামান্য ব্যবধান রেখে সেই মেঝের উপরে বিস্তৃত শয্যাতেই বসল মিতালী। তার পর হাত ব্যাগ খুলে দশ টাকার ছ'খানি নোট কাকার সামনে নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল।

নোটগুলোর দিকে এক বার তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন শশিভূষণ, কিসের টাকা ?

মাইনে পেয়েছিলাম তাই—

টাকাটা স্পর্শ করলেন না শশিভূষণ। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন, টাকা দিচ্ছিস, সেখানে তোর মেসের খরচ চলবে কি করে ?

তা চলে যাবে।

অনটন করে তো ?

না, না—কিচ্ছু অনটন হবে না।

হবে রে হবে! এ টাকা তুই তুলে রাখ মা তোর কাছে।

না, আপনি রাখুন।

বিষণ্ণ হাসি হাসিলেন শশিভূষণ, বেশ মা, রাখছি। দুঃখটা এমনি জিনিস যে তাকে এড়াতে চাইলেই বোধ হয় এড়ানো যায় না। নইলে আমার দুর্ভাগ্যের

সঙ্গেই বা তুই এমন করে জড়িয়ে পড়বি কেন ?

কাকা—

দাদার একমাত্র মেয়ে তুই। দাদা বেঁচে থাকলে এত দিনে হয়তো তুই সুখেই সংসার করতে পারতিস।

মিতালী প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। বলে, সামনের মাস থেকে বোধ হয় মাইনে আবার বাড়বে কাকা। অন্য একটা পোস্টে লিফট্ পাচ্ছি। মাইনে তখন একশো আশির মত হবে—

কিন্তু সে কথায় যেন কানই দিলেন না শশিভূষণ। সম্পূর্ণ অন্য এবং অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

মিতু।

কিছু বলছিলেন ?

একটু যেন ইতস্তত করলেন শশিভূষণ। কথাটা বলতে গিয়েও যেন একটা সংকোচ বোধ করেন। এবং একটু যেন আমতা আমতা করেই কথাটা বললেন, একটা কথা অনেক দিন থেকেই তোকে বলব বলব ভেবেছি কিন্তু বলতে পারি নি। কিন্তু কথাটা আজ তোকে বলছি, লেখাপড়া শিখেছিস এবং বুদ্ধি বিবেচনাও তোর হয়েছে আর তোর বুদ্ধি ও বিচারের উপরে আমার আস্থাও আছে মিতু—

একটু বিস্মিত হয়েই যেন মিতালী চেয়ে থাকে তার চিরদিনের রাশভারী কাকার মুখের দিকে, সত্যি কথা বলতে কি কাকার কথা সঠিক হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারে না বলেই। বুঝতে পারে কিছু একটা বলতে চান কাকা তাকে এবং ভণিতাটা তারই। কিন্তু সেটাই যেন সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কিসের ভণিতা।

আমার দিক থেকে, শশিভূষণ বলতে লাগলেন, সম্পূর্ণ অনুমতিই তোকে আমি দিয়ে রাখছি মা, যদি তেমন কোন তোর যোগ্য পাত্র পাস তো তাকে তুই বিয়ে করিস।

বিস্ময়ে চেয়ে থাকে মিতালী তার কাকার মুখের দিকে। কাকার মুখ থেকে ঐ ধরনের কথা সে কোনদিন শুনবে সত্যিই তার যেন স্বপ্নের অতীত ছিল।

হ্যাঁ মা, তুই বিয়ে করিস। শশিভূষণ বলে চলেন, যে পথে তুই চলেছিস্ তাতে গ্রাসাচ্ছাদন হলেও এবং সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকলেও সত্যিকারের তৃপ্তি পাবি না, সত্যিকারের মন ভরবে না—সত্যিকারের সুখ পাবি না। আমি

পারলাম না মা, কিন্তু আজকাল তো শুনেছি তোদের মত অনেক চাকুরে মেয়ে-দের কারও কারও বেশ ভাল বিয়েই নাকি হয়েছে আর হচ্ছেও, সে ধরনের কোন সম্ভাবনা যদি তোর জীবনে মা কখনও আসে আমাকে জানাস, আমি দাঁড়িয়ে থেকে তোদের বিয়ে দেব।

ঘরের স্বল্পালোকেও নজরে পড়ে মিতালীর, কথাগুলো বলতে বলতে শশিভূষণের চোখের কোল দুটো জলে যেন ছলছল করছে। সজল চোখের কোল দুটো ঘরের স্বল্পালোকেও চিক্‌চিক্ করছে।

সিঁড়িতে আন্না, মান্না ও নোনাইয়ের কলকণ্ঠ শোনা গেল। খেলা সেরে তারা ফিরল বোধ হয়।

সংসার বাঁধতে ভয় করিস না মা, সংসার মানেই দুঃখ আর অভাববোধ নয়। বিবেচনা করে আমি চলতে পারি নি জীবনে, তাই আমি দুঃখ পেয়েছি আর পাচ্ছিও কিন্তু তাই বলে তো সেটাই আর কিছু সত্য নয়।

ঐ সময় কাকীমা শশিভূষণের জন্য এক কাপ চা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।

স্বামীর সামনে মিতালীকে বসে থাকতে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, মিতু! কখন এলি তুই?

এই কিছুক্ষণ কাকীমা।

মিতালী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে কাকীমার পায়ের ধুলো নেয়।

স্বামীর সামনে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখেন কাকীমা। তার পর মিতালীর দিকে তাকিয়ে বলেন, চল্, চা খাবি চল্—

চল—

মিতালী উঠে দাঁড়াল।

মিতালী কাকীমার সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। পিছন থেকে শশি-ভূষণ বললেন, রাত্রে কিন্তু খেয়ে যাস মিতু।

মিতালী ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে কাকীমার পিছনে পিছনে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

খুড়তুতো বোনেরা মিতালীর আসার সাড়া পেয়ে সকলে তার পাশে ছুটে এসে ভিড় করে।

অনেক দিন বাদে রাত্রে সামান্য কুমড়োর ঘ্যাঁট ও ডাল দিয়ে গরম গরম ভাত খেয়ে মিতালী যেন অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করে। মেসে ফেরার পথে দোতলা বাসের

উপরতলায় বসে আসতে আসতে সেই তৃপ্তির আমেজটাই অনুভব করতে থাকে মিতালী। কয়েকটা ঘণ্টা রামধন মিত্র লেনে চমৎকার কাটল। এবং মনে মনে মিতালী স্থির করে, এবার থেকে মধ্যে মধ্যে সে রামধন মিত্র লেনে সময় করে যাবে।

যে বাড়ীর রুদ্ধ বায়ু আর ক্ষুদ্র পরিবেশ এক দিন তার মনে হাঁফ ধরিয়েছিল, যেখান থেকে একদিন অন্য যে কোনখানে ছুটে বেরিয়ে আসবার জন্য মনটা ছট্‌ফট্ করেছে ও বাড়িতে থাকার প্রতিটি মুহূর্তে, অফিস ফেরতা যে বাড়িতে ফিরে যাবার কথা চিন্তা করলেই মনটা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে, আশ্চর্য, আজ সেই রামধন মিত্র লেনের বাড়িটাই যেন তার মনটাকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভরিয়ে দিল।

শুধু কি বাড়িটাই। কাকা কাকীমা, টেঁপী, ছেনী, আন্না, মান্না, নোনাই— তাদেরও যেন মনে হচ্ছে কত আপনার। রামধন মিত্র লেনের বাড়িটায় যতই অভাব থাক, যতই দারিদ্র্য থাক, তবু যেন তারই মধ্যে একটা প্রাণের, একটা স্নেহ ও ভালবাসার স্পর্শ আছে।

আর, আর একটা কথাও মনে পড়ে ঐ সঙ্গে। কাকার সেই কথাগুলো. সম্পূর্ণ অনুমতিই তোকে আমি দিয়ে রাখছি মা, যদি তেমন কোন তোর যোগ্য পাত্র পাস তো তাকে তুই বিয়ে করিস।

বিয়ে!

কাকা কি সত্যিই আজ তাকে কোন নতুন কথা বলেছেন? যে পথে সে আজ চলেছে সে পথে আত্মসম্মান ও গ্রাসাচ্ছাদন করে বেঁচে থাকলেও সত্যি-কারের তৃপ্তি বা সুখ সে পাবে না! সত্যিকারের মন ভরবে না! সেই কারণেই কি সে প্রবীরকে কেন্দ্র করে একটি নিরালা গৃহকোণের স্বপ্ন দেখে নি? কথাটা তো নতুন নয়। তার মনের গোপন নিভৃতে এমনি একটি মধুর আকাঙ্ক্ষাই কি কত সময় অন্ধকার রাত্রে তার নিভৃত শয্যায় তাকে রোমাঞ্চিত করে নি, কণ্টকিত করে নি! নারীদেহের, নারীমনের আত্মোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা তাকে স্বপ্নাতুর করে নি!

চলন্ত বাসের দোতলায় বসে বসে সেই স্বপ্নেই যেন বিভোর হয়ে যায় মিতালী।

॥ ৯ ॥

রাত এগারোটা বেজে গেল এবং তখনও যখন রঞ্জিৎ এল না, চিত্রা আর দোতলার সেই ঘরে যেন টি˜কতে পারে না। সে দরজা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

মৃণালিনী ও তার স্বামী হরগোবিন্দ তখন আহারে বসেছে। সিঁড়িতে পায়ের পায়ের শব্দ পেয়ে ওরা তাকিয়ে দেখল চিত্রা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

মৃণালিনী বিস্ময়েই প্রশ্ন করে চিত্রাকে, কি ব্যাপার, এত রাত্রে আবার কোথায় চললে?

মেসে যাচ্ছি।

সে কি এত রাত্রে? রঞ্জিৎবাবু কোথায়?

সে আসে নি—

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না চিত্রা। তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দরজার দিকে এগুতে এগুতো বললে, দরজাটা দিতে বল তোমার চাকরকে।

চিত্রা ওদের সামনে দিয়েই বেরিয়ে গেল।

হরগোবিন্দ মৃণালিনীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, কি ব্যাপার?

জানি না। দু'জনে আজ এখানে রাত কাটাবে তো কথা ছিল।

তবে কি হল?

বুঝতে পারছি না।

হরগোবিন্দ মৃদু হাসেন।

হাসছ যে?

দেখ, রঞ্জিৎবাবু হয়তো অন্য কোথায়ও বাসা বেঁধেছেন।

তোমাদের পুরুষের পক্ষে সেটা কিছু আশ্চর্যের নয়। গম্ভীর কণ্ঠে মৃণালিনী বলে।

মৃদু হেসে হরগোবিন্দ বললেন, যত দোষ বুঝি পুরুষ জাতেরই। তোমরা মেয়েরা একেবারে গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতাটি।

তা নয়তো কি। ছলা-কলায় তো ওস্তাদ তোমরাই। মন ভোলাবার জন্য কত অভিনয়ই না কর, তার পর যেমন শখ মিটে গেল সম্পর্কও চুকে গেল তোমাদের।

হরগোবিন্দ বেচারার একটা কথা মুখে এসে গিয়েছিল, কিন্তু সামলে নেন নিজেকে। জবাব দিলে হয়তো বাকী রাতটা তার জেরের ঝড় ঝাপ্টা সামলাতে

হবে। কিন্তু হরগোবিন্দ নির্বিরোধী মানুষ এবং ক্ষেত্র বিশেষে চুপ করে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ, অতএব মৃদু হেসে চুপচাপ পুনরায় মাংসের একটা টুকরো বাটি থেকে তুলে সেটা মুখে পুরে তার রসাস্বাদনে নিমগ্ন হন।

মৃণালিনী ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে।

যাই, ঘরটা খোলা পড়ে রইল, তালাটা দিয়ে আসি গে। কথাটা বলতে বলতে বেসিনের ট্যাপটা খুলে হাত মুখ ধুতে থাকে।

হাত ধুয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল মৃণালিনী ঘর থেকে চাবিটা নিয়ে। ঘরে ঢুকে দেখে, ঘরের আলোটা জ্বলছে, পাখাটাও বন্ বন্ করে ঘুরে চলেছে।

বিরক্তিতে ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে মৃণালিনীর। বিড় বিড় করে বলে, নবাব-নন্দিনী পাখাটা আর আলোটাও অফ করে দিয়ে যেতে পারে নি।

ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করে পাখা ও আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘরের দরজায় তালা দিয়ে সে নীচে নেমে এল।

ইতিমধ্যে হরগোবিন্দর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক হাত মুখ ধুয়ে নিজের চেয়ারে বসে স্ত্রীর অর্ধভুক্ত আহার্যের প্রতি নজর রাখতে রাখতে একটা সিগ্রেট্ ধরিয়ে ধূমপান করছিলেন।

ঘরে ঢুকে চাবিটা যথাস্থানে রেখে মৃণালিনী ভুক্তাবশিষ্ট পাত্রগুলি টেবিলের উপর থেকে তুলতে শুরু করে।

কি হল, খাবে না?

না। মৃণালিনী মৃদু কণ্ঠে স্বামীর কথার জবাব দেয়।

মিথ্যে মিথ্যে তাড়াহুড়ো করে উঠে গেলে, খাওয়া হল না। দু'দণ্ড পরে গেলেই বা কি হত।

স্বামীর কথার জবাব না দিয়ে টেবিল পরিষ্কার করতে করতে মৃণালিনী বলে, চিত্রা যেমন কানা বুঝতে পারে না। আরে যতই সাজগোজ করিস আর ছেলেমানুষটি সেজে থাকিস মেঘে মেঘে বেলা তো কম হল না। ওর যে তোর অর্ধেক বয়েস।

হরগোবিন্দ পূর্ববৎ ধূমপান করে চলেন।

মৃণালিনী আপন মনেই বক্ বক্ করে চলে, আজ আবার বলছিল দু' মাস পরে রঞ্জিতের লিফট্‌টা হলেই নাকি ওদের বিয়ে হবে। রঞ্জিৎ তো আর হাঁদারাম নয়, দেড়া বয়সী ওকে গলায় ঝোলাবে।

মৃণাল।

মেলে। কিন্তু সংবাদ নিয়ে আনল, রঞ্জিৎ তখনও মেলে যেত্রে নি। রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে ফুলতে চিত্রা ফিরে এল হোস্টেলে রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ। সমস্ত হোস্টেলটা তখন প্রায় নিঝুম হয়ে এসেছে। সমস্ত ঘরের আলো নিভে গিয়েছে। গেটও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, দারোয়ানকে ডেকে গেট খুলিয়ে চিত্রা ভিতরে প্রবেশ করল। বিকেলের দিকে তাড়াতাড়িতে জলখাবার পর্যন্ত না খেয়েই বের হয়ে গিয়েছিল এবং তখনও পর্যন্ত পেটে কিছু পড়ে নি। তবু যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা সে এক প্রকার তখন ভুলেই গিয়েছিল।

নিজের ঘরে এসে প্রবেশ করে, সাজ-পোশাক পর্যন্ত না বদলে সোজা গিয়ে অন্ধকারেই শয্যার উপরে উপুড় হয়ে পড়ল। এতক্ষণ ধরে যে হতাশা ও অপমানের বেদনাটা তার মনের গহনে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছিল অথচ বাইরে তার কোন প্রকাশ ছিল না, সেটাই যেন অবাধ্য অশ্রুর আকারে তার দু'চোখের কোল বেয়ে অজস্র ধারায় নেমে এল।

ঘর অন্ধকার। দরজা খোলাই রইল।

॥ ১০ ॥

ঠিক তার নীচের ঘর।

" বার নম্বর ঘরটাও অন্ধকার ছিল বটে কিন্তু রাণু সেন জেগেই ছিল। রাণুর চোখেও ঘুম ছিল না। তার দু' চোখের কোল বেয়ে চিত্রার মত জল না ঝরলেও বুকের নিভৃতে কিন্তু অশ্রু ঝরছিল। এবং শুধু সেই রাত্রেই নয়, প্রতি রাত্রেই বুঝি ঝরত। যেদিন সে পার্থ চৌধুরীকে ফিরিয়ে দিয়েছিল এবং ফিরিয়ে দেবার পর প্রথম রাত্রে যে কান্নাটা তার বক্ষের নিভৃতে গুমরে উঠেছিল, সে কান্নার বুঝি আর শেষ হল না।

আজও রাতের অন্ধকারে বুকের মধ্যে তার গুমরে গুমরে ওঠে সেই কান্নাটা আর মনে পড়ে পার্থকে। পার্থ আজ কোথায়, কত দূরে।

বছর দুই আগে কৃষ্ণ আয়ারের চিঠিতে জেনেছিল জার্মানীর এক নিভৃত পল্লীতে নাকি ছোট একটা বাড়িতে রয়েছে পার্থ। অত দিনকার তার সাধনা, এদেশের ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী, ওদেশের ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী কোন কাজেই লাগল না পার্থ চৌধুরীর। অত বড় একটা ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিভা আজ রং, তুলি আর ক্যানভাসের মধ্যেই নাকি দিবারাত্র ডুবে আছে।

কৃষ্ণ আয়ারের চিঠিটা পড়ে সেদিন রাণুর ইচ্ছা হয়েছিল একটা চিঠি সে দেয় পার্থকে।

লেখে, এ তুমি কি করছ পার্থ। তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্য এত বড় একটা ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিভাকে তুমি কিনা রং রেখা আর ক্যানভাসের মধ্যে অপমৃত্যু ঘটালে! কেমন করে তুমি ভুললে বিধাতা তোমাকে রং আর তুলি দিয়ে এ জগতে পাঠান নি, যন্ত্রের আশীর্বাদ দিয়ে তোমাকে যে পাঠিয়েছিলেন!

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে তাকে সেটুকু লেখবারই বা আজ তার অধিকার কোথায়? কোন অধিকারই তো তার আজ পার্থ চৌধুরীর উপরে নেই।

শেষ বিদায়ের দিন বম্বে পোর্টে দাঁড়িয়েও শুধিয়েছিল পার্থ, শুধু তুমি আমাকে গ্রহণ করতে অক্ষম বলেই আমাকে ফিরিয়ে দিলে রাণু, কিন্তু কেন যে তুমি অক্ষম সেটুকুও যদি আজ জেনে যেতে পারতাম তবে হয়তো বাকী জীবনের জন্যও আমার একটা সান্ত্বনা থাকত।

তবু মুখ খুলতে পারে নি রাণু, তবু একটাও কথা উচ্চারণ করতে পারে নি।

দূর সাগর-পাল্লার জন্য জাহাজটা তখন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জাহাজটা ভাসবে দূর পথে। মধ্যাহ্নের সূর্যকিরণে সাগরের জল ঝিলমিল করে যেন চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। কাস্টমসের পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে, যাত্রীরা একে একে জাহাজে উঠছে গ্যাংওয়ের উপরে ফেলা কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে বেয়ে।

রৌদ্র-ঝিলমিল সাগর-জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রাণু। অল্প দূরে দাঁড়িয়ে ছিল ওদের উভয়ের পরিচিত বন্ধু, বিণু বর্ধন। বিণু বর্ধন যেন ইচ্ছা করেই ওদের দুজনার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল।

জাহাজ ছাড়ার সময় এগিয়ে আসছে, যাত্রীদের সব এবারে জাহাজে উঠে যেতে হবে। আর সময় নেই।

পার্থ তাকাল রাণুর দিকে। মৃদু কণ্ঠে ডাকল, রাণু—

মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে ডাকে রাণু পার্থর দিকে।

যাবার আগে একটা কথা আমাকে দেবে?

কি?

যদি কখনও তোমার আজকের মতের পরিবর্তন হয় তুমি আমাকে জানাবে।

সে কথার কোন জবাব দেয় নি রাণু। শুধু একটু মৃদু করুণ হাসি হেসেছিল। মুহূর্তকাল রাণুর সেই করুণ হাস্যম্লিত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদুকণ্ঠে

তখন বলেছিল পার্থ, বুঝলাম, সেটুকু আশাও আজ তুমি আমাকে নিয়ে যেতে দেবে না। আচ্ছা চলি—

পার্থ এগিয়ে গিয়েছিল জাহাজে ওঠবার সিঁড়িটার দিকে। ফিরে তাকায় নি সে পিছনের দিকে আর একটি বারও। বলিষ্ঠ চওড়া মানুষটা তার পর যেন যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে গিয়েছিল। আর দেখা যায় নি পার্থকে।

যদিও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে জাহাজের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাণু গ্যাংওয়েতে, তবু আর পার্থকে দেখতে পায় নি। ক্রমশঃ সিঁড়ি উঠে গেল। ভোঁ দিয়ে জাহাজ সচল হল। তীরভূমি থেকে ধীরে ধীরে সরে গেল। যাত্রীরা ভিড় করে এসে ডেকে দাঁড়িয়েছে। তীরে দণ্ডায়মান তাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিচ্ছে।

সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে বার বার তাদের মধ্যে খুঁজেও আর কারুর দেখা পায় নি রাণু।

তবু দাঁড়িয়েই ছিল রাণু, তবুও নড়ে নি। কিন্তু ক্রমশঃ জাহাজটা যখন অনেক দূরে অস্পষ্ট হয়ে গেল, তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখেই বোধ হয় বিণু বর্ধন বলেছিল, হোটেলে ফিরবে না রাণু?

অ্যাঁ, চমকে ফিরে তাকিয়েছিল রাণু।

দু-একটি পোর্টার ও তারা দু'জন ছাড়া তখন আর সেখানে কেউ নেই। সবাই চলে গিয়েছে।

হোটেলে ফিরবে না রাণু?

হ্যাঁ চল।

হোটেলে ফিরে এসে রাণু একেবারে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

টেবিলের উপরে বাবার ফটোটা ছিল। ব্যারিস্টার রাধেশ সেন। ফটোটার সামনে এসে চাপা কান্নায় যেন ভেঙে পড়েছিল রাণু।

বাবা, তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি সে প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করি নি। ফিরিয়ে দিয়েছি, পার্থকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।

হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করেছিল এক দিন রাণু তার বাবার কাছে।

রাধেশ সেন যেদিন তাকে ডেকে তাঁর দুঃখের কথা, তাঁর সারা জীবনের হাহাকারের কথা একমাত্র সন্তান রাণুকে বলেছিলেন এবং সব কথা বলবার পর বলেছিলেন, রাণু, তোমার মার রক্তর আর আমার ব্যর্থতার ও অপরিণামদর্শিতার ইতিহাস যেন তোমার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়, সন্তান হিসাবে এইটুকুই তোমার কাছে আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি আর কিছু নয়। তুমি যদি আমাকে তোমার

জন্মদাতা বলে ভালবেসে থাক, যদি এতটুকু শ্রদ্ধাও কোন দিন করে থাক আমাকে তা হলে ঐটুকু থেকে বঞ্চিত করো না।

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাণু বাপ রাধেশ সেনকে।

রাধেশ সেন তবু বলেছিলেন, জানি আমি সামনে তোমার সমস্ত জীবন পড়ে আছে, সেদিক দিয়ে প্রার্থনাটা আমার তোমার কাছে অসঙ্গত তো বটেই অসম্ভবও, তাই আদেশ নয় এটা আমার শুধু প্রার্থনাই রইল তোমার কাছে।

রাণু বলেছিল, তাই হবে বাবা। তোমাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাণু। কিন্তু তখন কি সে জানত, বাবার মৃত্যুর দু বছরের মধ্যেই তার জীবনে একেবারে মধ্যখানটিতে এসে দাঁড়াবে পার্থ চৌধুরী এবং তাকে মুহূর্তে জয় করে নেবে, তাকে রিক্ত নিঃস্ব করে দেবে।

ব্যথা পেয়েছিলেন রাধেশ সেন সত্য, কিন্তু বাবাকে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতি যে তার শতগুণ বেশী ব্যথা হয়ে তার বুকে এসে সারা জীবনের মত পাষাণভার হয়ে বসবে তা কি সেদিন সে জেনেছিল।

বিলেতে গিয়ে প্রেমে পড়ে ব্যারিস্টার রাধেশ সেন বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন রাণুর মা, আইরিশ দুহিতা গ্লোরিয়া ও'নিলকে।

যৌবনের রঙিন নেশায় সেদিন তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী হবার মত মেয়ে বুঝি ভারতবর্ষে নেই। সংস্কৃতজ্ঞ কবিরত্ন শ্যামদাস সেনের একমাত্র পুত্র রাধেশ সেন ভারতবর্ষে তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী হবার মত কোন মেয়েকে খুঁজে পান নি। তাই তিনি সাগরপারে গিয়ে আইরিশ মেয়ে গ্লোরিয়া ও'নিলকে বিবাহ করে ভারতবর্ষে ফেরার পথে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

বাপের ইচ্ছা ছিল তাঁর তীক্ষ্ণধী পুত্র, যাবতীয় পরীক্ষায় যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে বারবর পাশ করে এসেছে, সে সিভিলিয়ান হয়। কিন্তু দীর্ঘ তিন বছর বাদে ছেলে ফিরে এল সিভিলিয়ান হয়ে নয়, ব্যারিস্টার হয়ে এবং একেবারে বিদেশিনী বধূকে সঙ্গে নিয়ে।

তথাপি পুত্রস্নেহে অন্ধ কবিরত্ন পুত্র ও পুত্রবধূকে সাদরেই গ্রহণ করেছিলেন, এবং সাধ্যমত ইংরাজ-বধূর আরামে ও স্বচ্ছন্দে থাকবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশী দিন তাঁদের রাখতে পারলেন স্বগৃহে। রাধেশ সেনের পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই গ্লোরিয়া ক্যামাক স্ট্রীটে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে উঠে গেল। রাণু তখন দুই বছরের শিশু।

পৃথক ফ্ল্যাটে চলে আসার যে খুব ইচ্ছা ছিল রাধেশ সেনের সেদিন তা নয়। কিন্তু তাঁর পসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই গ্লোরিয়ার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। গ্লোরিয়া ও'নিল ছিল সেই প্রকৃতির মেয়ে যাদের জীবনে বিলাসিতা এবং নিজেকে সকলের সামনে সর্বতোভাবে মেলে ধরাটাই একমাত্র কাম্য ও আনন্দ। এবং সেই জন্যই স্বামীর চাইতে তার বেশী প্রয়োজন ছিল স্বামীর অর্থের। আর সেইখানেই শুরু হয়েছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব।

সারা দিনের কর্ম ক্লান্তির পর রাধেশ যখন গৃহে ফিরে এসে মনে মনে চাইতেন নিরালা শান্ত একটি গৃহকোণ, মনে মনে চাইতেন স্ত্রীকে, সেই সময়টা বেশির ভাগই হয় গৃহে থাকত না গ্লোরিয়া, না হয় গৃহে থাকলেও হৈ-চৈ নাচ গান নিয়ে পুরুষ ও মেয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে থাকত ব্যস্ত। একমাত্র মেয়ে রাণুকে পর্যন্ত দেখত না গ্লোরিয়া। সে পড়ে থাকত আয়ার কাছে।

রাধেশ সেন যা আয় করতেন তার সবটাই প্রায় চলে যেত গ্লোরিয়ার খরচে। তবু যেন গ্লোরিয়া সন্তুষ্ট ছিল না। তার অভাব নাকি মিটছে না। অভিযোগের তার অন্ত ছিল না যেন।

স্ত্রীর ব্যবহারে দিন দিন যেন রাধেশ সেন ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগলেন। বিরক্তিতে ধৈর্যের যেন একেবারে শেষ সীমানায় এসে দাঁড়াতে লাগলেন। তবু তিনি প্রতিবাদ জানান নি। যে গরল নিজে হাতে গলায় তুলে নিয়েছেন সে গরল আজ যদি সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরায়, সে তাঁর নিজেরই কৃতকর্মের ফল। দোষ দেবেন তার জন্য রাধেশ আর কাকে।

দীর্ঘ চার বছর ধরে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত স্ত্রীর অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছিলেন রাধেশ সেন। তার পর এক দিন বুঝি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, যেদিন তিন রাত্রি এক জন তরুণ লেফটেনেণ্ট্ মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে কাটিয়ে ঘরে ফিরে এল গ্লোরিয়া।

ইদানীং স্ত্রীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বছর দুই ধরে এক প্রকার রহিতই করেছিলেন রাধেশ সেন। আলাদা চরে আলাদা শয্যায় শিশুকন্যাকে নিয়ে শুতেন। স্ত্রীর চেহারাটা চিন্তা করলেই কেমন যেন তাঁর ঘৃণা হত। একটা ক্লেদাক্ত অনুভূতিতে সমস্ত শরীরটা তাঁর ঘিন্ ঘিন্ করত। এমন কি এক বাড়িতে থেকেও যাতে করে স্ত্রীর মুখোমুখি না পড়তে হয় সেই ভাবেই তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতেন।

তিন রাত্রি পরে সেদিন বিকেলের দিকে গ্লোরিয়া যখন ফিরে এল, অনেক

দিন পরে রাধেশ সেন স্ত্রীর ঘরে এসে ঢুকলেন। গ্লোরিয়া এসে তখনও বেশভূষা বদলায়নি। সোফার উপরে ক্লান্ত দেহভার এলিয়ে বেয়ারাকে এক কাপ চা দেবার কথা বলে চোখ বুজে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে নাচতে নাচতে গুন গুন করে একটা গানের সুর ভাঁজছিল।

রাধেশ সেন এসে স্ত্রীর ঘরে ঢুকলেন, গ্লোরি—

কে? গ্লোরিয়া চোখ মেলে তাকাল। তার পরেই বললে, আশ্চর্য! তুমি আমার ঘরে, কি মনে করে? এত দিনে তা হলে তোমার গ্লোরিকে মনে পড়ল? বসো, বসো—বি সীটেড প্লীজ—

না। বসতে আমি আসি নি গ্লোরি।

তবে কি জন্য এসেছ!

তিন রাত তুমি কোথায় ছিলে সেটাই শুধু জানতে এসেছি।

ছিলাম কোথায়?

হ্যাঁ।

অফ্ কোর্স সাম হোয়ার অন দিস আর্থ! কিন্তু সত্যিই তুমি বসবে না নাকি।

না।

রাগ করছ ডার্লিং! রিয়েলি ইউ হ্যাভ চেঞ্জড এ লট্। রাদার চেঞ্জড্ বিয়ণ্ড্ ইমাজিনেশন।

আজ তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই গ্লোরি।

উইথ্ প্লেজার।

সত্যি, সত্যিই তুমি আমার সঙ্গে ঘর করতে চাও কিনা জানতে চাই আমি।

হাউ সিলি। হাসতে হাসতে গ্লোরিয়া বলে, ঘর করব না তো যাব কোথায়? আর তোমাকে ভালবেসে তোমার সঙ্গে ঘর করব বলেই না আত্মীয় বন্ধুবান্ধব এমন কি নিজের দেশভূমি পর্যন্ত ছেড়ে এসে এখানে পড়ে আছি।

অত্যন্ত কঠিন এবং মৃদু একটা হাসি রাধেশ সেনের ওষ্ঠপ্রান্তে জেগে উঠল। বললে, হ্যাঁ, সেজন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দেব নিশ্চয়ই জেনো আমার সারাটা জীবন ধরে, কিন্তু সেটা আমার একান্তই নিজস্ব কথা, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই আজই প্রথম ও শেষবারের মত, এ দেশের সমাজ ও নীতি অনুযায়ী এদেশের ভদ্রঘরের স্ত্রীর মত ভদ্রভাবে আমার ঘরে থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা?

তার মানে? হোয়াট্ আর ইউ ড্রাইভিং এ্যাট্?

কথাটা তোমার না বোঝবার মত কিছু তো নয়। অত্যন্ত স্পষ্ট। তোমার এই উচ্ছৃংখলতা আমার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভবপর হচ্ছে না।

আই সি।

গ্লোরিয়া সোফা থেকে উঠে পড়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করল। ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে সামনে টীপয়ে ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল। কিন্তু সে দিকে গ্লোরিয়া ফিরেও তাকাল না। যেমন পায়চারি করেছিল তেমনিই করতে লাগল। এবং হঠাৎ এক সময় পায়চারি থামিয়ে সোজাসুজি একেবারে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আর যদি তা আমার পক্ষে সম্ভব না হয়?

তা হলে আমাদের দুজনারই পৃথক হয়ে যাওয়াটাই কি বিবেচনার কাজ হবে না? নিত্য এই অশান্তির চাইতে—

এই তা হলে তোমার শেষ কথা?

হ্যাঁ—

বেশ। তা হলে তুমি আমার বিলেত ফিরে যাবার এবং সেখানে মেইন্টেনেন্সের ব্যবস্থা করে দাও।

তাই করব।

রাধেশ সেন অতঃপর সেই ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন।

পরস্পরের মধ্যে ডিভোর্স শেষ পর্যন্ত না হলেও বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। এবং তার পর রাধেশ সেন যে ক' বছর বেঁচে ছিলেন, নিয়মিত প্রত্যেক মাসে হাজার দুই করে টাকা বিলেতের একটা ব্যাংকের ঠিকানায় গ্লোরিয়াকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি মত পাঠিয়ে গিয়েছেন। এবং গ্লোরিয়া সেই টাকা দিয়ে ব্যভিচার আর উচ্ছৃংখলতার মধ্যে ভেসে বেড়িয়েছে।

রাধেশ সেন তো আর দ্বিতীয় বার বিবাহ করেনই নি, গ্লোরিয়াও নাকি করে নি। গ্লোরিয়াকে অবিশ্যি এ প্রতিশ্রুতিও দিয়ে ছিলেন রাধেশ সেন, গ্লোরিয়া যে মুহূর্তে ডিভোর্স চাইবে, সে পাবে। কিন্তু যে কারণেই হোক রাধেশ সেন তার পর যত দিন বেঁচে ছিলেন গ্লোরিয়া ডিভোর্স চায় নি। সেই কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক রাধেশ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর উইলে দেখা গিয়েছিল বিদেশিনী স্ত্রীকে তিনি নগদ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন এবং তাঁর বাদ বাকী যা কিছু, দিয়ে গিয়েছেন তাঁর একমাত্র সন্তান কন্যা রাণুকে।

রাধেশ সেন রাণুর জন্য যা রেখে গিয়েছিলেন তাও প্রায় লাখ খানেকের কাছাকাছি হবে। কিন্তু রাণু সে অর্থ পরে দান করে দিয়েছিল এক নারীকল্যাণ সমিতিতে।

বাপ রাধেশ সেনকে রাণু যে কেবল স্নেহময় বাপ হিসেবেই পেয়েছিল তাই নয় শুধু, জীবনের অন্যতম বন্ধু হিসেবেও বুঝি পেয়েছিল। তাই অপরিসীম একটা শ্রদ্ধা ছিল বরাবর বাপের প্রতি রাণুর।

সেই বাপ মৃত্যুর মাত্র তু' দিন আগে রাণুকে মাত্র একটি কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, একটা কথা তোমাকে আমার বলে যাবার ইচ্ছা আছে রাণু।

কি বাবা?

যদিও জানি কথাটা আমার একান্ত স্বার্থপরের মতই বলা তবু—

কি কথা বাবা?

যদি সম্ভব হয় তো কখনও বিয়ে করো না। যে রক্ত তোমার শরীরে আছে সেই রক্ত তোমার সন্তানদের মধ্যে প্রবাহিত যাতে না হয় সেই কারণেই কথাটা আমি বলছি রাণু।

বাবা—

হ্যাঁ মা, সে রক্তের মধ্যে বিষ আছে। আর সে বিষে যে কি জ্বালা আমার সারাটা জীবন দিয়ে জেনেছি বলেই, আমি বলে যাচ্ছি সম্ভব হলে সে সম্ভাবনার পথকে তুমি প্রশ্রয় নিও না।

তাই হবে বাবা।

আমি হয়তো নিতান্ত অন্যায় অনুরোধ তোমায় করে যাচ্ছি কিন্তু—

আমি প্রতিজ্ঞা করছি বাবা, তাই হবে। বিয়ে আমি করব না।

ইতিপূর্বে কখনও কোন দিনের জন্য তার মা গ্লোরিয়া চলে যাবার পর দীর্ঘ ন' বছর বাপের মুখ থেকে তার সম্পর্কে কোন কথা উচ্চারিত হতে শোনে নি রাণু।

ঐ প্রথম এবং ঐ শেষ। এবং ঐ একটি দিনের মাত্র কয়টি কথা থেকেই রাণু সেদিন বুঝতে পেরেছিল কি অপরিসীম ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা তার মা ঐ শান্ত নির্বিকার মানুষটার বুকের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে গিয়েছিল।

আর সে যে কি জ্বালা তাও বুঝতে আর বাকী ছিল না বুঝি রাণুর, একমাত্র সন্তানের প্রতি বাপের ঐ অনুরোধটি শোনবার পরে।

॥ ১১ ॥

বাপের কাছে যে প্রতিজ্ঞা এক দিন রাণু করেছিল, সেই প্রতিজ্ঞাই বুঝি রাণুকে তার পর থেকে সমস্ত পুরুষ জাতটার প্রতি বিমুখ করে রেখেছিল। এবং মনে মনে ভেবেছিল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে তার বাকী জীবনটা বুঝি অনায়াসেই কাটিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল বুঝি অন্যরূপ। অকস্মাৎ পার্থ একেবারে তার জীবনের মাঝখানটিতে এসে দাঁড়াল।

এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে নিশ্চিন্ত দীর্ঘ এক অবসর কাটাতে গিয়েছিল রাণু পুরীর সমুদ্রতীরে।

অগ্রহায়ণের স্বরু তখন। সবে বাতাসে একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব দেখা দিয়েছে। শীতের সমুদ্রও তখন অনেকটা স্থির শান্ত। একেবারে সী বীচের উপর পুরী ভিউ হোটেলে গিয়ে উঠল রাণু।

ছোট হোটেলটি। সাধারণ হোটেলের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য কিছুই নেই। ছোট একতলা একখানা বাড়ির খান পাঁচেক ঘর নিয়ে মাত্র হোটেলটি। হোটেল না বলে বরং বলা যেতে পারে বিদেশ বিভূঁয়েও একটি সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশ।

হোটেলের মালিক একজন অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক। যেমন অমায়িক তেমনি ভদ্র। অফ-সীজ্‌ন চলেছে তখন পুরীতে, চেঞ্জারদের ভিড় নেই। এক মাস থাকব এই কড়ারে পুরী ভিউ হোটেলের সম্পূর্ণ একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে নিল রাণু।

হোটেলে তখন রাণু বাদে আর এক ঘরে এক প্রৌঢ় স্বামী-স্ত্রী ছিলেন। অনিন্দ্যবাবু ও তার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী। অনিন্দ্যবাবু এক কালে জজিয়তী করতেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জীবনে স্ত্রীসহ ধর্মাচরণ করে বেড়াচ্ছেন তীর্থে তীর্থে। তাঁরা স্বামী স্ত্রী হোটেলে ঘর নিয়েছেন বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই তাঁদের বাইরে বাইরে মন্দিরে কেটে যায়।

সমুদ্রতীরে নির্জন হোটেলটি ভারী ভাল লাগে রাণুর। ঘরের জানালা থেকেই শয্যায় শুয়ে সমুদ্র চোখে পড়ে।

নীল আর অফুরন্ত নীল আর তারই মাথায় মাথায় শুভ্র জুঁইয়ের স্তবকের মত ঢেউয়ের ফেনা ছড়িয়ে আছে সর্বক্ষণ অস্থির চঞ্চল এক খুশির ঝলকানিতে। অবিরাম রাত্রি দিন মেঘের ডাকের মত একটা গর্জন কানে আসে। চেয়ে চেয়ে যেন রাণুর আশা মেটে না। জীবনে তার ঐ প্রথম সমুদ্র-দর্শন। সমুদ্র-দর্শন তো

নয় যেন জীবনে নতুন অদ্ভুত এক বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে পরিচয়।

রাণু কখনও ঘরের মধ্যে শয্যায় শুয়ে, কখনও হোটেলের সামনের বারান্দায় ইজিচেয়ারটায় গা ঢেলে দিয়ে নিঃশব্দে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে সামনের ঐ নীল জলরাশির দিকে, ঢেউয়ের ভাঙাগড়ার দিকে। কখনও সমুদ্রের তীর ধরে ভিজে বালুর উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় স্বর্গদ্বার ছাড়িয়ে দূরে আরও দূরে। একটা নিষ্ক্রিয় আলস্য ও আনন্দানুভূতির ভিতর দিয়েই দিনগুলো লঘু ডানা মেলে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছিল। নিজের পারিপার্শ্বিককেও যেন এক রকম ভুলে গিয়েছিল রাণু।

সেদিনও দ্বিপ্রহরের দিকে হোটেলের বারান্দায় ক্যামবিশের ইজিচেয়ারটার উপরে গা এগিয়ে দিয়ে বসে ছিল রাণু। নিঃশব্দে চেয়ে ছিল অশান্ত, অস্থির, বিক্ষুব্ধ সাগরের দিকে। হঠাৎ তার তন্দ্রা ভেঙে গেল কয়েকটি কথায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা উচ্চ হাসির উচ্ছ্বাসে।

নুলিয়া সঙ্গে না নিলে ডুবে যাব? তা না হয় যাবই, তবু মরবার আগে সান্ত্বনা নিয়ে যাব মশাই যে সমুদ্রেই ডুবে মলাম—

বলতে বলতেই একটা উচ্চ প্রাণখোলা হাসির উচ্ছ্বাস।

নিজের অজ্ঞাতেই যেন ফিরে তাকিয়েছিল রাণু।

পরিধানে সুইমিং কস্টিউম এবং গায়ে জড়ানো একটা বড় টার্কিশ টাওয়েল। সামান্য সেই আবরণটুকুকে বাদ দিলে বাকী দেহটা যেন সত্যিই এক অপূর্ব সৃষ্টি। খুব লম্বা না এবং বেঁটেও না, পরিমিত দৈর্ঘ্য, উজ্জ্বল শ্যাম গায়ের বর্ণ।

কিন্তু সেই পরিমিত দৈর্ঘ্যও নয়, গাত্রবর্ণেও নয়, সুগঠিত দেহটিই যেন মানুষটার সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ। মাথায় নিশ্চয়ই কোন কালে তেল দেয় না। পশমের মত রুক্ষ চুলগুলো অবিন্যস্ত। কিছু কিছু তার হাওয়ায় উড়ে উড়ে এসে প্রশস্ত কপালের উপরে পড়ছে।

তবু চলুন, সঙ্গে যাই! হোটেলের সুপারভাইজার যুবক দুর্গাবাবু কথাটা বলে তার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

আসবেন? তা আসুন—কিন্তু যদি ডুবেই মরি, খবরটা যে কাকেও দেবেন তাও তো তিন কুলে কেউ নেই। অমন হৃদয়বিদারক মর্মন্তুদ সংবাদটা দেবেনই বা কাকে।

বলতে বলতে মানুষটা ততক্ষণে হোটেলের বারান্দা থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে

সামনে নীচের রাস্তায় গিয়ে পড়েছে।

কতই বা বয়স হবে। তেত্রিশ কি চৌত্রিশ। লোকটা ঐ পুরী ভিউ হোটেলেই এসে উঠেছে বোঝা গেল। এবং কালও ওকে হোটেলে দেখে নি রাণু, এই প্রথম দেখছে। মনে হচ্ছে আজই বোধ হয় সকালের এক্সপ্রেসে এসেছে।

কিন্তু বেলা প্রায় একটা, এখন এত বেলায় স্নান করতে গেল। রাণু অন্যমনস্ক ভাবেই সামনের সী বীচের দিকে তাকাল।

বালুর উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ততক্ষণে একেবারে জলের কাছাকাছি গিয়ে পৌছেছে মানুষটা। মধ্যাহ্ন-সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় সাগরের জল আরও নীল মনে হয়। নীলাভ একটা চোখ-ধাঁধানো দ্যুতি যেন ঝলসে দেয় চোখের দৃষ্টি। আর সাগর দেখা হল না রাণুর। সাগরের জলে লোকটার স্নান করাই চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের ঢেউ অবিশ্রান্ত বালুবেলার উপরে এসে সফেন উচ্ছ্বাসে, উল্লাসের গর্জনে ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে একটার পর একটা। যেমন ভাবে যে ঢেউটা নিতে হবে ঠিক তেমন ভাবেই, রাণু চেয়ে চেয়ে দেখতে পায় স্পষ্ট বারান্দায় বসে, লোকটা যেন অবলীলাক্রমে গ্রহণ করছে। সমুদ্র-স্নানে মানুষটা যে নভিস্ নয়, সমুদ্র মানুষটার অপরিচিত নয় বুঝতে পারে রাণু। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে স্নান করে এক সময় মানুষটা উঠে এল জল থেকে।

তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে ভিজে পায়ের সঙ্গে সঙ্গে বালি ছড়াতে ছড়াতে, গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে রাণুর পাশ দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

ঐ দিনই সন্ধ্যার আব্ছায়া অন্ধকারে রাণু মানুষটার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল আবার। কণ্ঠের গান।

সমুদ্রের ধারে বালুর উপরে বসেছিল রাণু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে।

গর্জনমুখর সমুদ্রের সন্ধ্যার আবছায়া আলোয় সে যেন আর এক রূপ। চোখের দৃষ্টি থেকে নীলাঞ্জন-মায়া মুছে গিয়েছে তখন। মেঘের রঙ ধরছে সাগরের জলে। মাথার উপরে সন্ধ্যার আকাশে এখানে ওখানে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি তারার মিটি মিটি আলো। দিগন্তের দিকে ভীরু সাথীহারা কম্পিত কারও দৃষ্টি যেন। বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে একটানা বিক্ষুব্ধ গর্জন। সেই বাতাস আর গর্জনকে ছাপিয়ে রাণুর কানে সহসা যেন ভেসে

এল সেই গানের সুর, গানের কথা—

দিনের আলো যার ফুরাল, সাঁঝের আলো জ্বলল না,

সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।

ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে যাচ্ছে বাতাসে সেই সুর আর কথা, আবার ক্ষণে ক্ষণে স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসছে শ্রবণে।

সেই গান শেষ হল, তার পর আর একটা গান, তার পর আবার একটা, এমনি করে গানের পর গান।

শেষ গানটি বড় ভাল লেগেছিল রাণুর।

একেবারে শেষের গানটি—

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু,

পথে যেতে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।

গান শেষ হয়ে গেল, কিন্তু সাগরগর্জনের বিরাম নেই। একটানা গর্জন করে চলেছে।

শেষ রাত্রে রাণুর ঘুম ভেঙে গেল আবার সুরের ছোঁয়ায়। মধুর গীটারে কে যেন রবীন্দ্রসংগীত বাজাচ্ছে। সুরটা চেনা চেনা জানা জানা। তবু কিছুক্ষণ চিনতে পারে নি রাণু।

পরে চা পান করতে করতে হঠাৎই মনে পড়ে গিয়েছিল সুরটা।

আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে

বাঁশী, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে।

এমনি করেই কখনও উচ্ছ্বসিত হাসি, কখনও দুটি গানের কলি, কখনও গীটারের মধুর ধ্বনি রাণুর নিষ্ক্রিয় আলস্য আর বিশ্রাম-অবসরকে যেন মধ্যে মধ্যে নাড়া দিয়ে যেতে লাগল। আনমনা সচকিত করে দিয়ে যেতে লাগল রাণুকে। নামটাও ইতিমধ্যে জানতে পেরেছিল কথায় কথায় দুর্গাবাবুর মুখে : পার্থপ্রতিম চৌধুরী। বিলাত-ফেরত একজন ইঞ্জিনীয়ার।

তেইশ বছর বয়সে বিলেত গিয়েছিল, তার পর সেখানে এগারটা বছর কাটিয়ে বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী আর কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে নাকি লোকটা ভারতে ফিরেছে ভারত সরকারের কি একটা নতুন স্কিমের কর্ণধার হয়ে।

ত্রিসংসারে কেউ নেই পার্থর আপনার জন। বাপ ছিল পাটনা শহরে নাম করা একজন ডাক্তার। প্রচুর অর্থ ব্যাংকে রেখে গিয়েছে ছেলের জন্য। বিয়ে-থা

করে নি। বোধ হয় করবার সময় পায় নি। পড়াশোনা আর ট্রেনিং নিয়েই তো ব্যস্ত ছিল। আরও জানতে পেরেছিল রাণু দুর্গাবাবুর মুখে, কাজ-পাগলা লোক হলেও মানুষটার মধ্যে কোথায় যেন একটা খেয়ালী চঞ্চল মন আছে। যে মনটা কখনও কখনও হঠাৎ জেগে উঠে পার্থকে যেন তার সমস্ত কাজ আর দায়িত্ব থেকে ছুটি দিয়ে দেয়। সমস্ত কাজ কর্তব্য আর দায়িত্বের বাইরে তাকে একেবারে টেনে নিয়ে আসে।

অনেক দিন পরে জেনেছিল রাণু পার্থপ্রতিমের সে যেন আর এক পরিচয়। কাজের নেশার মধ্যে সব কিছু ভুলে ডুবে থাকা মানুষ তখন সে আর নয়, পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকা বন্ধনহীন খুশির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া যেন সম্পূর্ণ অন্য আর এক পার্থ।

সে পার্থ হৈ হৈ করে, সময় মানে না, অস্থির চঞ্চল। সে পার্থ উচ্চ কণ্ঠে হাসে, গলা ছেড়ে গান গায়, গীটার বাজায় নচেৎ আপন মনে গুন গুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে কাগজের বুকে তুলি আর রং দিয়ে ছবির পর ছবি এঁকে চলে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তর ছবি, পাহাড় থেকে নদীর কিংবা ধু ধু প্রান্তর থেকে নিবিড় অরণ্যের।

ফ্যাক্টরির মধ্যে ইঞ্জিনীয়ার পার্থ চৌধুরী আর সেই পার্থ যেন সম্পূর্ণ দুটো বিভিন্ন মানুষ, একেবারে আলাদা দুটো সত্তা।

সরকারী কাজেই ইঞ্জিনীয়ার পার্থ চৌধুরী এসেছিল উড়িষ্যায়। কাজ শেষ হবার পর আবার ফিরে যাচ্ছিল পার্থ দিল্লীতে, হঠাৎ চোখে পুরীর সমুদ্র যেন কেমন নেশা ধরাল। পার্থর আর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করা হল না। পনের দিনের একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়ে এসে উঠল ঐ নির্জন হোটেলটিতে। বলতে গেলে সী বীচের ধারে ঐটাই শেষ হোটেল।

যাই হোক, একই হোটেলে থাকা সত্বেও কিন্তু দু' জনার মধ্যে কোন পরিচয় ঘটে নি। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছাটা ছিল বোধ হয় অন্যরূপ, বিচিত্র এক ঘটনার মধ্যে দিয়েই পরিচয় ঘটে গেল দু' জনার।

দুটো দল বের হয়েছিল সেদিন উদয়গিরি-খণ্ডগিরি দেখতে। এক দলে পুরী ভিউ হোটেলের তরুণ মালিক সমর বাবু, তার দু-চার জন তরুণ স্থানীয় বন্ধু এবং পার্থ। অন্য দলে দুর্গা বাবু ও অন্য এক হোটেলের জনা দুই চেম্বার। উদয়গিরি আর খণ্ডগিরির মধ্যে দুটো দলের জনা আষ্টেক লোক ছাড়া ছাড়া ভাবে ঘুরছিল। এবং ঘটনাটা ঘটল খণ্ডগিরিতেই।

এলোমেলো অসমতল পাথরের উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে নামতে গিয়ে হঠাৎ পা পিছলে ডান পায়ের গোড়ালিতে প্রচণ্ড চোট খেল রাণু এবং সঙ্গে সঙ্গে গোড়ালির ব্যথায় অস্ফুট একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে বসে পড়ল রাণু।

রাণু জানত না তার ঠিক পিছনেই ঐ সময় ছিল পার্থ। সে তাড়াতাড়ি এক লাফে গোটা দুই পাথর ডিঙিয়ে একেবারে সামনা-সামনি এসে দাঁড়াল রাণুর।

কি হল ? পা স্লিপ করেছে ?

অসহ্য যন্ত্রণায় রাণুর শ্বেত পাথরের মত সাদা মুখখানা রক্তাভ হয়ে উঠেছে। হাত দিয়ে গোড়ালিটা চেপে ধরে যন্ত্রণাটা সহ্য করবার চেষ্টা করছে সে তখন প্রাণপণে। অসংকোচে আরও দু' পা এগিয়ে আসে পার্থ, দেখি কোথায় লাগল ? এক রকম জোর করেই রাণুর আপত্তি সত্বেও হাতটা সরিয়ে তার গোড়ালিটা দেখতে থাকে পার্থ।

পায়ের গোড়ালিটা সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠেছিল। পার্থ গোড়ালিটা হাত দিয়ে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করতেই যন্ত্রণাকাতর অস্ফুট শব্দ করে ওঠে রাণু, উঃ!

মানুষটার সঙ্গে যেন কত কালের চেনা, কতই না ঘনিষ্ঠতা। ঠিক তেমনি সুরেই বলে ওঠে, এখন উঃ করলে কি হবে, অ্যাকৃসিডেণ্ট করে বসেছেন যখন একটু সহ্য করতে হবে বৈকি !

কথা বলার ভঙ্গিটাই এমন যে যন্ত্রণা বুঝি মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েই পার্থর মুখের দিকে না তাকিয়ে পারে না রাণু।

কই দেখি, হাতটা সরান—সামনে একেবারে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে পার্থ। হাত বাড়িয়ে দেয়, আবার বুঝি রাণুর আহত পাটা ধরবার জন্যই।

না, লাগবে—

তা তো একটু লাগবেই। চোটটা বেশ ভালই লাগিয়েছেন মনে হচ্ছে—কই দেখি ?

না—পাটা সরিয়ে নেয় রাণু।

আচ্ছা ছেলেমানুষ তো আপনি! হাত সরান দেখি।

রাণুর সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করেই যেন হাত বাড়িয়ে রাণুর আহত পাটা ধরল পার্থ। এবং টিপে টিপে দেখতে থাকে পাটা।

রাণু যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে সহ্য করবার চেষ্টা করে।

হুঁ, বুঝতে পারছি একটা কিছু ফ্রাকচার-ট্রাকচার ঘটিয়েছেন।

আপনি কি ডাক্তার নাকি যে হাত দিয়েই বুঝলেন ফ্রাকচার হয়েছে। মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত করে একটু যেন ব্যঙ্গের সুরেই কথাটা বলে রাণু।

ডাক্তার না হলেও কমন সেন্স টা তো আছে। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় পার্থ। এবং নিজের পকেট থেকে দামী রুমালটা বের করে কাঁধের ঝোলানো ফ্লাস্ক থেকে জল ঢেলে রুমালটা জলে ভিজিয়ে নিতে শুরু করে।

ও কি করছেন!

এটা দিয়ে পাটা আপাতত বেঁধে দিই, তারপর হোটেলে পৌঁছে ব্যবস্থা করা যাবে।

কথাটা বলে মতামতের আর অপেক্ষা মাত্রও না করে নীচু হয়ে পুনরায় ভিজে রুমালটা দিয়ে রাণুর আহত পাটা জড়িয়ে বেঁধে দিল পার্থ।

তা যেন হল কিন্তু এখন! পার্থ রাণুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে।

কি এখন?

এই পাহাড় থেকে নেমে এই বাকী পথটা এখন গাড়িতে গিয়ে উঠবেন কি করে।

সে আমি পারব।

পারবেন?

নিশ্চয়ই।

তবে আর কি চলুন। আপনার তো দেখা হলই না সব কিছু, আমারও হল না।

কি বিশ্রী কথা বলে লোকটা। মেজাজটা বিগড়ে যায়। বলে রাণুর, কেন আমার পায়ে ব্যথা লেগেছে তো আপনার কি, আপনি যতক্ষণ ইচ্ছা ঘুরে ঘুরে দেখুন না গিয়ে।

হ্যাঁ, তাই করি আর আপনি মনে মনে বলতে থাকুন মানুষটা কি অভদ্র।

নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সে ধরণের কোন আশঙ্কা নেই।

কি করে বলি বলুন, মনের অগোচরে পাপ নেই জানেন তো।

মানে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় রাণু পার্থর মুখের দিকে। ক্রমশঃ মেজাজটা বিগড়োতে শুরু করছে তখন।

মানে জেনে আর কাজ নেই, এখন চলুন উঠুন। হাসতে হাসতে অম্লান বদনে কথাগুলো বলে পার্থ।

আপনি যান। আমার জন্য আপনাকে না ভাবলেও চলবে।

সে তো বুঝতেই পারছি। এই জন্যই বোধ হয় বলে পথে নারী বিবর্জিতা।

আপনি তো অত্যন্ত—

অভদ্র তাই তো। তা হয়তো আছি, তবে কথাটা যে মিথ্যে নয় একদা এদেশের মুনি-ঋষিরাই বলে গিয়েছেন। কিন্তু রাগ করে কথা কাটাকাটি করে সময় নষ্ট করেই কি লাভ পাবেন, উঠুন—

বললাম তো আপনি যেতে পারেন।

সিরিয়াসলি বলছেন ?

তবে কি মনে করেন ঠাট্টা করছি !

না, না—তা কেন ?

তবে ?

না কিছু না। আচ্ছা চলি তা হলে—বলতে বলতে অগ্রসর হয় পার্থ।

রাণুও আর দেরি না করে উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়ায়। কিন্তু দু'পা ফেলতে না ফেলতেই যন্ত্রণায় অস্ফুট কাতরোক্তি করে সঙ্গে সঙ্গে যে পাথরটার উপর এতক্ষণ বসেছিল সেই পাথরটার উপরেই বসে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল পার্থ। মৃদু মৃদু হাসছে তখন পার্থ রাণুর অবস্থা দেখে।

শ্বেত পাথরের মত সাদা মুখটা রাগে রাক্তম হয়ে ওঠে রাণুর। তাড়াতাড়ি লোকটার বেহায়া দৃষ্টি থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। পার্থ ততক্ষণে আবার কাছে এগিয়ে এসেছে রাণুর। এবং হাসতে হাসতেই বলে, উঠে দাঁড়াতেই পারছেন না, এই পাহাড়ে পথে হেঁটে যাওয়া তো দূরের কথা। তা হলে এবারে কি আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি ?

না। ধন্যবাদ।

দেখুন, আপনার নামটা আমি জানি না, আর তাইতেই ঐ দেখুন আর শুনুন করতে করতে মুখটা আমার ব্যথা হয়ে গেল। তার চাইতে চলুন না আমি সাহায্য করছি আপনাকে। সাহায্য আপনাকে নিতেই হবে বুঝতে যখন পারছেন।

মোটেই না। তা যদি বুঝে থাকেন তো ভুল বুঝেছেন। আপনার সাহায্য আমি নিচ্ছি না।

নিচ্ছেন না ?

না।

তা হলে আর কি করা যায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আপনাকে আমার সাহায্য করতে হবে। ব্যাপারটা কি জানেন, ইতিপূর্বে আমাদের দু'জনের পরিচয় না হলেও এবং আমরা পরস্পরের নামটা পর্যন্ত না জানলেও আজ প্রায় দিন সাতেক হল একই হোটেলে আমরা রয়েছি। কথা পরস্পরের সঙ্গে না বললেও দিনের মধ্যে আমাদের দু'জনার অন্তত চার-পাঁচ বার দেখা সাক্ষাৎ হয়ই। সেক্ষেত্রে—

সেক্ষেত্রে গায়ে পড়া হয়ে আমাকে উপকৃত করবার আপনার অধিকার জন্মে গিয়েছে তা কি?

নিশ্চয়ই। কারণ আমাদের দেশের শাস্ত্রেই বলি, দশ পা একত্রে গেলেই নাকি বন্ধুত্ব জন্মায় তা আমরা দশ পা ছেড়ে—

থামুন।

তা না হয় থামছি। কিন্তু এবারে আমি আপনাকে, অফ কোর্স উইথ ইওর পারমিশন সাহায্য করতে পারি কি?

রাণু কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়ায় এবং আবার এগোবার চেষ্টা করে পার্থর কোন সাহায্য না নিয়েই। কিন্তু এবারেও অতি কষ্টে দু'পা গিয়েই যন্ত্রণায় পা তুলতে গিয়ে নিজেকে সামলাতে পারে না। টলেই পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই হাত বাড়িয়ে দ্বিধামাত্র না করে পার্থ রাণুকে ধরে ফেলে।

এখুনি তো সর্বনাশ করেছিলেন। পায়ে চলার আর দরকার হত না। গড়াতে গড়াতেই একেবারে নীচে গিয়ে পৌঁছতে পারতেন। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সোজা রাণুর বাঁ হাতটা তার কাঁধের উপরে টেনে নেয় পার্থ এবং রাণুর দেহের সমস্ত ভারটা নিজের উপরে নিয়ে এগোয়।

রাণু আর আপত্তি জানায় না, আত্মসমর্পণ করে। কারণ সে তো বুঝতেই পেরেছিল অনন্যোপায় সে! কিন্তু উঁচু নীচু পাহাড়ের পথে রাণুর পার্থর সাহায্য নিয়েও সেভাবে নামতে পারে না।

পার্থ তখন সহসা রাণুকে কোন কথা বলার অবকাশ মাত্রও না দিয়ে সোজা একেবারে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় এবং নামতে থাকে।

একি! একি—

ঘটনার আকস্মিকতায় রাণুর মুখ দিয়ে ঐ দুটি কথা ছাড়া আর কিছু বের হয় না।

কিন্তু পার্থ আর কোন জবাব দেয় না, দেবার প্রয়োজনও বোধ করে না। পাহাড়ে পথ ধরে নীচের দিকে নেমে চলতে থাকে।

নামিয়ে দিন আমাকে, নামিয়ে দিন মিঃ চৌধুরী। রাণু প্রতিবাদ জানায়।

আপনি আমার নামটা জানেন তা হলে দেখছি, আপনার সঙ্গে আমার আরও কিছু পরিচয়ের দাবি আছে।

আপনি আমাকে নামিয়ে দেবেন কিনা ?

নিশ্চয়ই। নইলে কি আপনি মনে করেন এই ভাবে আপনাকে আমি সেই হোটেল পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাব!

মুখে প্রতিবাদ জানালেও রাণু কিন্তু ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ ভাবেই নিজেকে আত্মসমর্পিতা করেছিল পার্থর বাহুর মধ্যে, পার্থর দু' বাহুর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে।

কি জানি কেন অতঃপর রাণু আর কোন রকম আপত্তি জানায় না।

কি নাম আপনার ? চলতে চলতেই প্রশ্ন করে পার্থ।

জানি না।

নিজের নামটাও জানেন না ?

না।

হ্যাঁ কেউ কেউ নিজের নামও শুনেছি ভুলে যায়। তা একলা হোটেলে এসেছেন—হোটেলে পৌঁছে তা আত্মীয়স্বজনকে একটা খবর দিতে হবে।

সে জন্য আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে।

তা চলবে। তবু এক হোটেলেই যখন থাকি কর্তব্য বলেও তো একটা কথা আছে।

কর্তব্যজ্ঞানটা আপনার খুব টন্‌টনে দেখছি।

হ্যাঁ, স্কুলে এক বার কর্তব্যজ্ঞানের উপরে প্রবন্ধ লিখে সোনার পদক পেয়েছিলাম। বেশ ভাল সাবজেক্ট্ তাই না। ঝর ঝর করে লাইনের পর লাইন লেখা যায়। কিন্তু আপনি বুঝি ভাল করে খান না ?

অর্থাৎ!

অর্থাৎ পাখীর মতই হালকা লাগছে কিনা আপনাকে। তা কলেজে পড়েন বুঝি ?

কেন, কলেজে পড়লে বুঝি শরীর পাখীর মত হালকা হয় ?

আজকালকার বিশেষ করে আপনাদের জাতের মধ্যে সেই রকমই সব দেখি কিনা ?

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখাই বুঝি আপনার স্বভাব!

তা ও দোষ সত্যিই একটু আছে কিন্তু আমার। আমি একটু চোখ খুলেই

থাকি সব সময়।

তা তো বুঝতেই পারছি।

পারছেন তো! পারবেনই। কিন্তু আমি দেখছি কিছুতেই আপনি যেন আমাকে সহ্য করতে পারছেন না, কেন বলুন তো?

অত্যন্ত সহজ, আপনি অসহ্য বলেই।

কিন্তু কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা কথা আছে!

সেটা যথাসময়েই দেখতে পাবেন।

সে কি আর বুঝতে পারছি না, হাসতে হাসতে বলে পার্থ, ভেবেছিলাম আরও কিছু দিন পুরীর সমুদ্র দেখে কাটাব, তা আর বোধ হয় হল না। হোটেলে ফিরে গিয়েই বার্থ রিজার্ভেশন করতে হবে।

এবার রাণু সত্যিই হেসে ফেলে। স্বতঃ-উৎসারিত হাসি। নিজের অজ্ঞাতেই যে হাসি আপনা থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সেই হাসি।

সঙ্গে সঙ্গে পার্থ বলে ওঠে, আঃ, তা হলে এতক্ষণ বাদে আপনি সহজ হলেন। থ্যাংকস্, থাউজেণ্ড এণ্ড ওয়ান থ্যাংকস্। এবারে বলবেন নিশ্চয়ই আপনার নামটা।

পূর্ববৎ হাসতে হাসতেই রাণু জবাব দেয়, পরিচয়ের সূত্রপাতেই তো বার্থ রিজার্ভেশনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন, নামটা শুনলে হয়তো হোটেলে পৌঁছেই রিক্‌শায় চেপে স্টেশনের দিকে ছুটবেন।

কেন, নামটা আপনার বিচ্ছু-টিচ্ছু জাতীয় নাকি!

হাসতে হাসতেই রাণু বলে, কতকটা তাই।

ইতিমধ্যে পার্থ প্রায় পাহাড়ী পথ শেষ করে সমতল ভূমিতে পৌঁছে গিয়েছিল। গুরু পরিশ্রমে তখন সে সত্যিই হাঁপাচ্ছিল। কারণ রাণুর দেহটা যতই পাখীর মত হালকা বলুক পার্থ, দীর্ঘ পাহাড়ী উঁচু-নীচু পথে একজনকে বয়ে নিয়ে নামতে যথেষ্ট পরিশ্রমই হয় বৈকি।

দিন, এবার নামিয়ে দিন।

নামিয়ে দেব?

হু, এবারে বোধ হয় কাঁধে ভর দিয়ে গাড়ি পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারব।

না, পারবেন না।

পারব। পারব, সত্যি বলছি পারব।

পার্থ সে কথায় কান দেয় না। পূর্ববৎ ওকে বহন করেই সামনের দিকে এগিয়ে চলতে চলতে বলে, কিন্তু নামটা এখনও জানা হয় নি।

বলব না নাম।

বলবেন না? কেন?

কেন আবার কি, বলব না।

মৃদু হাসে পার্থ জবাবে।

গাড়িতে এসে সযতনে তুলে বসিয়ে দেয় পার্থ রাণুকে। এবং বসিয়ে দেবার পর অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে রাণু বলে, আমার নাম রাণু।

আমিও ঐ রকমই একটা আন্দাজ করেছিলাম।

কি?

নামটা আপনার ঐ রকমই মিষ্টি একটা কিছু হবে!

কেন!

তা তো জানি না।

॥ ১২ ॥

দৈবের একটা দুর্ঘটনা কিন্তু সেই দুর্ঘটনাই যেন অত্যাশ্চর্য ভাবে ওদের দু'জনকে পরস্পরের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। এবং পরবর্তী কালে কত সময় ভেবেছে রাণু, সেদিন খণ্ডগিরি শিখরে ঐ দুর্ঘটনাটা আকস্মিক না ঘটলে সত্যিই কি তাদের পরস্পরের পরিচিত হবার আদৌ কোন সম্ভাবনা ছিল।

দু' জনে একই হোটেলে পাশাপাশিই প্রায় বলতে গেলে দুটো ঘরে ছিল। আরোও কিছুদিন হয়তো থাকত, তার পর হয়তো দু'জনে দু'দিকে চলে যেত। অপরিচিতের মতই চলে যেত। ক্ষতি তো কিছুই হত না তাতে কারও কিছু। শূন্য পথে দুটো গ্রহের মত কেন হল ঠোকাঠুকি!

কত ভেবেছে রাণু সময় সময় কিন্তু ভেবে কোন কূল পায় নি। আবার মনে হয়েছে, ক্ষতি হত বৈকি। পৃথিবীতে আর কারও কোন ক্ষতি না হলেও তার ক্ষতি হত এবং সে ক্ষতির পূরণ কি তার এ জীবনেই হত!

পৃথিবীতে আর কারও ক্ষতি হত না একথাটাও ভাবা তার তখন ভুল হয়েছিল বোধ হয়। আর কেউ জানুক বা না জানুক অমন একটা প্রতিভা, অমন একটা প্রাণ এই যে অপচয়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল সেটা কি শুধু তার আর পার্থরই ক্ষতি, আরও অনেকেরই কি ক্ষতি না?

সে রাত্রে হোস্টেলে নিজের ঘরের বিনিদ্র রজনীর অন্ধকারে শয্যায় শুয়ে শুয়ে

সেই কথাটিই বুঝি প্রত্যহের মত মনে পড়ছিল রাণুর। আর সমস্ত বুকটার মধ্যে একটা চাপা কান্না যেন তোলপাড় করে ফিরছিল। যে কান্না শুধু তারই বুকের ভিতরে গুমরে গুমরে উঠতে থাকে, আর কেউ শোনে না, শুনতে পায় না।

হোটেলে ফিরে এসেই ছুটেছিল পার্থ একজন ডাক্তারের জন্য।

অসহ্য যন্ত্রণায় শয্যায় শুয়ে ছটফট করছিল রাণু। অভিজ্ঞ প্রৌঢ় এক জন ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে পার্থ এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পর্দার ও-পাশ থেকে অনুমতি চাইল, ভিতরে আসতে পারি মিস্ সেন?

আসুন—

চলুন ডাঃ পট্টনায়ক।

ডাক্তার পট্টনায়ককে নিয়ে পার্থ এসে ঘরে ঢুকল।

যথাসম্ভব আহত পাটা পরীক্ষা করে গুলার্ডস লোশনে ভিজিয়ে রাখবার ব্যবস্থা দিয়ে এবং বেদনা খুব বেশী হলে বেদনানাশক কোন ঔষধ দেবার উপদেশ দিয়ে ডাঃ পট্টনায়ক বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। রাণু বললে, মিঃ চৌধুরী, ঐ ছোট স্যুটকেসটার মধ্যে বটুয়ায় টাকা আছে, ওঁর ভিজিটটা দিয়ে দিন।

আপনি ব্যস্ত হবেন না, সব ব্যবস্থাই হবে। আসুন ডাক্তার।

ডাঃ পট্টনায়ককে নিয়ে পার্থ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ঘরের বাইরে এসে পার্থ শুধাল, কি দেখলেন ডাক্তার।

পাটা এত বেশী ফুলে রয়েছে এমনিতে বোঝবার উপায় নেই।

তবে?

এক্স-রে প্লেট একটা নিতে পারলেই ভাল হত।

ব্যবস্থা আছে এখানে?

তা আছে। এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট হাসপাতালেও ব্যবস্থা আছে।

তা হলে সেই ব্যবস্থাই কাল আপনাকে করে দিতে হবে। আমি খুব ভোরেই আপনার ওখানে যাচ্ছি।

বেশ। তাই আসবেন।

নিজের পকেট থেকে ডাক্তারকে ভিজিট দিয়ে বিদায় করে ফিরে এল পার্থ আবার রাণুর ঘরে।

যন্ত্রণায় চোখ বুজে পড়ে ছিল রাণু। পদশব্দে চোখ মেলে তাকাল।

ডাক্তার কি বলল, ফ্র্যাকচারই তো?

এক্স-রে প্লেট না নেওয়া পর্যন্ত বলা যায় না।

তবে কি আপনার কথাই সত্যি নাকি!

কি?

কেন, আপনিই তো বলেছিলেন ফ্র্যাকচার।

কখন আমি সে কথা বললাম।

বাঃ খণ্ডগিরিতে সেই কথাই আপনি বলেন নি।

আচ্ছা ছেলেমানুষ তো আপনি?

ছেলেমানুষ আমি।

তাই। দেখলে তো মনে হয় আই. এ. পাশ করে হয়তো বি. এ. পড়ছেন—

অত যন্ত্রণাতেও একটু হাসি জেগে ওঠে রাণুর ওষ্ঠপ্রান্তে।

ওঃ, সে পর্যন্তও বুঝি এখনও পৌঁছান নি?

পূর্ববৎ কৌতুকেই হাসতে হাসতে জবাব দেয় রাণু, না—

তবে?

ম্যাট্রিক পর্যন্তই এগোতে পারলাম না।

আচ্ছা হয়েছে, সে নিয়ে এখন আর দুঃখ না করলেও চলবে।

না দুঃখ কেন করব। আপনার মত সকলেই তো অত বড় বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ার হতে পারে না।

একটা কথা বলব মিস সেন?

বলুন!

আপনার বোধ হয় বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম।

পায়ের অসহ্য যন্ত্রণা ভুলেই যেন হেসে ওঠে রাণু।

হাসলেন। কিন্তু খোঁজ করে দেখবেন কুষ্ঠি থাকলে সত্যিই তাই।

বলতে বলতে পার্থ ঘর থেকে বের হয়ে যেতে উদ্যত হতেই পিছন থেকে রাণু ডাকে, চললেন কোথায়?

ওষুধগুলো নিয়ে আসি।

হোটেলে পুরীতে প্রথম পরিচয়ের পর সে রাত্রের স্মৃতিটা অক্ষয় হয়ে আছে রাণুর জীবনে। রাণুর সমস্ত প্রকার আপত্তিকে লঘু হেসে অগ্রাহ্য করে পার্থ সে রাত্রে রাণুর ঘরের বাইরে সরু প্যাসেজটার মধ্যেই প্রথমে একটা ইজিচেয়ার

পেতে সেই চেয়ারে বসেই রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করেছিল।

রাণু বার বার প্রতিবাদ জানিয়েছিল, অন্যায়, এ আপনার কিন্তু ভয়ানক অন্যায় মিঃ চৌধুরী। আপনি গিয়ে আপনার ঘরে শোন, দরকার হলে ডাকব।

কিন্তু দরকার হলেও যে তখন ডেকে ডেকেও সাড়া পাবেন না।

নিশ্চয়ই পাব।

উঁহু। আপনি জানেন না, জেগে যতক্ষণ আছি তো আছি কিন্তু ঘুমোলে তখন একেবারে পাথর। কানের কাছে ঢাক পিটোলেও ঘুম ভাঙে না।

কয়েক ঘণ্টার আলাপে রাণু এটুকু বুঝতে পেরেছিল, ঐ মানুষটাকে তার কর্তব্যবোধ থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। কথা কাটাকাটি করে বিশেষ আর লাভ হবে না ভেবে অবশেষে রাণু বলে, তা হলে ঐ প্যাসেজে নয়, আমার ঘরের ভিতরেই এসে শোন।

বলেন কি! আপনার সাহস তো কম নয় মিস্ সেন।

কেন সাহসের এর মধ্যে কি দেখলেন?

নয়! এক জন অপরিচিত পুরুষকে সোজা নিজের শয়ন-ঘরে গিয়ে শোবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন।

অপরিচিত কেন হবেন!

অপরিচিত নয়! আপনি আমার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে তো কিছুই জানেন না।

জানবার প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন নেই!

না।

কেন?

কারণ আপনি যে এক জন ভদ্রলোক সেটুকু আমি বুঝতে যদি এখনও না পেরে থাকি তো বৃথাই এতদিন পৃথিবীর মানুষ দেখলাম।

কিন্তু কিসে বুঝতে পারলেন যে আমি এক জন ভদ্রলোক। আমার ধোপ-দুরস্ত বেশভূষাতেই কি?

যদি বলি না।

তবে?

পুরুষমানুষকে চিনতে স্ত্রীলোকদের দেরী হয় না। যাক ও নিয়ে তর্ক করতে চাই না আর, আপনি ভিতরে চেয়ারটা নিয়ে এসে শোন।

না, না—এই বেশ আছি।

আপনি বেশ থাকতে পারেন কিন্তু আমার অস্বস্তি যাবে না। আর তার ফলে হয়তো সারাটা রাত আমাকে বিনিদ্রই কাটাতে হবে। আসুন, চেয়ারটা নিয়ে ভিতরে আসুন।

অগত্যা শেষ পর্যন্ত চেয়ারটা নিয়ে ঘরের মধ্যেই সে রাত্রে আসতে হয়েছিল পার্থকে। এবং বাকী রাতটা তার পর বলতে গেলে দু'জনের এক জনও ঘুমোয় নি। পুরী ভিউ হোটেলে সে রাতটা ওদের দু'জনার কথায় কথায় বিনিদ্রই কেটেছিল। ক ঘণ্টাই বা রাত বাকী ছিল, ঘণ্টা আষ্টেক হবে। কিন্তু সেই ঘণ্টা আষ্টেকের রাতটাই অক্ষয় হয়ে গিয়েছিল রাণুর জীবনে। তার জীবনে রাত্রির সেই বিনিদ্র কয়েকটি ঘণ্টা দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল।

মানুষের জীবনে কত রাতই তো আসে, কিন্তু অক্ষয় দুর্লভ হয়ে থাকে কটি রাত। ঘরের আলো নেভানো ছিল কিন্তু ঘরের খোলা দরজাপথে প্যাসেজের আলোর খানিকটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল। খোলা জানালা পথে তাকালে বাইরে শুধু অন্ধকার, অন্ধকার সমুদ্র নজরে পড়ে না। কিন্তু সমুদ্রের একটানা অবিশ্রাম গর্জন কানে আসছিল।

সে রাত্রে বলেছিল পার্থ, ভয়ের কথাটা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু সত্যিই আপনার দুঃসাহস আছে।

দুঃসাহস কিসে দেখলেন! রাণু প্রশ্ন করেছিল।

বঙ্গললনা হয়ে এইভাবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার স্বল্পপরিচিত এক পুরুষকে এভাবে নিঃসংকোচে নিজের শয়ন-ঘরে ডেকে আনার মধ্যে দুঃসাহস আছে বৈকি।

বঙ্গললনা কেন, আপনার মত সাগরপারের দেশে মেয়েদের ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সৌভাগ্য আমার না হলেও বলতে পারি কোন মেয়েই হয়তো পারত না। তবে এর মধ্যেও একটা কথা আছে।

কি?

আমার গায়ের রঙ আর কটা চোখ দেখে অন্তত আপনার বোঝা উচিত ছিল আমার শরীরে ওদেশের মেয়ের রক্তই আছে।

সত্যি?

হ্যাঁ, বাবা আমার বাঙ্গালী হলেও মা আমার আইরিশ। তবে মা আমার আইরিশ হলেও সে মায়ের আচার ব্যবহার ও নীতির সঙ্গে তেমন করে পরিচয় হবার বা ইনফ্লুয়েনসড্ হবার সৌভাগ্য কোন দিনই আমার হয় নি। যা কিছু

বৈশিষ্ট্য আমার বাবার কাছ থেকেই পাওয়া।

আপনার বাবার পরিচয় কিন্তু আপনার ঐ কটি কথাতেই পাচ্ছি। আলাপের সুযোগ হলে নিশ্চয়ই গিয়ে আলাপ করব।

বাবা তো বেঁচে নেই।

ও। আই অ্যাম সরি।

আমি যেবার থার্ড ইয়ারে পড়ি সেই বারেই বাবা মারা যান। তাও ধরুন বছর চারেক হয়ে গেল।

কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

বুঝতে পারছি, মার কথা তো?

হ্যাঁ, মার সম্পর্কে আপনি ও কথাগুলো বললেন কেন?

রাণু চুপ করে থাকে, সহসা যেন পার্থর প্রশ্নের জবাবটা দিতে পারে না। পার্থও বোধ হয় একটু লজ্জিতই হয়। মনে হয় ঐ ধরনের প্রশ্নটা হঠাৎ উত্থাপন করাটা হয়তো সৌজন্যের অভাবই হয়েছে।

কিছুক্ষণ অতঃপর একটা স্তব্ধতা বিরাজ করে অন্ধকার ঘরের মধ্যে। কেবল সেই স্তব্ধতার মধ্যে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের একটানা গর্জনটা শোনা যেতে থাকে। প্রথমে কথা বলে রাণুই সেই স্তব্ধতা ভেঙে। ডাকে, মিঃ চৌধুরী! ঘুমোলেন?

না।

আমার মার কথাটা জানতে চাইছিলেন না?

এবার আপনি ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

ঘুম আসছে না।

পায়ের ব্যথাটা খুব বেশী মনে হচ্ছে কি? একটা বরং ট্যাবলেট দিই—

প্রয়োজন নেই। আমার যখন বছর ছ-সাত বয়স সেই সময় বাবার সঙ্গে মার সেপারেশন হয়ে যায়।

ডিভোর্স!

না। ডিভোর্স নয়, সেপারেশন। তাঁর মেয়ে হয়েও বলতে আমার দ্বিধা নেই, শি ওয়াজ ইনটেলিজেন্ট। হ্যাঁ, সত্যিই তাঁর বুদ্ধি ছিল; কিন্তু তাঁর বুদ্ধিই ছিল শুধু, নারী-মনের—নারী-মনেরই বা বলি কেন, প্রত্যেক মানুষের মনের যে অমূল্য সম্পদ সেই ভালবাসাটাই তাঁর ছিল না। কিন্তু যাক সে কথা, নিজের গর্ভধারিণী মায়ের কথা ভাবলে আমার দুঃখই হয়।

রাণুর গলার স্বরটা শুনেই পার্থর বুঝতে কষ্ট হয় না, তার মায়ের ব্যাপারটা

তার কাছে একটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। তাই পার্থ প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়।

বলে, আচ্ছা মিস সেন!

বলুন।

পুরীতে এ সময় চেঞ্জের জায়গা নয়, তবে এ সময় আপনি এখানে কেন?

এম. এ. পরীক্ষা দেবার পর সামনে দেখলাম দীর্ঘ অবসর। কি করি কোথায় যাই ভাবতে ভাবতে এখানেই চলে এলাম। তা ছাড়া আপনারাই তো বলেন—

কি বলি?

সমুদ্রতীরে নাকি চির বসন্ত বিরাজ করে; কিন্তু সে কথা ছেড়েই দিন, আপনি নিজেও তো এসেছেন, বলুন তো আপনার এখানে এসে কি মনে হচ্ছে ঠকেছেন!

না, তা অবিশ্যি ঠকি নি।

সত্যি তাই আমার কি মনে হয় জানেন?

কি?

সমুদ্র বোধ হয় কাউকে কোন দিন ঠকায় নি, ঠকায় না। সমুদ্র এমন এক ঐশ্বর্য যেখানে এলে ঠকার প্রশ্ন তো দূরে থাক, মনে হয় পাওয়ার ঝুলিটা যেন ভরে গেল। উপচে গেল।

কিন্তু কি হল আপনার মিস সেন, ঘুমোবেন না?

ব্যথা ভুলতে চেষ্টা করছি, এ ব্যথা নিয়ে কি ঘুম হয়। তবে অবিশ্যি আপনার প্রতি আমার অন্যায়ই হয়ে গিয়েছে।

অন্যায়?

নিশ্চয়ই। আপনার তো ঘুমের প্রয়োজন আছে।

তা আছে কিন্তু জন্মাবধি তো সেই প্রয়োজনের দাবি মিটিয়ে এসেছি আর বাকী জীবনটাও দেব। একটা রাত না হয় নাই ঘুম হল।

না, না—এবারে আপনি ঘুমোন।

প্রত্যুত্তরে কোন কথা বলে না পার্থ। চুপ করেই থাকে।

আর ওদিকে কথার মধ্যে এতক্ষণ তবু পায়ের ব্যথাটা কিছুটা ভুলে ছিল রাণু। ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথাটা যেন ঝিলিক হানতে শুরু করে। নিজের অজ্ঞাতেই মৃদু উঃ আঃ দু-চারটে শব্দ বের হয়ে আসে রাণুর কণ্ঠ থেকে।

একটা স্যারিডন ট্যাবলেট দেব মিস সেন?

তাই দিন। নইলে বোধ হয় সোয়াস্তি পাব না।

ঘরের আলো জেলে পার্থ একটা ট্যাবলেট ও এক গ্লাস জল এগিয়ে দিল রাণুর সামনে।

শূন্য গ্লাসটা পাশে নামিয়ে রাখতে রাখতে রাণু প্রশ্ন করে, কটা বাজল মিঃ চৌধুরী?

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়টা বললে পার্থ, রাত দুটো।

আলোটা নিবিয়ে দিন।

পার্থ ঘরের আলোটা আবার নিবিয়ে দিয়ে নিজের চেয়ারে এসে বসল।

মিঃ চৌধুরী!

বলুন।

কর্তব্য করতে এসে বেশ জব্দ হলেন তো।

কেন?

সারারাত ঘুমোতে দিলাম না!

ঘুম হোল না বটে কিন্তু একটি বিনিদ্র রাত্রি আমাকে যা দিল তাও তো কম নয় মিস সেন!

সে আবার কি?

কেন আপনার সঙ্গে পরিচয় হল!

হ্যাঁ, এখন দ্রাক্ষা ফল টক ছাড়া কি আর উপায় বলুন? হাসতে হাসতে রাণু জবাব দেয়, ওই দিয়েই মনকে সান্ত্বনা দিন এবারে।

কলকাতায় কোথায় থাকেন?

ক্যামাক্ স্ট্রীটে। রাণু মৃদুকণ্ঠে বলে।

বাড়িতে কে কে আছে?

সেদিক দিয়ে ভাগ্য আছে আমার কিন্তু।

কি রকম?

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সত্যি!

হ্যাঁ, আই অ্যাম্ দি মনার্ক অফ অল আই সারভে।

তা হলে আমারই দশা বলুন?

আপনিও—

একমেবাদ্বিতীয়ম্। বাবা বছর আষ্টেক হল মারা গেছেন আর মা চলে গেছেন তখন আমার বয়স শুনেছি মাত্র দু' বছর।

আর কেউ নেই!

না। পাটনায় বাবার বাড়িটা বিক্রি করে ব্যাংকেই টাকাগুলো জমা দিয়ে দিয়েছি। এখন যেখানে যখন থাকি সেখানেই আমার বাড়ি। কোন বন্ধন নেই, কোন দায়িত্ব নেই—তার পর একটু থেমে বলে, এক সময় বেশ ভালই লাগত এই বন্ধনহীন দায়িত্বহীন জীবনটা, কিন্তু আজকাল মধ্যে মধ্যে মনে হয়—

কি?

এক জন কেউ অন্তত থাকলে হয়তো ভাল হত। এক জন তা সে যেই হোক না কেন। কিন্তু না সত্যিই আর বকবকানি নয়, আপনি এবারে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। একে আপনার অসুস্থ শরীর, সারা রাত না ঘুমোলে হয়তো কাল আরও কাহিল হয়ে পড়বেন।

কেন, আপনি তো আছেন! আপনি নিশ্চয় আমাকে এ অবস্থায় একা ফেলে চলে যাবেন না।

তা যাব না, কিন্তু—

কিন্তু কি?

এখানে কি রকম চিকিৎসা হবে আপনার বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় কালই আপনার কলকাতায় চলে যাওয়া উচিত।

আমিও মনে মনে তাই ঠিক করেছি। কিন্তু একা একা যেতে যে ভরসা হচ্ছে না।

হাসতে হাসতে পার্থ বলে, এই বুঝি সাহস!

বাঃ, সাহসের কি আছে, পা-যে একেবারে ফেলতে পারছি না। তা আপনি যখন এতই আমার জন্য কষ্ট করলেন আর একটু কষ্ট করুন না। চলুন না কাল আমাকে একটু কলকাতায় পৌঁছে দেবেন।

কিন্তু আমি যে ভেবেছিলাম পরশুই ভুবনেশ্বর গিয়ে প্লেন ধরে সোজা দিল্লীতে ফিরে গিয়ে কাজে জয়েন করব। তা আপনি যখন বলছেন, তাই না হয়—

থাক যেতে হবে না আপনাকে!

অমনি রাগ হল বুঝি!

রাগ আবার কি?

তা তো বটেই, গলাতেই যে মালুম দিচ্ছে। সত্যি আপনি একা একা থাকেন কি করে? কথায় কথায় রাগ, কথায় কথায় অভিমান, কে আপনার এত বায়না সহ্য করে বলুন তো বাড়িতে।

রাণু পার্থর কথায় কোন জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে।

কি হল, সত্যিই রাগ করলেন নাকি?

তবু কোন জবাব নেই রাণুর।

মিস সেন।

জবাব নেই তবু রাণুর।

পার্থ এবারে উঠে দাঁড়াল, সুইচ টিপে আলোটা জ্বালল। আলোটা জ্বালাতেই দু'জনার চোখোচোখি হল। রাণুর দু'চোখের কোণে জলে টল টল করছে।

বিস্ময়ে প্রথমটায় একটু যেন ধাক্কা খায় পার্থ কিন্তু পরক্ষণেই দু' পা রাণুর দিকে এগিয়ে এসে বলে, একি, চোখে জল কেন?

কে বলেছে আমার চোখে জল।

জলে চোখ ভরে গিয়েছে আর বলা হচ্ছে কোথায় জল। আরে আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম। যাব, নিশ্চয়ই যাব।

কোন দরকার নেই, কোন দরকার নেই আপনার যাবার?

কথাগুলো বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে রাণুর, চোখের কোল বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়ে।

কোন দরকার নেই?

না—না—না—

দু' হাতে মুখ ঢাকে রাণু। আর সে চেয়ে থাকতে পারে না পার্থর মুখের দিকে।

মুহূর্তকাল যেন কি ভাবে পার্থ! বোধ হয় একটু ইতস্ততই করে।

একটু সংকোচ। একটু দ্বিধা যেন গিয়েও যেতে চায় না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার যায় পার্থ রাণুর সামনে।

মৃদু কণ্ঠে ডাকে, মিস সেন।

কিন্তু আর সাড়া দেয় না রাণু। মুখও তোলে না।

সে যাত্রায় রাণুকে তো সঙ্গে করে কলকাতায় পৌঁছে দিতে হয়েছিলই, কলকাতাতেও আরও দশ দিন ছুটি নিয়ে রাণুর দেখাশোনা করতে হয়ে ছিল পার্থকে। তবু রাণু হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও পার্থ এক দিনের বেশী রাণুদের ক্যামাক্ স্ট্রীটের বাড়িতে থাকে নি। চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে গিয়েই উঠে ছিল সে।

তবে হোটেলে ওঠাটা নাম মাত্র। রাত সাড়ে এগারটা বা বারটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত হোটেলে থাকত পার্থ, বাকী সময়টা পার্থর রাণুদের ক্যামাক্ স্ট্রীটের বাড়িতেই কেটে যেত। আর সেই দশ দিনেই যেন রাণুর মনের মধ্যে একটা ওলট-পালট ঘটে গিয়েছিল। এবং মনে মনে রাণু যে প্রতিজ্ঞা করেছিল —মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে যেখানে এতটুকু সম্ভাবনা আছে সেখানে ভুলেও কোন দিন পা দেবে না সেই প্রতিজ্ঞা বুঝি তার বন্যার জলে কুটোর মতই ভেসে গেল। আর সেই কথাটা রাণু জানতে পারল সেই দিনই, যেদিন পার্থ সকালে এসে জানাল পরের দিনই দিল্লীতে গিয়ে কাজে জয়েন করবার জরুরী পরোয়ানা এসেছে।

পার্থর কমন সেন্সএর আশংকাটা মিথ্যা হয় নি। কলকাতায় এসে এক্স-রে করে জানা গিয়েছিল সত্যি সত্যিই গোড়ালির হাড় ভেঙেছে রাণুর। ফ্রাক্চারই হয়েছে। অভিজ্ঞ সার্জন ডাঃ মুখার্জী এসে পা প্লাস্টার করে দিয়ে গেলেন। এবং বেশ কিছু দিনের জন্য পরিপূর্ণ বিশ্রামের কঠোর নির্দেশ জারি করে গেলেন।

ডাঃ মুখার্জী রাণুর পূর্বপরিচিত। ব্যারিস্টার রাধেশ সেনের এক জন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি বললেন, একেবারে নট্ নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু মাই চাইলড্!

রাণুর চঞ্চল স্বভাবের কথাটা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না বলেই বিশেষ করে আরও জোর দিয়ে কথাটা বলে গেলেন।

পার্থ হেসে বলে, যাক এবারে শুয়ে থাকো।

খুব খুশী হয়েছ বলে মনে হচ্ছে?

তা একটু হয়েছি বৈকি। মিথ্যা বলব না।

স্বার্থপর।

পার্থ হেসেছিল প্রত্যুত্তরে।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এক প্রকার বন্দিনী জীবন যাপন করতে হবে শুনেই রাণু একটু চিন্তিত হয়েছিল। ঐ ভাবে কেউ সর্বক্ষণ বসে আর শুয়ে কাটাতে পারে নাকি! কিন্তু রাণু বেঁচে গিয়েছিল ঠিক ঐ সময় পার্থকে তার পাশে পেয়ে। পার্থ হাসি গল্পে গানে ও গীটারের স্বরঝঙ্কারে যেন তার সমস্ত একঘেয়েমি থেকে রাণুকে মুক্তি দিয়েছিল।

তাই সেদিন সকালে এসে পার্থ যখন বললে, কাল ভোরের প্লেনে দিল্লী যাচ্ছি, হঠাৎ মুখটা রাণুর শুকিয়ে ওঠে।

তার মানে?

মানে আবার কি। জরুরী পরোয়ানা এসে গিয়েছে। কাল রাত্রে হোটেলে ফিরে গিয়ে দেখি টেবিলের উপরে টেলিগ্রাম পড়ে আছে।

কথাটা শুনেই রাণু যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। পার্থর জন্য কাপে চা ঢেলে দুধ চিনি দিয়ে চেয়ারটার উপর বসে বসে রাণু চামচ নাড়তে থাকে. কোন কথাই বলে না।

রাণুর গম্ভীর মুখটার দিকে চেয়ে পার্থ বলে, কিন্তু মুখ ভার করলে কি হবে, যেতে তো হবেই।

মুখ ভার আমি করেছি নাকি!

সামনের দেওয়ালে ঐ আয়নাটার দিকে তাকালেই তার অকাট্য প্রমাণ দেবে। হাসতে হাসতে পার্থ বলে।

রাণু সে কথার কোন জবাব না দিয়ে চায়ের কাপটা নিঃশব্দে পার্থর দিকে এগিয়ে দেয়। পার্থ কাপটা হাতে তুলে নেয়।

রাণু অন্যমনস্ক ভাবে সামনের খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরের আকাশটার দিকে চেয়ে থাকে।

রাণু!

রাণু সাড়া দেয় না।

পার্থ আবার ডাকে, রাণু—

কি?

পরের চাকরি করি, আজ না হয় কাল যেতে তো আমাকে হবেই—

আমি কি বলছি নাকি তুমি যাবে না।

কিন্তু তোমার চোখে জল দেখলে যে আমি যেতে পারব না। কথাটা বলতে বলতে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে রাণুর চেয়ারের পাশে উঠে এসে দাঁড়ায় পার্থ। একটা হাত রাণুর কাঁধের উপর রাখে।

যেতে যে আমারই খুব ভাল লাগছে তা নয়, কিন্তু যেতে তো হবেই।

ছুটি বুঝি আর পাওয়া যায় না।

পাওয়া যায় না নয় কিন্তু সরকার দেবে না।

কেন?

জরুরী একটা স্কিমের ব্যাপারে কনফারেন্স আছে যে।

তা হলে তো যেতেই হবে।

হ্যাঁ তবে বোধ হয় আবার মাসখানেক বাদেই কলকাতায় আসছি।

সত্যি?

হ্যাঁ, ডিসেম্বরে এখানে একটা কনফারেন্স আছে।

এবারে কিন্তু কলকাতায় এলে হোটেলে ওঠা আর কিছুতেই চলবে না।

তবে কোথায়?

কেন এখানে।

বল কি, ভয় নেই!

ভয় আবার কিসের?

লোকনিন্দার।

না।

বল কি। লোকনিন্দার ভয় কর না তুমি?

না করি না।

লোকনিন্দাকে তুমি ভয় কর না। এত সাহস তোমার কোথা থেকে হল বল তো রাণু।

কারণ যার ষোল আনাই বেশির ভাগ মিথ্যা তাকে ভয় করা তো কাপুরুষতা পার্থ।

বেশ। তা হলে আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি রাণু, এবারে এসে তোমার এখানেই উঠব।

আমিও সাগ্রহে সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করব।

পরের বার পার্থ কলকাতায় এসে তার কথা রেখেছিল, রাণুদের ক্যামাক্

স্ট্রীটের বাড়িতেই উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই কথাটাই কতবার মনে হয়েছে রাণুর, অমন করে যদি তার ওখানে ওঠবার জন্য প্রতিজ্ঞা না করিয়ে নিত পার্থকে, তবে বুঝি অমনি করে অত শীঘ্র পার্থকে তার বাকী জীবনের জন্য হারাতে হত না। সব কিছুর উপরে অত তাড়াতাড়ি অমনি করে পূর্ণচ্ছেদ পড়ত না।

কিন্তু আবার মনে হয়েছে যা হবার তা তো হবেই। অনিবার্যের গতি তো কেউ রোধ করতে পারে না, সেও করতে পারে নি। সেবারে কলকাতায় এসে পনের দিন ছিল পার্থ রাণুদের ক্যামাক্ স্ট্রীটের বাড়িতে। তার পর যখন যাবার সময় আবার এল তারই দুই দিন আগে পার্থ কথাটা বললে।

রাত্রের শোতে দু'জনে কি একটা ইংরাজী বই দেখতে গিয়েছিল। গৃহে ফিরে ব্যালকনিতে বসে গল্প করতে করতে হঠাৎ এক সময় কথাটা বললে পার্থ।

ক দিন থেকেই একটা কথা ভাবছিলাম রাণু।

কি ?

গত বার তোমার এখান থেকে দিল্লীতে ফিরে যাবার পথে প্রথম প্লেনে বসেই অবিশ্যি কথাটা আমার মনে হয়েছে।

কি কথা ?

কি কথা যে আমি বিশেষ করে বলতে চাই তা কি আরও স্পষ্ট করে বলবার কোন প্রয়োজন আছে আজ আর রাণু ?

পার্থর কথায় হঠাৎ যেন কেমন স্তব্ধ হয়ে যায় রাণু।

কোন কথাই বলতে পারে না। চুপ করে থাকে।

পার্থ ডাকে, রাণু—

রাণুর তবু সাড়া পাওয়া যায় না।

কই আমার কথার জবাব দিচ্ছ না যে ?

রাণু কোন কথা না বলে চেয়ার ছেড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল নিঃশব্দে, গিয়ে সামনের ব্যালকনিতে দাঁড়াল।

পার্থ একটু অপেক্ষা করে। তার পর এক সময় তার পাশে এসে দাঁড়ায়।

রাণু—

রাণু নীরব।

কই আমার কথার জবাব দিলে না ?

আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

রাণু!

ক্ষমা করো আমাকে তুমি।

কিন্তু কেন, কেন একথা বলছ রাণু?

হঠাৎ রাণু যেন কান্নায় ভেঙে পড়ে, আর কিছু তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। তোমার তুটি পায়ে পড়ি।

রাণু।

না, না—তা হয় না। হতে পারে না।

রাণু টলতে টলতে টলতে ঘরে চলে গেল। আর পাথরের মত ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রইল পার্থ তার পরেও অনেকক্ষণ।

॥ ১৪ ॥

রাণু ভেবেছিল তার ঐ কথাটা উচ্চারিত হবার পর পার্থ আর হয়তো এক মুহূর্তও তার ওখানে থাকবে না। কিন্তু তার পরও প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই ছিল পার্থ ঐখানে, কিন্তু ঐ সম্পর্কে আর দ্বিতীয় কোন কথা বলে নি।

একটি বারের জন্যও দ্বিতীয় প্রশ্ন করে নি। একটি বারও জিজ্ঞাসা করে নি, কেন রাণুর পক্ষে অসম্ভব। কেবল রাত্রে টেবিলে খেতে বসে বলেছিল, তোমার ড্রাইভারকে বলে রেখো রাণু, ভোরের প্লেনেই কিন্তু আমি যাচ্ছি।

কাল ভোরেই!

কাল ভোরে নয় আজ ভোরেই। সংশোধন করে দেয় রাণুর কথাটা পার্থ।

ঐ তুটি কথা ছাড়া বাকী সময়টা তাদের খাওয়ার টেবিলে স্তব্ধতার মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হয়। তু'জনের কাছ থেকে তু'জনে বিদায় নিয়ে যে যার নির্দিষ্ট ঘরে শুতে গেল এক সময়।

কিন্তু সে রাত্রে পার্থও জানে না যেমন রাণু একটি বারের জন্যও চোখের পাতা বোজে নি, তেমনি রাণুও জানে নি পার্থও একটি মুহূর্তের জন্য চোখের পাতা বোজে নি। অথচ তারা পাশাপাশি ঘরেই শুয়েছিল সে রাত্রে।

সকাল ছটায় প্লেন। ভোর চারটেতেই শয্যা ছেড়ে উঠে পড়েছিল পার্থ। শেভ করে হাত মুখ ধুয়ে যখন সে প্রস্তুত হচ্ছে, একটা পাতলা কমলালেবু রঙের শাল গায়ে জড়িয়ে রাণু এসে ঘরে ঢুকল।

পার্থ সুটকেসটা গোছাচ্ছিল। রাণুর পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল। এবং দুজনার চোখাচোখি হতেই পার্থ মৃদু হাসে। এবং বলে, সুপ্রভাত।

তার পর আরও ঘণ্টাখানেক কাছাকাছি দু'জনে থাকে। ভৃত্য এসে চায়ের ট্রে রেখে যায়। রাণুই চা তৈরী করে দেয়। চা পান শেষ হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিদায়ের মুহূর্তও ঘনিয়ে আসে।

এতক্ষণ রাণু একটি কথাও বলে নি, চুপ করেই ছিল। কিন্তু পার্থ যখন হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, এবারে তা হলে রওনা হতে হয়।

রাণু শুধায়, পার্থ, একটা কথার শুধু জবাব দিয়ে যাও যাবার আগে।

পার্থ রাণুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, বল?

আর কি আমাদের দেখা হবে?

হঠাৎ এ কথাটা কেন তোমার মনে হল রাণু?

কেন মনে হল জানি না। তবে মনে হল বলেই কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম।

নিশ্চয়ই, এদিকে এলে দেখা হবে বৈকি।

ও কথা বলছ কেন? আর কি তা হলে তুমি এদিকে আসবে না?

মুহূর্তকাল বুঝি পার্থ চুপ করে থাকে। তার পর মৃদু কণ্ঠে বলে, প্রশ্নটা সত্যিই কিন্তু কঠিন রাণু।

কঠিন!

নয়। এই মুহূর্তে কেমন করে তোমার ঐ প্রশ্নের জবাব দিই বল তো!

পার্থ!

তাই। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তো মিথ্যা নয়। তাই তো ভয়।

ভয়?—

হ্যাঁ, কারণ আমার নিজের ভবিষ্যৎটাই যে নতুন করে আবার ভাবতে হবে।

পার্থ!

ছলোছলো চোখে তাকায় রাণু পার্থর মুখের দিকে।

কিন্তু চিন্তার কোন কারণ নেই তোমার। কারণ যাই ভাবি না কেন, যাই স্থির করি না কেন, তুমি সর্বাগ্রে জানতে পারবে নিশ্চয়ই জেনো।

সত্যি বলছ?

সত্যিই বলছি।

ভৃত্য শ্যাম ঐ সময় এসে ঘরে ঢুকল, ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসেছে দিদিমণি।

পার্থ ভৃত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, জিনিসগুলো আমার তা হলে

গাড়িতে তুলে দাও শ্যাম।

যে আজ্ঞে।

শ্যাম সুটকেসটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পার্থ রাণুর মুখের দিকে তাকাল, চলি তা হলে রাণু—

এসো!

পার্থ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিন্তু রাণু ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে প্রস্তরমূর্তির মত। সব যেন শূন্য হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ যেন মনে হয় রাণুর—পার্থ ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন শূন্য হয়ে গিয়েছে। সব কিছু যেন তার মিথ্যা হয়ে গেল। বাইরে রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারে গাড়ির শব্দটা মিলিয়ে গেল।

ঐ দিনই দ্বিপ্রহরে এল কৃষ্ণ আয়ার। কৃষ্ণ আয়ারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল —পুরীতে প্রথম পরিচয়ের সময়ে পা ভাঙা অবস্থায় পার্থকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় আসবার পর। পার্থ চৌধুরীর দীর্ঘ কালের বন্ধু কৃষ্ণ আয়ার। এক সময় কলেজে ছাত্রজীবনে ওদের একত্রে চার বছর কেটেছিল। তার পর বিলেতেও পরবর্তী জীবনে একত্রে একই ল্যাণ্ডলেডির বাড়িতে দুই বছর কাটে। তবে দু' জনের শিক্ষার ক্ষেত্র ও পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্র কিন্তু বরাবরই ছিল ভিন্ন।

এক জন আর্টসের ছাত্র অন্য জন বিজ্ঞানের। একজন ইতিহাসের অধ্যাপক, অন্য জন ইঞ্জিনীয়ার।

কৃষ্ণ আয়ার দক্ষিণ ভারতের লোক হলেও দুই পুরুষ ধরে তারা কলকাতারই অধিবাসী। সেই দিক দিয়ে একমাত্র নামটা ছাড়া তার চমৎকার বাংলায় কথাবার্তা শুনলে বোঝবার উপায় ছিল না যে সে বাঙালী নয়। সেবারে কলকাতায় যখন ছিল পার্থ, রাণুর দেখাশোনার ব্যাপারে সেই বারই কৃষ্ণ আয়ারকে রাণুর ওখানে এনে তার সঙ্গে রাণুর পরিচয় করিয়ে দেয় পার্থ। সেই পরিচয়টাই পরে হৃদ্যতায় পরিণত হয়েছিল ওদের।

দ্বিতীয় বার পার্থ এসে যখন রাণুদের ক্যামাক্ স্ট্রীটের বাড়িতেই উঠল, প্রত্যহ সন্ধ্যায় কৃষ্ণ আয়ার আসা-যাওয়া করত এবং রাত নটা-দশটার আগে বাড়ি ফিরত না। পার্থ কিন্তু তার চলে যাওয়ার ব্যাপারটা কৃষ্ণ আয়ারকে জানায় নি। আগের দিন কথা হয়েছিল দুই বন্ধুর মধ্যে যে দিন ভোরে পার্থ দিল্লী চলে গেল সেই দিনই দ্বিপ্রহরে ওরা তিন জন একত্রে হোটেলে লাঞ্চ খাবে।

সেই ব্যবস্থা মতই কৃষ্ণ আয়ার এসেছিল রাণুর গৃহে।

কিন্তু সেখানে এসে রাণুর মুখে হঠাৎ ঐ দিনই ভোরের প্লেনে পার্থ তাকে ফোনে পর্যন্ত কোন কিছু না জানিয়ে দিল্লী চলে গেছে শুনে যেন রীতিমত বিস্মিতই হয় কৃষ্ণ আয়ার।

ব্যাপারটা তো কিছু বুঝতে পারছি না মিস সেন, আমাকে কিছু জানাল না পর্যন্ত, হঠাৎ চলে গেল, অফিস থেকে কোন জরুরী ডাক এসেছিল নাকি?

তা তো ঠিক বলতে পারি না মিঃ আয়ার? মৃদু কণ্ঠে রাণু জবাব দেয়।

রাণুর গলার স্বরেও যেন ঐ মুহূর্তে কেমন বিস্ময় লাগে কৃষ্ণ আয়ারের। একটু যেন চমকেই রাণুর মুখের দিকে সে তাকায়। কারণ ওদের দু'জনার মনের সংবাদটা আর কেউ না জানলেও আয়ারের অবিদিত ছিল না।

তবে! তবে হঠাৎ চলে গেল যে পার্থ?

তাও জানি না।

আশ্চর্য, আজ আমাদের তিন জনের হোটেলে একত্র লাঞ্চ খাবার কথা ছিল —আপন মনেই যেন কথাগুলো উচ্চারণ করে কৃষ্ণ আয়ার।

আশ্চর্য! আমার হয়ে তো সে কথাটাও—আমন্ত্রণটা আপনাকে জানাতে বলে দিয়েছিলাম পার্থকে।

তার পর একটু থেমে হেসে আবার বলে, যাক গে, চলুন তা হলে আমরা দু জনেই যাই।

কিন্তু শরীরটা যে আজ আমার তেমন ভাল নেই সকাল থেকেই মিঃ আয়ার।

কেন, শরীর ভাল নেই কেন! জ্বর-জারি কিছু হয় নি তো?

না, না—সেরকম কিছু না। মাথাটা কেমন যেন ভার হয়ে আছে।

ও। তবে থাক।

আয়ার তখনকার মত বিদায় নিয়ে বের হয়ে গেল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে তার একটা সন্দেহ কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। কেবলই তার মনে হতে লাগল কোথায় যেন একটা গোলমাল কিছু ঘটেছে।

রাণুকে সে অবিশ্যি অল্পদিনই চেনবার অবকাশ পেয়েছে, কিন্তু পার্থ চৌধুরী তার দীর্ঘ দিনের বন্ধু। তার চরিত্রের মধ্যে হঠকারিতা তো কোথাও নেই বাইরে থেকে স্বভাবের মধ্যে তার একটা চঞ্চল শিশুসুলভ ভাব সর্বক্ষণ দেখা গেলেও ভিতরে ভিতরে তার একটা কঠিন দৃঢ় পুরুষের মন আছে। ছোটখাটো

ঝগড়াঝাঁটি বা মান-অভিমানের ব্যাপার যে নয় এটা অন্তত স্থির বুঝেছিল কৃষ্ণ আয়ার। তবু সে একটু চিন্তিতই হয়েছিল।

কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ঐ দিনই রাত্রে দিল্লী থেকে পার্থর ট্রাংক কল পেয়ে।

কি ব্যাপার রে পার্থ, হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই চলে গেলি ?

হ্যাঁ রে, হঠাৎই চলে এলাম।

কিন্তু কেন তাই তো জিজ্ঞাসা করছি।

হঠাৎ যে সব আমার কাছে ফাঁকা মিথ্যে হয়ে গেল।

তার মানে ?

রাণুকে বিয়ের প্রোপোজাল দিয়েছিলাম।

সে বুঝি না বলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে তুইও ভেবে নিলি না। আচ্ছা আহাম্মক তো তুই।

রাণুকে তুই কতটুকু চিনতে পেরেছিস জানি না কিন্তু আমি তাকে যে চিনি, ও যখন না বলেছে সেটা সত্যিকারেরই না।

ওরে আহাম্মক ওটা নারীপ্রকৃতি।

উঁহু।

উঁহু কি !

হ্যাঁ। কারণটা অবিশ্যি সে বলে নি তবে এটা বুঝেছি সত্যিকারের কোন কারণেই সে না বলেছে।

ঠিক আছে, এ নিয়ে তোর আর মাথা ঘামাতে হবে না। যা করবার আমিই করব।

ওরে না, না—দোহাই তোর। ও ব্যাপার নিয়ে তার সঙ্গে আর তুই কোন আলোচনা করিস না।

বেশ। তুই যখন বলছিস তাই হবে। কিন্তু ব্যাপারটা বোধ হয় ভাল করছিস না পার্থ।

জীবনে যা কিছু আমরা করতে চাই বা করি তার সব কিছুই কি ভাল হয় রে! এ সম্পর্কে আমার বিশেষ অনুরোধ রইল রাণুর সঙ্গে কোন আলোচনা করিস না ভাই।

পরে অবিশ্যি বুঝেছিল আয়ার, আলোচনা করেও আর কোন ফল হত না।

রাণুর নিজের দিক থেকেও দুশ্চিন্তার বুঝি অন্ত ছিল না। সেদিন ঐভাবে পার্থর নিঃশব্দ প্রস্থানটা যে শুধু প্রস্থানই নয় আরও গভীর কিছু, পার্থ চলে যাবার পর থেকে সর্বক্ষণ যেন সেই কথাটাই মনে হতে থাকে রাণুর। কিন্তু পার্থ চলে যাবার পর এক মাস পার্থর দিক থেকে কোন সাড়াশব্দই পেল না। এবং ঠিক এক মাস পরে এল পার্থর চিঠি।

রাণু,

গতকাল এখানকার কাজ আমি শেষ করে দিলাম। সরকার কিছুতেই আমার রেজিগ্‌নেশন অ্যাকসেপ্ট করতে চাইছিল না কিন্তু আমারও যে আর উপায় ছিল না। অবিশ্যি ডিসিশন নেবার আগে আমি এই এক মাস অনেক ভেবেছি শেষ পর্যন্ত দেখলাম ঐ একটি রাস্তাই রয়েছে আমার সামনে।

এই সঙ্গে আরও একটা সংবাদ তোমাকে দেওয়া আমার প্রয়োজন। আগামী ১৫ই অর্থাৎ আর মাত্র দশ দিন পরে আমি ইউরোপের দিকে পাড়ি দিচ্ছি। ইউরোপের ঠিক কোথায় যাব যদিও এখনও স্থির করতে পারি নি, তবে আপাতত বোধ হয় কিছু দিন লণ্ডনেই থাকব।

আমি আগামী কালই বোম্বাই রওনা হয়ে যাচ্ছি। এ কটা দিন বম্বেতেই থাকব, তার পর সেখান থেকেই উঠব জাহাজে। বম্বেতে মেরিন ড্রাইভের হোটেলে থাকব। যাবার আগে কি তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে না। ইতি—

চিরশুভার্থী পার্থ চৌধুরী

চিঠিটা পড়তে পড়তে রাণু যেন পাথর হয়ে যায়।

তার পর অনেকক্ষণ পরে তার বাবার শয়ন-ঘরে গিয়ে ঢোকে। রাধেশ সেনের মৃত্যুর পর থেকে এই ক বছর তাঁর চিরদিনের ব্যবহৃত শয়ন-ঘরটা ঠিক যে ভাবে সাজানো-গোছানো ছিল রাণু ঠিক তেমনিই রেখে দিয়েছিল। কোন কিছুই একটুকু নাড়া-চাড়া করে নি। এবং দীর্ঘ এই ক বছরে বাপের মৃত্যুর পর নিজের সমস্ত কাজের মধ্যেও রাণু প্রত্যহ এক বার করে সময় নিয়ে সে ঐ ঘরটা নিজের হাতে ঝাড়পোঁচ করে। ঘরে ঢুকলে মনে হত যেন রাধেশ সেন এখন সেটি ব্যবহার করছেন। ঘরটি ঝেড়ে-মুছে বাপের ফটোতে প্রত্যহ একটি করে মালা পরিয়ে, ধূপ জেলে দিয়ে প্রণাম জানিয়ে আসত রাণু।

আজ অসময়েই পার্থর চিঠিটা হাতে করে রাণু সেই ঘরে এসে ঢুকল। রাধেশ সেনের ছবিটার সামনে এসে দাঁড়াল।

বাপের ছবিটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দুচোখে জল ভরে আসে

রাণুর। বলে, বল বাবা, এখন আমি কি করি। বরাবর তুমি বলে এসেছ আমার মনের জোরের নাকি অভাব নেই, কিন্তু আজ যে মনের মধ্যে কোন জোরই পাচ্ছি না। আমাকে সইবার শক্তি দাও বাবা, সইবার শক্তি দাও। তোমার কাছে একদা যে প্রতিজ্ঞা করে করেছিলাম সে প্রতিজ্ঞা থেকে যেন বিচ্যুত না হই এই আশীর্বাদ কর বাবা। এই আশীর্বাদ কর।

চার ঘণ্টা পরে সেই ঘর থেকে যখন বেরুল রাণু, ভৃত্য শ্যাম এসে সামনে দাঁড়াল, কি হয়েছে দিদিমণি, এতক্ষণ ডেকে ডেকেও সারা দাও নি কেন?

কিন্তু কথাটা বলে ভাল করে শ্যাম রাণুর মুখের দিকে তাকাতেই যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়।

সব ভুলে গিয়ে পুনরায় শুধায়, কি হয়েছে দিদিমণি?

রাণু ভৃত্যের কথার কোন জবাব না দিয়ে সোজা স্নানের ঘরের দিকে চলে যায়। এবং স্নান করে বাথরুম থেকে বেরুতেই শ্যাম আবার সামনে এসে বলে, এত বেলায় কি তুমি ভাত খাবে দিদিমণি?

না। তুই বরং এক কাপ চা করে দে।

চায়ের কাপটি সবে নিঃশেষিত হয়েছে, শ্যাম এসে বললে, দিদিমণি, আয়ার সাহেব এসেছেন।

যা, এই ঘরেই ডেকে নিয়ে আয়।

আয়ার কলেজের ঠিকানাতেই পার্থর চিঠিটা পেয়েছিল এবং সেখান থেকেই সোজা ছুটি নিয়ে রাণুর ওখানে চলে এসেছে।

কৃষ্ণ আয়ার এসে ঘরে ঢুকতেই পরস্পরের চোখোচোখি হল। রাণু কোন কথাই বললে না। কেবল পরক্ষণেই তার চোখের দৃষ্টিটা নামিয়ে নিল। আয়ারও একটা শূন্য চেয়ার টেনে নিয়ে তার মুখোমুখি বসল। কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে অতঃপর যেন একটা অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করে। আরও কিছুক্ষণ পরে সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কৃষ্ণ আয়ারই প্রথম কথা বলে মৃদু কণ্ঠে, মিস সেন, আজ পার্থর একটা চিঠি পেলাম—

আমাকেও সে চিঠি দিয়েছে। শান্ত ধীর কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয় রাণু।

আপনার চিঠিতে সে জানিয়েছে বোধ হয় চাকরিতে রেজিগ্‌নেশন দিয়েছে। সামনের পনেরই সে ইউরোপ চলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ!

তার পর আবার কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে স্তব্ধতা বিরাজ করে।

কৃষ্ণ আয়ার আবার বলে, আমি কথা দিয়েছিলাম তাকে যে আপনাদের ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি কোন আলোচনা করব না কিন্তু—

মিঃ আয়ার, আমি জানি কেন সে চলে যাচ্ছে—

জানেন ?

হ্যাঁ, জানি।

তবু তাকে আপনি ফেরাবার চেষ্টা করবেন না মিস সেন ?

রাণু কোন জবাব দেয় না। চুপ করেই থাকে।

মিস সেন ?

বলুন ?

আপনি যে তাকে ভালোবাসেন নিশ্চয়ই সে ধারণাটা আমার ভুল নয়।

না।

তবে ?

তবু আমি পারছি না। তাকে ফেরানো আমার পক্ষে সম্ভব নয় মিঃ আয়ার। মাথা নীচু করেই কথাগুলো বললে রাণু।

তবু সম্ভব নয় ?

না।

তা হলে আর কি বলব বলুন।

রাণু ঐ সময় মুখ তুলে তাকাল। আয়ার দেখল তার দু'চোখ জলে টল টল করছে।

॥ ১৫ ॥

ঠিক যে দিন দ্বিপ্রহরে পার্থর জাহাজ ছাড়বে বম্বে থেকে সেইদিন প্রত্যুষে রাণু গিয়ে উপস্থিত হল হোটেলে। কৃষ্ণ আয়ার দিন চারেক আগেই বম্বেতে এসেছিল বন্ধুকে 'সী-অফ' করতে। রাণু যখন হোটেলে এসে পৌছল কৃষ্ণ আয়ার তখন হোটেলে ছিল না, কি একটা কাজে একটু বের হয়েছিল।

দুই বন্ধুতে মিলে আগের দিন যা গোছগাছ করবার শেষ করে রেখেছিল। সামান্য কিছু যা বাকী ছিল, পার্থ চা পানের পর গুছিয়ে নিচ্ছিল, দরজায় এমন সময় নক্ পড়ল। দরজা খুলে দিতেই পার্থর চোখের দৃষ্টি আনন্দে চিক্ চিক্ করে ওঠে, সামনে দাঁড়িয়ে রাণু।

রাণু!

রাণু কোন কথা না বলে মৃদু হেসে ঘরে ঢুকল।

আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়তো আর এলে না।

রাণু মৃদু হাসল।

বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

রাণু একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে নিঃশব্দে।

কিন্তু এত সকালে কোথা থেকে?

এই হোটেলেরই নীচের তলায় একটা ঘরে কাল বিকেলের প্লেনে এসে উঠেছি আমি।

কাল এসেছ, আর এই হোটেলেই ছিলে?

হ্যাঁ—

তবে কাল এলে না কেন?

প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে জবাব দিল রাণু, এই তো এলাম।

কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করছি কাল এলে না কেন?

তোমার চিঠিতে তা তো তুমি লেখ নি?

লিখি নি?

না। তুমি লিখেছিলে যাবার আগে মাত্র এক বার দেখা করতে। তার পর একটু চুপ করে থেকে মৃদু কণ্ঠে রাণু ডাকল, পার্থ?

বল?

আমি কি এতই অমূল্য কিছু?

পার্থ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিঃশব্দে তাকায় রাণুর মুখের দিকে।

তার মানে?

তার মানে—এই যে কেন তুমি নিজের দেশ জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশে চলে

কখনও জীবনে আজ পর্যন্ত কোন কাজে আমি ফাঁকি দিই নি রাণু। তাই যখন দেখলাম কিছুতেই এখানকার কাজে আর আমার মন লাগছে না তখন ফাঁকি দেওয়ার চাইতে সরে যাওয়াটাই কি ভাল নয়। তাই—

তাই একেবারে নিজের দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছ?

একেবারে চলে যাচ্ছি কে তোমায় বললে?

তাই যদি না হবে তো কাজে রেজিগনেশন দিলে কেন?

যে দায়িত্ব আমার কাঁধের উপরে ছিল সেই দায়িত্বই যখন পালন করতে আর পারব না বলে মনে হল তখন—

তখন রেজিগ্‌নেশন দিতে হবে তাই না!

তাই কি উচিত নয়?

জানি না। তোমার উচিত অনুচিত তোমার কাছে এবং তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। সে সম্পর্কে আমি কিছু বলবও না, বলতেও চাই না। কিন্তু আমার জন্য যদি তুমি দেশ ছেড়ে চলে যাও তো সে দুঃখ সে লজ্জা আমি কোথায় রাখব বলতে পার? আর সেই কথাটাই তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম।

রাণুর স্পষ্ট কথার পর কিছুক্ষণ যেন পার্থ চুপ করে থাকে। কোন জবাবই দিতে পারে না।

তার পর এক সময় মৃদু কণ্ঠে ডাকে, রাণু!

কী?

আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

বল।

তোমার ঐ প্রশ্নের জবাবটা আজ তুমি লক্ষ্মীটি আমার কাছে চেয়ো না।

বেশ, তাই হবে। তবে আমারও একটা কথা বলা রইল—তুমিও যেন আমাকে লজ্জায় ফেলো না।

রাণু?

হ্যাঁ, যাচ্ছ আজ যাও কিন্তু আবার ফিরে এসো।

রাণুর সে অনুরোধের কোন জবাবই দেয় নি পার্থ সেদিন।

পার্থ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবার পর রাণু দীর্ঘ এক বৎসর পত্রের অপেক্ষায় ছিল। রাণু ভেবেছিল পার্থ আর যাই করুক চিঠি অন্তত তাকে সে নিশ্চয়ই দেবে। কিন্তু এক বছরের মধ্যেও যখন তার সেই আকাঙ্ক্ষিত পত্র পার্থর কাছ থেকে এল না, তখন আর তার সন্দেহ রইল না যে, পার্থ সত্যি সত্যিই তার কাছ থেকে সেদিন চিরদিনের মতই বিদায় নিয়ে গিয়েছে।

তবে কৃষ্ণ আয়ারের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা হত রাণুর, তার মুখ থেকেই পার্থর সংবাদ রাণু জানত। কৃষ্ণ আয়ারের কাছে লেখা চিঠি থেকেই রাণু জেনেছিল পার্থ ইউরোপের নানা স্থানে ঐ এক বছর ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল

ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার দেড় বৎসর পরে পার্থর একটা চিঠি এল কৃষ্ণ আয়ারের কাছে।

পার্থ লিখেছিল—

আয়ার,

এই দেড় বৎসর ধরে মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করলাম। অনেক বোঝাপড়া করলাম। রাণুর শেষ প্রশ্নের জবাবটা কি দেব অনেক ভাবলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম, দেশে আর ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর সম্ভব নয় বুঝতে পেরেই জার্মানীর যে গ্রাম থেকে তোমাকে চিঠি লিখছি সেখানেই আপাতত স্থিতি হয়ে বসলাম। ভেবেছিলাম, রাণুকে পৃথক করে চিঠি দেব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হল তার আর প্রয়োজন কি। তোমার এই চিঠির ভিতরেই তো তার সেদিনকার সে প্রশ্নের জবাব সে পাবে। তাকে চিঠিটা দেখিও। ইতি—

পার্থ

কৃষ্ণ আয়ারের কাছে লেখা পার্থর ঐ চিঠিটা পড়বার পর একটি কথাও বলে নি রাণু। নিঃশব্দে শুধু পুনরায় আয়ারের হাতে চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়েছিল পড়া শেষ করে।

মিস সেন!

কিছু বলছিলেন মিঃ আয়ার?

পার্থকে হয়তো তার এই স্বেচ্ছা-নির্বাসন হতে আজও আপনি ফিরিয়ে আনতে পারেন।

পারি, সত্যিই বলছেন পারি মিঃ আয়ার?

সাগ্রহে কথাটা বলে রাণু আয়ারের মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ—কিন্তু যদি—

যদি কি?

আপনি আপনার মতের পরিবর্তন করেন। সত্যিই কি তা সম্ভব নয় মিস সেন?

রাণু কোন জবাব দেয় না।

আপনাদের দু'জনার এত বড় একটা ভালবাসা, সেই সঙ্গে এমন দুটো জীবন এমনি করে ব্যর্থ হয়ে যাবে এর কি কিছুতেই কোন প্রতিকার হতে পারে না মিস সেন?

আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মিঃ আয়ার।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ?

হ্যাঁ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

রাণু সেদিন অতঃপর সংক্ষেপে তার মায়ের ইতিহাস ও তার বাপের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথাটা খুলে বলে।

স্তব্ধ হয়ে বসে আয়ার সব শোনে। তারপর বলে, পার্থ জানে এ সব কথা ?

না। তাকে আমি বলি নি মিঃ আয়ার।

কিন্তু আমি কি বলতে পারি ?

না। কোন প্রয়োজন নেই।

কেন ?

কারণ তাতে করে জটিলতাই বাড়বে, কোন মীমাংসাতেই পৌছানো যাবে না। কিন্তু একটা অনুরোধ আমার থাকল আপনার কাছে।

বলুন ?

তাকে একটা কথা লিখবেন, তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ এক জন মেয়ে, তার জন্য সে নিজেকে এমনি করে পীড়ন করল কেন আর কেনই বা এমনি করে নিজের মাতৃভূমি থেকে চির জীবনের জন্য স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিল। তা ছাড়া মিঃ আয়ার, সে তো আমার মন পেয়েছিলই। সামাজিক লৌকিকতার বন্ধনটুকুর স্বীকৃতির অভাবে এই দেহটাই শুধু পায় নি, কিন্তু আজ এ কথাটুকুও আপনার কাছে স্বীকার করতে এতটুকুও দ্বিধা বা সংকোচ আমার নেই, এতই যদি প্রয়োজন তার ছিল এই আমার তুচ্ছ দেহটাকে, এক বার চাইলেই তো সে তা অধিকার করতে পারত।

মিস সেন !

হ্যাঁ, জানি আপনি চমকে উঠছেন আমার কথাটা শুনে, কিন্তু সে জানত তাকে অদেয় আমার কিছুই ছিল না।

কৃষ্ণ আয়ার রাণুর কথা রাখে নি। চিঠিতে সব কথা জানিয়েছিল তার বন্ধু পার্থপ্রতিমকে।

পার্থ তার জবাবে লিখেছিল, রাণুকে তুমি বলো আয়ার—কেবল মাত্র দেহের লোভে যারা নারীর সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে তাদের দলে পার্থ নয়। আমি চেয়েছিলাম আমার সমস্ত সত্তাকে তার সমস্ত সত্তার মধ্য দিয়ে একীভূত করে পেতে। এবং আমার ধারণা সেটা পেতে হলে শুধু ভালবাসাতেই

হয় না, তার সঙ্গে দেহটারও প্রয়োজন হয় বৈকি। আর সেই প্রয়োজনটা তখনই পূর্ণতা লাভ করে, সর্বাঙ্গসুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে যখন সেটা পরস্পরের একটা পবিত্র শুদ্ধ স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে দাঁড়ায়।

পুরুষ ও নারী কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পরস্পরের মিলনের মধ্যে দিয়ে আসে তাদের পরস্পরের সম্পূর্ণতা। আর আমার বিশ্বাস সে সম্পূর্ণতা একমাত্র সম্ভব পুরুষ ও নারীর বিবাহের মধ্যে দিয়েই। অন্যথায় সমস্ত প্রচেষ্টাটাই একটা উচ্ছৃংখলতায় পর্যবসিত হয়।

আয়ার চিঠিটা দেখিয়েছিল রাণুকে।

রাণু পড়ে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু তার পরই সেও তার ভবিষ্যৎ স্থির করে ফেলেছিল। ইতিমধ্যে এম. এ. পরীক্ষার ফলাফলটা প্রকাশ হয়েছিল। সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল রাণু। বাপের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে সব কিছু দান করে দিয়ে সে সরকারী কলেজে অধ্যাপিকার কাজ নিল। তার পর দেখতে দেখতে চারটে বছর গড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু কই, যে শান্তির আশায় সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে সে আজ বলতে গেলে ভিখারিনী সাজল, সে শান্তির কণাও তো সে পেল না। বুকের সে কান্না তো কই থামল না।

সে রাত্রে চিত্রার চোখেও বুঝি ঘুম ছিল না। মৃণালিনীদের বাড়ি থেকে বের হয়ে বৈঠকখানায় রঞ্জিতের মেসে গিয়ে সেখানেও দেখা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত চিত্রা হোস্টেলে ফিরে এসেছিল। অনেক ডাকাডাকি করে দারোয়ানকে দিয়ে সদর খুলিয়ে নিজের ঘরে এসে সে বাইরের বেশভূষাটাও বদলায় নি, আলোটাও জ্বালায় নি। সেই বেশেই অন্ধকারে সোজা শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তার রুম-মেট সুধীরা চ্যাটার্জী তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে জানতেও পারে না যে চাবি দিয়ে দরজার বাইরের ইয়েল লক্ খুলে চিত্রা ঘরে এসে ঢুকেছে।

দুর্নিবার একটা লজ্জা অপমান আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড একটা অভিমানে যেন চিত্রার সমস্ত বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল। কোন যুক্তি কোন তর্কই তার মন মানতে চাইছিল না। ইদানীং তাদের দীর্ঘদিনের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে চিত্রার কেন যেন মনে হচ্ছিল কোথায় একটা বুঝি সংশয়ের চিড় ধরেছে। সে সংশয়টা

মনের মধ্যেই একটা অদৃশ্য কাঁটার মত সূক্ষ্ম একটা বেদনা জাগায় অথচ মুখে প্রকাশ করা যায় না।

কিন্তু চিত্রা মনকে বুঝিয়েছে, ব্যাপারটা কিছুই নয়। মিথ্যাই সে মনের মধ্যে সংশয়ের পীড়ন বোধ করছে। আজ যেন সেই সংশয়ের অদৃশ্য কাঁটাটা তার সমস্ত মনটাকে বেদনায় আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে। এক কোণের ছোট্ট একটা মেঘ যেন সমস্ত মনটাকে কালো করে ঢেকে দিতে চাইছে। এক বার মনে হয় সবটাই বুঝি তার ভুল, আবার মনে হয় সে বোকা নির্বোধ, তাই নিজেকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস পাচ্ছে।

হঠাৎ কয়েক দিন আগেকার একটা ব্যাপার মনে পড়ে যায় চিত্রার। ব্যাপারটা তুচ্ছ, হয়তো কোন সত্য, কোন গুরুত্বই নেই ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও, তবু ঐ রাত্রির নির্জন অন্ধকারের নিঃসঙ্গতার মধ্যে ব্যাপারটা যেন নিষ্ঠুর সত্য হয়ে তাকে ব্যঙ্গ করতে থাকে।

তাদের ঐ হোস্টেলেই নবাগতা মৃদুলা ভৌমিক। মৃদুলা ভৌমিক নাকি জ্যোতিষ-বিদ্যা চর্চা করে। হস্তরেখা দেখে চমৎকার ভাগ্যগণনা করতে পারে। অনিশ্চিত অজ্ঞাত ভাগ্যকে জানবার ইচ্ছা মানুষ মাত্রেরই। সত্য নয় জেনেও জ্যোতিষীর দিকে নিজের ভাগ্যরেখার পাঠোদ্ধারের জন্য কে না হাত বাড়িয়ে দেয়। সেদিন রবিবার হোস্টেলের কমন রুমে মৃদুলা ভৌমিক হস্তরেখা পাঠ করতে পারে জানতে পেরে অনেকেই নিজের নিজের অজ্ঞাত ভাগ্যের পাঠোদ্ধারের জন্য তার চার পাশে ভিড় করেছিল। চিত্রাও তাদের দলে ছিল।

মৃদুলা ভৌমিক এক-এক জনের হাত দেখে তার ভাগ্য সম্পর্কে নানা ধরনের আশ্চর্য আশ্চর্য সব মন্তব্য করছিল। কারও চাকরিতে উন্নতি, কারও অত্যাশ্চর্যভাবে অর্থপ্রাপ্তি, কারও গোপন প্রেমের কাহিনী, কারও প্রেমে সাফল্য, কারও ব্যর্থতা, কারও বিবাহ ইত্যাদি নানা জনের নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিল একের পর এক মৃদুলা ভৌমিক।

চিত্রা অনেকক্ষণ ধরে এক পাশে বসে সব লক্ষ্য করছিল, সব শুনছিল।

রোগা প্যাঁকাটির মত চেহারা মৃদুলার। কিন্তু হাড়-সর্বস্ব লম্বাটে ধরনের মুখখানার মধ্যে যেন অদ্ভুত একটা লালিত্য আছে। নারীর লালিত্য। আর বড় হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু দুটি যেন বুদ্ধির এক অস্বাভাবিক দীপ্তিতে সর্বক্ষণ ঝক্ ঝক্ করছে।

এ. জি. বি-তে কাজ করে। প্রসাধনের কোন বালাই নেই দেহে ও সাজ-

সজ্জার কোথাও। তবু সেই প্রসাধনহীন চেহারার মধ্যেই যেন একটা রুক্ষ অথচ সুন্দর সজীবতা আছে। কোন পুরুষ বন্ধু নেই, অন্য কোন খেয়াল নেই, জীবনের কোথাও কোন অপব্যয় নেই। চাকরি করে আর বাকী সময়টা জ্যোতিষের চর্চা, আর সেই সঙ্গে যত রাজ্যের বাংলা ইংরাজী উপন্যাস, তাও বেশির ভাগ রহস্য-উপন্যাস পড়ে এবং আপন খেয়াল খুশি মত রঙ তুলি নিয়ে ছবি আঁকে। জীবনের প্রকাশটাই যেন মৃদুলা ভৌমিকের কাছে একটা অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে, সেখানে কোন কুটিলতা নেই, কোন পরশ্রীকাতরতা নেই, নেই কারও প্রতি কোন বিদ্বেষ।

বিয়ে করেনি মৃদুলা ভৌমিক আজও। এবং মৃদুলা ভৌমিককে যারা জানে তারা জানে মৃদুলা ভৌমিকের জীবনে সে সম্ভাবনা সুদূরপরাহতই শুধু নয় কল্পনাতীত। সেটা অবিশ্যি তার দেহে কোনরূপ যৌন আকর্ষণ নেই বলে নয়, বিবাহের ব্যাপারটাই নাকি তার কাছে রীতিমত হাস্যকর, অর্থহীন, সেই কারণে। অথচ মৃদুলা ভৌমিক হস্তরেখা গণনা করতে গেলে, সর্বপ্রথম পুরুষ বা নারী যারই হোক তার বিবাহের ব্যাপারটাই সে বলত।

কিন্তু তাতে যদি কেউ মন্তব্য করত, ও কথা থাক মৃদুলাদি, অন্য কথা বল —তাতে মৃদুলা মৃদু হাস্য সহকারে জবাব দিত, তবে আর কি জানতে চাও। ওটাই তো আমাদের জীবনের আদি ও শেষ কথা।

॥ ১৬ ॥

সকলে একে একে ভীড় পাতলা করে চলে যাবার পর চিত্রা মৃদুলার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

চিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুলা শুধায়, কি ?

এক বার আমার হাতটা দেখে দেবেন মৃদুলাদি ?

চিত্রা একটা ব্যাপার জানত না। মৃদুলা হোস্টেলে আসার পরই চিত্রার ইতিহাসটা শুনেছিল। মোটামুটি চিত্রার ব্যাপারটা সে জানত। মৃদু হেসে চিত্রার দিকে তাকিয়ে মৃদুলা বলে, কি জানতে চাও। বিয়ে আবার তোমার হবে কি না ?

না ঠিক তা নয়, তবে—

বুঝতে পেরেছি। দেখি হাতটা।

চিত্রা হাতটা এগিয়ে দেয়, সরু সরু লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে মৃদুলা চিত্রার প্রসারিত করটা ধরে নিজের দৃষ্টির সামনে টেনে নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কেটে যায়। তার পর এক সময় মৃদুলা বলে, হাতে তোমার একটি মাত্রই বিয়ের রেখা আছে চিত্রা—

কি বললেন ?

এক বারের বেশী দু-বার বিয়ে নেই তোমার হাতে।

এ হতেই পারে না। আপনি আর একটু ভাল করে দেখুন।

দেখেছি। আমার সামান্য বিদ্যা-বুদ্ধিতে যা বুঝতে পারছি, আর বিয়ের কোন আশাই নেই তোমার।

মৃদু হেসে অতঃপর চিত্রা তার প্রসারিত হাতটা মৃদুলার মুষ্টি থেকে টেনে মুক্ত করে নিয়েছিল এবং আর দাঁড়ায় নি সেখানে।

সোজা নিজের ঘরে চলে এসেছিল।

যত সব বুজরুকি।

ইচ্ছা হয়েছিল আসবার আগে মৃদুলা ভৌমিককে সে বলে আসে হাত দেখতে আপনি জানেন না। এবং ইচ্ছা হয়েছিল এও বলে আসে, আগামী ফাল্গুনেই রঞ্জিতের সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে। সবই একপ্রকার স্থির।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কিছুই বলে নি। পরে মনে মনে ভেবেছিল, তাদের বিয়ের রাত্রে আর কাউকে না নিমন্ত্রণ করলেও মৃদুলা ভৌমিককে সে নিমন্ত্রণ করবেই। আর সেই সময় তার কথার জবাবটা দেবে।

তবে কি মৃদুলা ভৌমিকের গণনাই ঠিক। কিন্তু মাত্র মাস দুই আগে শেষ কথা দিয়েছে রঞ্জিৎ তাকে, সামনের এই ফাল্গুনেই কোন একটা তারিখে ওদের বিবাহ হবে। মাঝখানে মাত্র আর তিনটে মাস আছে। এই তিনটে মাসও আর অপেক্ষা করার ইচ্ছাও ছিল না চিত্রার, কিন্তু রঞ্জিৎ বার বার বলতে লাগল, বিয়ে করে ফেললেই তো হয় না, অনেকখানি দায়িত্ব।

কিন্তু সব চাইতে বড় কথা, বিয়ের পর রঞ্জিৎ কোন মেসে বা হোটেলে কাটাতে চায় না, এমন কি এক দিনের জন্যও, একটা রাত্তির জন্যও। যেখানেই হোক, যত ছোটই হোক একটি গৃহ চাই। চিত্রার নিজেরও তাতে করে এতটুকু আপত্তি ছিল না। তা চাই বৈকি! গৃহ একখানা চাই বৈকি। জীবনের সব

চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা তার ভালবেসে ঘর বাঁধা। ছোট নিরালা নিভৃত একখানি ঘর।

মনোতোষকে নিয়ে সে ঘর বাঁধতে পারেনি। ঘর আর স্বামী। রঞ্জিৎকে ঘিরে সেই ছুটোরই স্বপ্ন দেখেছে এত দিন চিত্রা। তাইতেই বাধ্য হয়ে চিত্রাকে ফাল্গুন পর্যন্ত অপেক্ষা করবার জন্য মত দিতে হয়েছিল। তা ছাড়া আজকালকার দিনে বাড়ি পাওয়া তো মুখের কথা নয়। বাড়ি এবং মনের মত বাড়ি পাওয়া।

হোস্টেলের দোতলায় সীটিং রুমের ঘড়িটায় ঢং ঢং করে সময় সংকেত বাজতে শুরু হল। ঢং ঢং ঢং তিনটে বাজল। রাত তিনটে বেজে গেল।

কি সব আবোল-তাবোল ভাবছে চিত্রা। হয়তো কোন বিশেষ কারণে রঞ্জিৎ আটকা পড়ে গিয়েছে তাই কথা থাকা সত্ত্বেও মৃণালিনীদের বেলতলার বাড়িতে আসতে পারে নি। মিথ্যে অসম্ভব সব ভেবে ভেবে সে মাথা গরম করছে।

কিন্তু একটা ফোন। একটা ফোনও তো করতে পারত রঞ্জিৎ তাকে। মৃণালিনীদের বাড়িতে তো ফোন রয়েছে। তবে এমনও তো হতে পারে যেখানে রঞ্জিৎ গিয়েছিল সেখানে ফোন নেই। তা ছাড়া এত ভাবছেই বা কেন চিত্রা কয়েক ঘণ্টা পরে কাল সকালেই তো অফিসে আবার দেখা হবে। মুখোমুখি স্পষ্ট করে তখন জিজ্ঞাসা করলেই তো হবে। সমস্ত সংশয়ের মীমাংসা তো সেই সময়ই করে নেওয়া যাবে।

চিত্রা শয্যা থেকে উঠে পড়ল। ঘরের কোণে সরাই থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে ঢক ঢক করে জলটা খেয়ে ফেলল। কোথায় বাইরে যেন একটা কুকুর ডাকছে। দক্ষিণের খোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল চিত্রা।

রাত্রির আকাশের যেটুকু চোখে পড়ে, কালো একখানি পাতের উপরে যেন কয়েকটি—তারা নয়, সোনালি বুটি। সামনের খোলা জমিতে পর পর কতকগুলো নারকেল গাছ আর তাল গাছ। অন্ধকারে হাওয়ায় নারকেল গাছ ও তালগাছের পাতা থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ বেরুচ্ছে। সর্ সর্—সিপ সিপ্।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেন যেন চিত্রার ছু চোখের কোল বেয়ে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়তে থাকে। পৃথিবীতে কি সত্যিই ভালবাসার কোন দাম নেই। ভালবাসা বলে সত্যি সত্যি কিছুই নেই। সবটাই মুখের কথা। প্রসাধনের মত একটা কৃত্রিম বেশ—অভিনয় মাত্র।

গোবরডাঙা থেকে ফিরতে সেদিন শেষ পর্যন্ত রাতই হয়ে গিয়েছিল রঞ্জিতের। কিন্তু মজা হচ্ছে উমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছে সাইকেল রিক্‌শায় ওঠবার সময় চিত্রার কথা মনে পড়েছিল রঞ্জিতের এক বার, কিন্তু তার পর স্টেশন পৌঁছে ট্রেনে উঠে বসবার পর আর একটি বারও মনে পড়ে নি চিত্রার কথা। আর একটি নতুন মুখ তার মনের প্রায় সবখানিই জুড়ে এক অপূর্ব স্নিগ্ধ রসে যেন তাকে আপ্লুত করে তুলেছে।

আজকের দিনের সভ্যতার গিল্‌টির চাকচিক্য নেই। জর্জেট, সিফন নাইলন নয়, অত্যন্ত সাদামাটা চেহারায় অনাড়ম্বর সাদাসিধে বেশভূষা। ওষ্ঠপ্রান্তে সোসাইটির কষ্টকর সেই চাপা হাসি নয়, স্বতঃ-উৎসারিত স্নিগ্ধ অনাবিল হাসির প্রাচুর্য। মন রেখে সভ্যতা বাঁচিয়ে ওজন করা কথা নয়, সহজ স্পষ্ট কথা। রঞ্জিতের মনের তারে যেন এক নতুন সুরের গুঞ্জন তুলেছে।

উমা, উমা, উমা—মিষ্টি নামটি।

ও লাইনের শেষ লোকাল ট্রেন। যাত্রীর ভীড় তখন এক প্রকার নেই বললেই চয়। কামরায় সে একা যাত্রী। বিচিত্র একটানা একটা শব্দ জাগিয়ে ট্রেনটা অন্ধকারে কলকাতার দিকে ছুটে চলেছে। গাড়ির দোলানিতে চোখের পাতায় যেন ঘুম নেমে আসে রঞ্জিতের। চলন্ত গাড়ির খোলা জানালা পথে মাথাটা রেখে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে আছে রঞ্জিৎ।

পিসীমা আজ আসার সময় বার বার করে বলে দিয়েছে, সময় পেলে যেন সে গোবরডাঙায় যায়। কোন কথা বা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে আসে নি সে পিসীমাকে, যদিও ইচ্ছা ছিল প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসার। কোথায় যেন একটা সংকোচ অনুভব করে রঞ্জিৎ শেষ পর্যন্ত।

সামনের শনিবার মনে পড়েছে কি একটা পর্ব উপলক্ষে যেন অফিস ছুটি ওদের। শনিবার সকালবেলাই তো অনায়াসে চলে যেতে পারে গোবরডাঙায় রঞ্জিৎ। একেবারে ভোর বেলা স্নান করে চা খেয়েই। আচ্ছা গোবরডাঙা যাবার ফার্স্ট ট্রেনটা কটায়? শিয়ালদহ স্টেশনে নেমেই জেনে নিতে হবে, গোবরডাঙা যাবার প্রথম ট্রেনটা কখন ছাড়ে।

সে রাত্রে ট্রেনটা যদিও সাড়ে দশটা নাগাদ শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছাবার কথা ছিল। পৌঁছল শেষ পর্যন্ত পৌনে বারোটায়। রাস্তায় কি একটা মাল-গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট হওয়ায় ট্রেনটা দেড় ঘণ্টার মত লেট হয়ে গেল।

পৌনে বারোটা মানে বেশ রাত্রি। ট্রাম বাস তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, একটা ট্যাক্সিও পাওয়া গেল না। পথও খুব বেশী নয়, হাঁটতে হাঁটতে মেসে এসে পৌছল রঞ্জিৎ।

মেসের প্রায় সকলেই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল পাশের ঘরের বারীন দত্ত তখনও ঘুমোয় নি। তার ঘরে আলো জ্বলছিল তখনও। বারীন দত্ত রেল-অফিসের একজন সাধারণ ক্লার্ক। মাইনে শ দেড়েক মত পায়। বিয়ে থা এখনও করে নি। আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রঞ্জিতের পাশের ঘরটাতেই ডাবল সীটের একটা সীট নিয়ে ঐ মেসে বছর দুই প্রায় আছে।

বারীন দত্তর অন্য একটা পরিচয় আছে। সে একজন উদীয়মান আধুনিক কবি। ছোট বড় নানা মাসিক ও সাপ্তাহিকে নিয়মিত তার কবিতা প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া মধ্যে মধ্যে সিনেমাতেও গান লেখে। বারীন রাত জেগে মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখত। সে রাত্রেও বারীন তখন একটি কবিতা শেষ করে শেষ বারের মত সবে একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করেছে। এমন সময় রঞ্জিতের পদশব্দ পেয়ে ও তার ঘরের দরজার তালা খোলার শব্দে ঘর থেকে বারান্দায় বের হয়ে এল, চৌধুরী সাহেবের ফিরতে এত বিলম্ব যে?

তালা খুলতে খুলতে রঞ্জিৎ পাল্টা প্রশ্ন করে, কবি বুঝি নতুন কোন কবিতা লিখছিলে?

বারীনকে বরাবর রঞ্জিৎ কবি বলেই সম্বোধন করে আর বারীন তাকে চৌধুরী সাহেব বলে ডাকে।

হ্যাঁ, এদিকে যে আপনার তিনি এসেছিলেন।

তিনি অর্থাৎ যে চিত্রা রঞ্জিৎ সেটা বুঝতে পারে। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আলোটা জ্বালাতে জ্বালাতে রঞ্জিৎ বলে, তাই নাকি?

হ্যাঁ—

কখন!

এই আধঘণ্টাটাক হবে। ট্যাক্সি করে এসেছিলেন, আপনার খোঁজ নিয়ে আবার চলে গেলেন।

রঞ্জিৎ কোন জবাব দেয় না। গা থেকে অফিসের ধরা-চূড়াগুলো খুলতে থাকে।

মনে হল যে ভীষণ চটে গিয়েছেন।

গলার টাইটা খুলতে খুলতে শুধায়, কে?

চিত্রা দেবী।

কেন?

কি জানি!

তা চটে থাকেন কি আর করা যাবে। বলে একটা হাই তোলে রঞ্জিৎ।

বারীনের মনে হয় রঞ্জিৎ চৌধুরীর কণ্ঠস্বরটা যেন কেমন নিরুৎসুক। সে যেন একটু বিস্মিতই হয়। কারণ চিত্রা ও রঞ্জিতের ব্যাপারটা সে জানত।

কিন্তু আপনি কোথায় গিয়েছিলেন চৌধুরী সাহেব?

পিসীমার ওখানে।

কোথায়? এই কলকাতায় কোথাও নাকি!

হ্যাঁ, মানে ঐ কলকাতায়ই আর কি? বলতে বলতে র‍্যাক থেকে টাউয়েলটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল রঞ্জিৎ।

বারীন বুঝতে পারে এত রাত্রে রঞ্জিতের বোধ হয় আলাপ করবার আর ঠিক তেমন ইচ্ছা নেই।

সেও অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সে রাত্রে রঞ্জিতের চমৎকার নিটোল একটি নিদ্রা হয়েছিল।

॥ ১৭ ॥

বিকেলের দিকে সেদিন অফিস থেকে ফিরে জামা কাপড় ছেড়ে এক কাপ চা নিয়ে সবে মিতালী বসেছে, হোস্টেলের ভৃত্য ভোলা এসে ঘরে ঢুকল, দিদিমণি?

কি রে?

এক জন স্যুট-পরা সুন্দর মত বাবু ওয়েটিং রুমে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

স্যুট-পরা বাবু! নাম জিজ্ঞাসা করিস নি?

আজ্ঞে না তো।

নামটা জিজ্ঞাসা করে আসবি তো!

জিজ্ঞাসা করে আসব?

হ্যাঁ, যা—

কিছুক্ষণ পরে একটা কার্ড নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল ভোলা।

কি রে, কি নাম বললে?

আজ্ঞে এই কার্ড দিলেন।

কার্ড! কই দেখি চা পান ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছিল। নিঃশেষিত চায়ের কাপটা এক পাশে নামিয়ে রেখে ভোলার হাত থেকে কার্ডটা নিল মিতালী।

প্রবীর হাজরা।

কার্ডটার উপরে নাম ছাপা রয়েছে।

মুহূর্তকাল কি যেন ভাবল মিতালী, তার পর ভোলার দিকে তাকিয়ে বললে, বল গে যা আসছি।

ভোলা ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

প্রবীর, প্রবীর তা হলে কলকাতায় এসেছে। কিন্তু মাত্র কয়েক দিন আগে লখ্‌নউ থেকে প্রবীরের যে চিঠিটা সে পেয়েছিল এবং যে চিঠিটা কোন মতে পড়েই দলামোচা করে ঘরের কোণ ফেলে দিয়েছিল, কই তার মধ্যেও তো তার কলকাতায় আসবার কথা কিছু ছিল না। সে চিঠির জবাব অবিশ্যি দেয় নি মিতালী এবং এর মধ্যে প্রবীরের আর কোন চিঠিও পায় নি।

কিন্তু কি জানি কেন, এত দিন পরে প্রবীর এসেছে, নীচে ওয়েটিং রুমে তার জন্যে অপেক্ষা করছে অথচ আশ্চর্য, ভিতর থেকে কোন তাগিদই সে পাচ্ছে না, প্রবীরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবার কোন রকম উৎসাহই যেন মনে বোধ করছে না। মিতালী ঘরের দক্ষিণের খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হাতের মধ্যে কার্ডটা তখনও ধরাই ছিল। প্রবীর লখ্‌নউ থেকে এসেছে। খবর পাঠিয়ে তাকে নীচে ওয়েটিং রুমে তার জন্য অপেক্ষা করছে। হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা প্রবীরের কার্ডটা ঘামে ভিজতে থাকে।

তবে কি সত্যি সত্যিই প্রবীর এত দিনে লখনউ থেকে কলকাতায় বদলী হয়ে এল। কিন্তু কই, অফিসেও তো কিছু শোনে নি মিতালী! কলকাতার অফিসেই যদি প্রবীর ফিরে এসে থাকে আবার তো বড় পোস্ট নিয়েই এসেছে। সেই রকমই চিঠিতে জানিয়েছিল প্রবীর তাকে। কোন্ পোস্টে এল প্রবীর বদলী হয়ে। কত মাইনে হল।

হঠাৎ রুম-মেট কৃষ্ণার কণ্ঠস্বরে ঘুরে তাকাল মিতালী।

একি মিতালী, তোমাকে কেউ খবর দেয় নি?

কিসের খবর?

কেন, ওয়েটিং রুমে নীচে এক জন ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন, কৃষ্ণা বললে।

হ্যাঁ—যাই—

কিন্তু কে ভাই! who is he! কৌতূহলে ভ্রূ দুটো তুলে স্মিত হাস্যে পরবর্তী প্রশ্নটা করে মিতালীর মুখের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণা।

ঐ এক জন জানা-শোনা—

ভদ্রলোককে তো আগে কখনও আসতে দেখি নি এখানে, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। মৃদু হেসে কৃষ্ণা বলে।

লখ্‌নউ থেকে আসছে।

তা যেন হল কিন্তু কে?

মিতালী আর কোন জবাব দেয় না।

কৃষ্ণার কৌতূহলের নিবৃত্তি হয় না। সে আবার বলে, ইনিই কি তিনি—সেই মোটা নীল খামের পত্রপ্রেরক।

মিতালী কোন জবাব দেয় না। ঘর থেকে যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায়ই বের হয়ে যায়। পিছন থেকে যেতে যেতে মৃদু একা হাসির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণার কণ্ঠস্বরে একটি গানের লাইন ভেসে আসে:

দিনের বেলা বাঁশী তোমার
বাজিয়েছিলে অনেক সুরে।

হল-ঘরের মধ্যে অধীর অপেক্ষায় পায়চারি করছিল প্রবীর। মিতালীর পদশব্দে প্রবীর ফিরে তাকাল পায়চারি থামিয়ে।

কি ব্যাপার? এতক্ষণে সময় হল! সেই প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে কার্ড পাঠিয়েছি—প্রবীরের গলায় বেশ একটা অভিমান ও ক্ষোভের সুর যেন ধ্বনিত হয়।

মৃদু হেসে মিতালী বলে, এক ঘণ্টা?

নিশ্চয়ই, তার বেশী ছাড়া কম হবে না।

প্রবীর মিতালীর সামনে এসে দাঁড়ায়।

বসো। মিতালী বলে।

না বসব না।

তবে?

চল—

কোথায়?

যেখানে হোক, বাইরে বেরিয়ে ঠিক করা যাবে। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

মিতালী ততক্ষণে একটা চেয়ারে বসে টেবিলের উপর রাখা একটা সিনেমা উইকলির পাতা ওল্টাচ্ছে।

ওকি! বসলে কেন? আমি ভেবেছিলাম তুমি তৈরী হয়েই আসবে। যাও, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে এসো।

তাগিদ দেয় প্রবীর মিতালীকে।

এত তাড়া কিসের। বসো না—

না, না—চল—যাও জামা-কাপড় বদলে এসো, প্রবীর আবার তাড়া দেয়। ওঠ—

একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই যেন মিতালী প্রবীরের ঐ কথার পর উঠে দাঁড়ায় এবারে। এবং বলে, রাত নটার মধ্যে কিন্তু হোস্টেলে আমাকে ফিরতে হবে—

হবে, হবে—এখন চল তো। তৈরী হয়ে এসো। কুইক—

বসো তা হলে। আসছি আমি।

মিতালী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

প্রবীরের পদোন্নতি হয়েছে নিশ্চয়ই। তার আজকের বেশভূষাতেই সেটা বুঝতে পেরেছে মিতালী। পরিধানে দামী ট্রপিকাল স্যুটই তার পরিচয়। তবে কি সত্যি সত্যিই লখ্‌নউ থেকে উঁচু পোস্টে অ্যাপয়েনটেড্‌ হয়ে কলকাতায় এল প্রবীর। মনে মনে হাসে মিতালী, তাই বোধ হয় এত তাড়া।

মিতালী কিন্তু কোন প্রসাধনও করল না, বিশেষ ভাবে বেশভূষাও করল না। সাধারণ একটা কটকী শাড়ি পরে, পায়ে স্যাণ্ডেলটা ঢুকিয়ে নীচে নেমে এল যেন কোন মতে।

প্রবীর একটু যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই তাকায় মিতালীর বেশভূষার দিকে। একটা ব্যাপার মিতালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকেই লক্ষ্য করেছে প্রবীর, বেশভূষা সম্পর্কে মিতালীর একটা পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ আছে বরাবরই। যত সামান্যই বেশভূষা হোক না কেন, তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছে প্রবীর সর্বদা। দামী বেশভূষা কোনদিনই দেখে নি প্রবীর মিতালীর গায়ে কিন্তু সাধারণ মিলের বা তাঁতের যে শাড়িটি পরেছে মিতালী, সেই পরার মধ্যেই তার নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গিটি প্রকাশ পেয়েছে। কেশ-রচনার মধ্যেও তার দেখেছে যেন একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আজ যে মিতালী তার সঙ্গে বেরুবার জন্য নেমে

এসে তার সামনে দাঁড়াল প্রস্তুত হয়ে, তার মধ্যে মিতালীর সেই নিজস্ব বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্যটাই যেন খুঁজে পেল না প্রবীর।

মিতালী প্রবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, চল।

মানে? এই বেশেই বেরুবে নাকি?

প্রশ্নটা যেন আপনা থেকেই তার গলা দিয়ে বের হয়ে আসে।

হ্যাঁ, চল—

প্রবীর মুহূর্তকাল যেন কি ভাবল। তার পর বললে, চল—

চল। রাত নটার মধ্যে কিন্তু হোস্টেলে আমার ফিরে আসতে হবে।

কথাটা বলে যেন আর এক বার স্মরণ করিয়ে দিল মিতালী প্রবীরকে।

প্রবীর কোন জবাব দেয় না।

গেট দিয়ে বের হয়ে দু' জনে পাশাপাশি হেঁটে চলে বড় রাস্তার দিকে। বড় রাস্তায় পড়ে একটা খালি ট্যাক্সি ধরে মিতালীকে নিয়ে উঠে বসল প্রবীর।

ট্যাক্সি নিয়ে সোজা প্রবীর বালিগঞ্জের একটা বড় কাপড়ের দোকানের সামনে গিয়ে নামল, একটু বসো মিতা, আমি আসছি।

মিতালী কোন জবাব দেয় না। বসে থাকে ট্যাক্সিতে।

প্রায় মিনিট পঁচিশ বাদে গোটা দুই প্যাকেট নিয়ে ফিরে এল আবার ট্যাক্সিতে প্রবীর। এবং এবারে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ডালহাউসির দিকে চালাতে বলল বিশেষ একটা বড় অভিজাত হোটেলের নাম করে। দীর্ঘ পথটা পাশাপাশি বসে থাকে দু' জনে, বিশেষ কোন কথাবার্তাই হয় না। হোটেলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে মিতালীকে আমন্ত্রণ জানায় প্রবীর, এসো মিতা—

এ হোটেলে?

হ্যাঁ, এই হোটেলেই তো আমি উঠেছি।

মিতালীর এতক্ষণে যেন নিজের সাধারণ বেশভূষাটার দিকে নজর পড়ে। একটু বুঝি দ্বিধাও হয় ঐ বেশে ঐ হোটেলে নামতে।

কিন্তু কেমন করেই বা মিতালী বুঝবে যে ঐ হোটেলে এনে তুলবে তাকে প্রবীর।

কই এসো, নামো—

ট্যাক্সি-ড্রাইভারটার প্রতি হঠাৎ ঐ সময় নজর পড়ে মিতালীর। লোকটা বাঙ্গালী। অল্পই বয়স। চেয়েছিল মিতালীর মুখের দিকে। কেমন যেন মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধ করে মিতালী। কোনরূপ আর দ্বিরুক্তি না

করে তাড়াতড়ি ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল।

প্রবীর ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মিতালীর দিকে চেয়ে বললে, চল।

মিতালী অনুসরণ করে প্রবীরকে।

লিফটে করে দোতলায় উঠে একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল প্রবীর, দোতলার করিডোরের একেবারে শেষ প্রান্তে। পকেট থেকে চাবি বের করে দরজাটা খুলে প্রবীর বললে, এসো।

দামী আসবাবে সজ্জিত ঘরটা। এ ঘরের যে প্রচুর ভাড়া মিতালীর বুঝতে কষ্ট হয় না। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে প্যাকেটগুলো মিতালীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললে প্রবীর, Now first thing, এর থেকে জামা-কাপড় নিয়ে, ঐ বাথরুমে গিয়ে তোমার গায়ের ওগুলো বদলে এসো তো। Quick। আমি ততক্ষণ চায়ের অর্ডার দিই।

বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে দেয়ালের গায়ে কলিং বেলটা টিপল প্রবীর। একটু পরেই বেয়ারা এসে ঘরের দরজায় নক্ করল, সাব্—

দরজাটা সামান্য খুলে চায়ের অর্ডার দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রবীর দেখে মিতালী তখনও ঘরের মধ্যে ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। প্যাকেটটা শয্যার উপরে ইতিমধ্যে নামিয়ে রেখেছে।

কি হল, কাপড় বদলালে না? প্রবীর মিতালীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

কেন? হঠাৎ কাপড় বদলাতে যাব কেন? এতক্ষণে কথা বলে মিতালী।

তা হলে ঐ শাড়ি পড়েই থাকবে নাকি!

ক্ষতি হচ্ছে কি তাতে কিছু!

ক্ষতি নয়, কিন্তু এই হোটেলে—

মানাচ্ছে না বুঝি? কিন্তু শাড়ির কথা থাক। এখানে নিয়ে এলে কেন আমাকে?

কেন নিয়ে এলাম মানে? এখানেই যে আমি উঠেছি। তোমাকে অনেক-গুলো সুখবর দেবার আছে।

কি, পদোন্নতি হয়েছে তোমার এই সুখবরটাই তো!

শুধু পদোন্নতিই নয়। এখানকার অফিসের একেবারে ডেপুটি জেনারেল অফিসার হয়ে এসেছি—অর্থাৎ তোমাদের ছোট সাহেব।

সুসংবাদ।

কাজেই আগের মত তো আর যেখানে-সেখানে উঠতে পারি না। অফিস থেকেই কোয়ার্টার দেবে। যত দিন না কোয়ার্টার পাই, এই হোটেলেই থাকব ঠিক করেছি।

তাই বুঝি তোমার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে যাতে করে খাপ খেতে পারি, পথের মাঝে হঠাৎ ট্যাক্সি থামিয়ে কাপড়ের দোকানে নেমে আমার জন্য দামী শাড়ি কিনে নিয়ে এলে ? কিন্তু তুমি না হয় ডেপুটি জেনারেল অফিসার হয়েছ, পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাইনেও তোমার বেড়েছে। স্ট্যাটাস্‌ও বেড়েছে, মেস থেকে বড় হোটেলে এসে উঠেছ কিন্তু আমি তো সেই যথা পূর্বং তথা পরং। অর্থাৎ যে কেরানী ছিলাম এখনও সেই কেরানীই আছি। অত দামী শাড়ি কি আমায় মানাবে!

কি ব্যাপার বল তো মিতালী ?

কিসের কি ব্যাপার!

বুঝতে পেরেছি!

কি বুঝতে পেরেছ ?

তোমার চিঠির সব জবাব দিতে পারি নি বলে অভিমান হয়েছে। কিন্তু আমার চিঠিরও তো তুমি জবাব দাও নি। বলতে বলতে সহসা এগিয়ে এসে প্রবীর মিতালীকে দু' হাতে জড়িয়ে বুকের উপরে টেনে নেবার চেষ্টা করতেই মৃদু একটা মোচড় দিয়ে মিতালী প্রবীরের বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে যায়।

প্রবীরের বিস্ময় আরও বেড়ে যায়।

প্রবীর বোধ হয় মুহূর্তের জন্য থমকেও যায়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মিতালীকে ধরবার জন্য প্রবীর হাত বাড়াতেই মিতালী সরে গিয়ে বলে, বলতে গেলে বেশ কিছু দিন পরেই আমাদের দেখা হল প্রবীর। সেক্ষেত্রে আমাদের পূর্বের সেই সম্পর্কটা আজ উভয়তঃই অটুট আছে কিনা জেনে নেওয়াই সর্বাগ্রে আমাদের উচিত নয় কি ?

মিতালী—

হ্যাঁ প্রবীর! এক দিন তুমি যখন অল্প মাইনের চাকরি করতে, তখন তুমি আমাকে অনেক সময় অনেক কথাই বলতে, জানি না সে কথাগুলো আজ তোমার মনে আছে কিনা, তবে আমার কিন্তু সব মনে আছে।

কি বল তো!

তোমার কণ্ঠস্বর শুনে আজ মনে হচ্ছে হয় সেই কথাগুলো আজ তুমি ভুলে গিয়েছ কিংবা তার প্রয়োজন আজ তোমার কাছে ফুরিয়েছে।

আশ্চর্য কি। জীবনের ধর্মই তো তাই। এক দিন যা থাকে অতি প্রয়োজনীয় তাই এক দিন হয়তো অতি তুচ্ছ হয়ে যায়। অবস্থা বিভেদে প্রয়োজনের রূপটা তো বদলাবেই।

তাই দেখতে পাচ্ছি—

কি ?

তোমার সাম্যবাদের প্রকৃত চেহারাটা হচ্ছে উলঙ্গ স্ববিধাবাদ। আর তাইতেই বোধ হয় তোমার নীতির বা পলিসির রূপটাও ক্ষণে ক্ষণে পাল্টায়।

ইতিমধ্যে হোটেলের বেয়ারা সুদৃশ্য ট্রেতে চা ও কেক্ প্যাস্‌টি ইত্যাদি সাজিয়ে ঘরে রেখে গিয়েছিল।

মৃদু হেসে প্রবীর বলে, তর্ক করার অনেক সময় পাবে। এসো, চাটা সদ্‌ব্যবহার করা যাক। নচেৎ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বুঝেছ তার্কিক।

কথাগুলো মৃদু হেসে বলে মিতালীর কোনরূপ সম্মতির অপেক্ষাও না রেখে প্রবীর নিজেই দু'জনের জন্য কাপে চা ঢালে এবং দুধ চিনি মিশিয়ে নিজের কাপটা তুলে নিতে নিতে বলে, দুধ চিনি মিশিয়ে নাও মিতা।

মিতালী চা পানের কোন আগ্রহই দেখায় না।

কি হল, চা খাবে না! তুলে নাও—

না। বিকেলে এক বারের বেশী চা খাই না আর আমি আজকাল।

বল কি! সকৌতুকে যেন প্রবীর বলে, আগে আগে কত সময় অফিসের ফিরতি পথে রেস্টুরেণ্টে বসে চার-পাঁচ কাপ পর্যন্তও চা খেয়েছ।

তা খেয়েছি।

তবে ?

তোমার ভাষাতেই জবাব দিতে পারি। অবস্থা-বিভেদে সেদিনকার সেই প্রয়োজনের রূপটা আজ বদলাচ্ছে ধরতে পার। কিন্তু এবারে আমাকে উঠতে হবে প্রবীর।

তার মানে!

তোমার মত ট্যাক্সিতে চাপার মত অর্থ তো আমার নেই—

মিতা!

হ্যাঁ, যেতে হবে বাস বা ট্রামে। এখন না বেরুলে নয়টায় 'মীল্ টাইম'—

পৌঁছতে পারব না হোস্টেলে।

ননসেন্স্। আজ তুমি রাত্রে আমার এখানেই ডিনার খাবে। তার পর রাত্রে আমি পৌঁছে দেব তোমাকে।

না। এখুনি আমাকে উঠতে হবে।

বলতে বলতে সত্যি সত্যিই যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় মিতালী।

মাথা খারাপ, এখুনি যেতে দিচ্ছে কে তোমাকে, বলতে বলতে প্রবীরও উঠে দাঁড়ায়, এত দিন বাদে বলে দেখা হল।

দু পা এগিয়ে আসে মিতালীর কাছে প্রবীর বোধ হয় আবার তাকে ধরবার জন্যই।

না মিঃ হাজরা। আপনাদের আজকের ঐ অবাধ জীবন আমার ঠিক পছন্দ নয়।

মিতা!

আজকের দিনের অর্থবৈষম্যের দরুন বিয়ে করার সুযোগ আমার জীবনে হচ্ছে না বলে জীবনের সংযমটাকেও যদি অন্ধ কুসংস্কার আর অপ্রয়োজনীয় বলে বাদ দিই, তা হলে সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুন্দরের প্রতি স্বভাবগত যে রুচি সেটাও তো বিনষ্ট হয়ে গেল। আর তা হলে নিজের বলতে রইল কি! না মিঃ হাজরা, দারিদ্র্য সহ্য করতে তবু পারব, কিন্তু দৈন্য সহ্য করতে পারব না। ক্ষমা করুন আমাকে।

এতক্ষণে যেন বর্তমান পরিস্থিতিটা সত্যিকারের উপলব্ধি করতে পারে প্রবীর কিছুটা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপমানে মনটা তার কঠিন হয়ে ওঠে। এবং কঠিন কণ্ঠেই অতঃপর বলে, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি মিতালী দেবী যে ইতিমধ্যে আমাদের অদর্শনের ব্যবধানে তুমি সমাজচেতনায় আর ধর্মবুদ্ধিতে এতটা সচেতন হয়ে উঠেছ। আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা আর সততা-জ্ঞানটা তোমার এতখানি তীব্র হয়ে উঠেছে।

সম্মান সততা আর শ্রদ্ধা ছাড়া তো পৃথিবীতে কোন সত্যিকারের বস্তুই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না মিঃ হাজরা। ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে যে। শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় মিতালী।

তাই বুঝি।

নিশ্চয়ই। তা ছাড়া নীতিটা যেখানে সামান্য একটা প্রয়োজন মাত্র, সংযমটা চারিত্রিক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়, সেখানে যে ভালবাসাটা শুধু মিথ্যাই নয় হাস্যকর।

সে তো বুঝতেই পারছি। চিবিয়ে চিবিয়ে যেন ব্যঙ্গভরা কণ্ঠেই কথাগুলো বলে প্রবীর মিতালীর মুখের দিকে তাকিয়ে। এবং কথাগুলো বলতে বলতেই পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট ওষ্ঠে চেপে সেটায় অগ্নিসংযোগ করতে করতে কণ্ঠস্বরটা টেনেই পুনরায় বলে, কিন্তু যে মিতালী দেবী দু' বছর আগেও এই বাহু দুটোর মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কত ভালবাসার কথা বলেছে তার মুখে আজ ঐ কথাগুলো নিছক অভিনয় ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না যে!

অসহ্য ক্রোধে দু-খণ্ড অঙ্গারের মতই যেন চোখের তারা দুটো ধক ধক করে জ্বলে ওঠে মিতালীর। মুহূর্তকাল সেই আগুন-ঝরা দৃষ্টিতে প্রবীরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কোন কথাই যেন মুখ দিয়ে বের হয় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় নিজেকে সামলে নিয়ে মিতালী বলে, নীচতারও একটা সীমা আছে বলেই আমি জানতাম মিঃ হাজরা, কিন্তু—

কিন্তু থামলে কেন মিতালী দেবী, বল কি বলতে চাইছিলে?

মিতালী কঠিন হেসে বললে, না। বললে সেটা অপব্যয়ই হবে। কারণ সেটা আজ আপনার বোধগম্যের বাইরে। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না মিতালী। ঘরের দরজাটা খুলে বের হয়ে গেল।

রাস্তায় বের হয়ে সোজা দক্ষিণাভিমুখী একটা প্রায় খালি ট্রামে উঠে বসল মিতালী। একটা নিরতিশয় ক্লেদাক্ত ঘৃণায় সমস্ত শরীরটা তখন যেন মিতালীর ঘিন ঘিন করছিল। এই প্রবীর হাজরার আসল রূপ! আশ্চর্য! প্রবীরের এই রূপটা আগে কখনও তার চোখে পড়েনি। বড় বড় গালভরা বুলির অন্তরালে অমন একটা কুৎসিত সুবিধাবাদী ছোট মন আত্মগোপন করে ছিল সেটা যে সে বুঝতে পারে নি ভাবতে তারই লজ্জার যেন অবধি থাকে না।

মেয়েদের নাকি পুরুষদের চিনতে দেরি হয় না। আর তাইতেই হয়তো আজ প্রবীরের হোটেলের ঘরে প্রবেশ করবার পরই তার দু'চোখের দৃষ্টিতে যে লোভ আর লালসা ঝক্ ঝক্ করে উঠেছিল, মিতালীকে সঙ্গে সঙ্গেই সেটা সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু ঐ লোকটাকেই সে এত দিন ভালবেসেছিল, ঐ লোকটাকে নিয়েই সে মনে মনে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল এক সময়। কথাটা ভাবতেও আজ যেন লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যায় মিতালী।

নিজের মনের সেদিনকার সেই পরিবর্তনটার দিকে তাকিয়ে মিতালীর বিস্ময়

বোধ হয়েছিল এইজন্যই যে, ইতিমধ্যে হোস্টেলে আসবার পর থেকেই তার মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন শুরু হয়েছিল তার অজ্ঞাতেই।

সত্যিই জীবনের এক নতুন দিক মিতালীর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ঐ হোস্টেলে এসে বাসা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে, সেটা তখনও নিজেই ভাল করে বুঝে উঠতে পারে নি মিতালী, উপলব্ধি করে উঠতে পারে নি।

পরিবর্তনটা তার মনে অবিশ্যি এনেছিল ঐ হোস্টেলেরই আর দু-দশ জন মেয়ে। ঘরের মধ্যে থেকে অফিসে চাকরি করতে এসেও এ দিকটা এত কাল মিতালীর চোখে পড়ে নি। কিন্তু চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আজ সে যেন বোবা হয়ে গিয়েছে, লজ্জা পেয়েছে। কিন্তু তার চাইতেও বেশী যেন দুঃখ পেয়েছে, বেদনা পেয়েছে। হোস্টেলে তো কম মেয়ে নেই, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলেও বাকী সবাই তো আজকের সমাজ-জীবনের একটা অংশ। তাদের যে সব বন্ধু-বান্ধব তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং তাদের যে সব গল্প শোনে প্রত্যহ তারাও একটি অংশ। আজকের তাদের যে জীবনধারা, তার সবটার জন্যই কি দায়ী আজকের সামাজিক অর্থগত বৈষম্য! সামাজিক ব্যবস্থা-বৈষম্য!

অকস্মাৎ হোটেলের ঘরে একটু আগে তাকে লক্ষ্য করে প্রবীর হাজরার একটা কথা ঐ সঙ্গে যেন মনে পড়ে যায়। কিন্তু যে মিতালী দেবী, দু' বছর আগেও যে আমার এই বাহু দুটোর মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে কত ভালবাসার কথা বলেছে; তার মুখে আজ ঐ কথাগুলো নিছক অভিনয় ছাড়া যে আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

মিথ্যা তো বলে নি প্রবীর হাজরা।

ঘনিষ্ঠতার মধ্যে দিয়ে সেদিন দু' জনে তো অনেকখানিই এগিয়ে গিয়েছিল সত্যি। আজ যাদের জন্য বেদনা আর লজ্জা তাকে সত্যি পীড়ন করছে, সেও তো দু দিন আগে তাদেরই এক জন ছিল। সে ক্ষেত্রে প্রবীর হাজরা যদি আজ তাকে হোটেলের ঘরে নিয়ে গিয়ে আর একটু এগিয়ে যাবারই সুযোগ খুজে থাকে, তাতে করে তাকে তো খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। এত দিন সে-ই তো প্রশ্রয় দিয়েছে প্রবীর হাজরাকে। এবং সেদিনকার তারই দেওয়া সেই প্রশ্রয়ের সুযোগটা নিয়ে প্রবীর হাজরা আজও যদি আরও একটু এগিয়ে পড়ার চেষ্টা করেই থাকে তো সেজন্য প্রবীরের চাইতে সে-ই কি বেশী দায়ী নয়? আজকের মন নিয়ে সেদিনকার মিতালীকে বিচার করতে গিয়ে নিজের উপরে একটা

অবিমিশ্র ঘৃণা আর ধিক্কার তার আকণ্ঠ বিষিয়ে তুলতে থাকে। নিরতিশয় একটা ক্লেদাক্ত অনুভূতিতে সমস্ত দেহ ও মনটা তার ঘিন ঘিন করতে থাকে। হোস্টেলে ফিরে গিয়েই তাকে স্নান করতে হবে। স্নান করে শুচি হতে হবে।

তার পর, তার পর অন্য কথা। তার সমস্ত গায়ে যেন পচা দুর্গন্ধ নর্দমার পাঁক ছিটকে এসে লেগেছে। স্নান করে শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত যেন মিতালী কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না।

হোস্টেলে এসে পৌঁছেই সোজা তোয়ালে ও সাবানটা নিয়ে মিতালী বাথরুমে চলে গেল। অনেকক্ষণ ধরে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে স্নান করল।

॥ ১৮ ॥

স্নান করে মিতালী যেন নিজেকে অনেকটা সুস্থ বোধ করে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে মিতালী যখন বাথরুমে ছিল, হোস্টেলে রাত্রের আহারের ঘণ্টা বেজেছিল। কাজেই দোতলায় ঘরে যারা ছিল, সকলেই নীচের ডাইনিং হলে তখন। প্রায় ঘরেরই আলো নেভানো।

ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলোটা জ্বাললে মিতালী। রুম-মেট কৃষ্ণা হোস্টেলে খায় না। কারণ অত তাড়াতাড়ি সে কখনও ফেরে না। ফিরতে ফিরতে তার প্রত্যহই রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারটা হয়ে যায়। বেশির ভাগ রাত্রেই তাই কৃষ্ণা রাত্রের আহার পর্বটা বাইরেই সেরে আসে।

এল্. আই. সি'র এক জন বড় চাকুরে, বয়স বছর পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ, প্রত্যহই ছটা সাড়ে ছটা নাগাদ তাঁর নতুন ঝকঝকে ক্রীম কালারের ফিয়াট গাড়িটা নিয়ে এসে গেটের সামনে হর্ন দেন। বাহাদুর বা ভোলা এসে সংবাদটা কৃষ্ণাকে দেয়, কৃষ্ণা সাজগোজ করে বের হয়ে পড়ে। ভদ্রলোকই আবার রাত্রে কৃষ্ণাকে হোস্টেলের গেটে পৌঁছে দিয়ে যান। মধ্যে মধ্যে অবিশ্যি আরও রাত হয়ে যায় কৃষ্ণার ফিরতে ফিরতে। বারটা সওয়া বারটা।

ভদ্রলোকের নাম ও পরিচয়টা একদিন কৃষ্ণাই দিয়েছিল মিতালীকে। কৃষ্ণেন্দু সমাদ্দার। সম্পর্কে নাকি কৃষ্ণার মাসতুতো ভাই হয়। কৃষ্ণেন্দুর ঐটুকু পরিচয়ই দিয়েছিল কৃষ্ণা। তার বেশী কিছু বলে নি।

তবে মিতালী দেখত, প্রায়ই কৃষ্ণা রাত্রে হোস্টেলে ফিরবার সময় এটা-ওটা

হাতে করে নিয়ে আসে। শাড়ি, ব্লাউজ থেকে শুরু করে প্রসাধনের টুকিটাকি, এমন কি চকলেট, বিস্কুট-মাখনও। কৃষ্ণার একটা স্বভাব ছিল যতক্ষণ হোস্টেলে থাকত গুন গুন করে যেমন সে সর্বক্ষণ গান গাইত, তেমনি সেই সঙ্গে তার মুখও চলত। হয় লজেন্স বিস্কুট টফি, না হয় চকলেট কিংবা বিস্কুট। একান্ত কিছু না হলে মুখে একটা চিউইংগাম অন্তত থাকত।

মিতালীকেও মাঝে মাঝে অফার করত। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই মিতালী মৃদু হেসে বলত, না—

থাও না একটা টফি।

একান্ত পীড়াপীড়ি করলে হয়তো একটা মুখে দিত মিতালী।

কৃষ্ণা বলত, তোমার অ্যাপিটাইটটা বড্ড খারাপ মিতালী।

তাই বুঝি!

হুঁ। তাইতো অত রোগা পটকা তুমি। খাও খাও—eat drink and be merry!

প্রত্যুত্তরে হেসেছে মিতালী।

সত্যি তোমার ক্ষিধে পায় না কেন বল তো মিতালী, আমার তো প্রতি সেকেণ্ডে ক্ষিদে পায়। তাই দেখ না, এক পয়সাও ব্যাঙ্কে জমে না আমার। আমার কি মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে জান?

কি?

যদি এক সঙ্গে বেশ কিছু টাকা পেতাম—

তা কি করতে? খালি খেতে বুঝি?

আলবত। বিরাট একটা খাবারের স্টোর করে ফেলতাম। শো কেসে সব খাবার সাজানো থাকত—ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরতাম আর যা মন চায় তুলে তুলে নিয়ে খেতাম।

কৃষ্ণার ঐ হাসিখুশী খোলাখুলি ভাবের জন্যই মিতালীর ওকে ভারী ভাল লাগে।

সে রাত্রে যেন আহারে এতটুকু স্পৃহাও ছিল না মিতালীর। ভিজে টাওয়েলটা র‍্যাকে ঝুলিয়ে রেখে দরজাটা বন্ধ করে মিতালী টেবিলটার সামনে এসে বসল চেয়ারটা টেনে। এবং বসার সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ে মুখবন্ধ নীল খামটা। নিশ্চয়ই প্রবীরের চিঠি। খামটা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল

মিতালী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হয়, প্রবীরের এ চিঠিটা অন্তত সে পড়বে এবং পড়ে একটা জবাব দেবে।

আজ আরও অনেক কথা বলবার ইচ্ছা ছিল মিতালীর প্রবীরকে, কিন্তু বলা হয় নি শেষ পর্যন্ত। অসহ্য আক্রোশে তখন তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করল মিতালী। কিন্তু প্রথমেই সম্বোধন ও চিঠিটা ইংরাজীতে লেখা দেখে বুঝতে পারে চিঠিটা যা সে ভেবেছিল তা নয়। করণ সিংয়ের। করণ সিং চিঠিটা লিখেছে।

মিতালী দেবী,

অফিসের বড় সাহেব আমাকে আজ দুপুরে ডেকে বললেন আমাকে নাকি অফিসের লখ্‌নউ ব্রাঞ্চে বদলী করা হয়েছে। অতএব আর দিন কতকের মধ্যেই কলকাতার এই অফিস থেকে চলে যাচ্ছি আমি। আপনি জানেন না হয়তো লখ্‌নউ আমার জন্মভূমি। সে যাই হোক এ চিঠির কারণ তা নয়।

আশ্চর্য চিঠিটা মিতালী পড়েই যেতে লাগল।

আশ্চর্য চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দলামোচা করে জানালাপথে বাইরে ফেলে দিল না।

এই চিঠিটা লিখতে বসে কেবলই একটা কথা কি মনে হচ্ছে জানেন? আজ পর্যন্ত আপনাকে যে সব চিঠি আমি লিখেছি, তার একটারও জবাব দেন নি। হয়তো ছিঁড়ে বা পুড়িয়ে বাইরের নোংরার স্তূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। এত দূর পর্যন্ত পড়বার আগেই হয়তো আমার এই চিঠিটারও সেই গতিই হবে। তাই কিছু দিন চিঠি লেখা আপনাকে বন্ধও করেছিলাম, কিন্তু তবু যে কেন আজ আবার চিঠি লিখছি হয়তো আমি নিজেই ভাল করে জানি না।

তবু যদি চিঠিটা পড়েন, শেষ পর্যন্ত যে কথাটা আমার আজ কলকাতা ছেড়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে বিশেষ করে বলবার ছিল, সেটা অন্তত আমার দিক থেকে বলা হয়। কথাটা আপনার দিক থেকে অবিশ্যি বিশেষ কিছুই নয়, তবু না জানিয়ে আমি পারছি না। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার প্রতি যে ব্যবহার করেছি, অর্থাৎ আপনার চিঠির জবাব না পাওয়া সত্বেও চিঠির পর চিঠি দিয়ে আপনাকে ক্ষুণ্ণ করেছি, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

আজ আর কিছুই অস্বীকার করব না, গোপনও করব না। এই অফিসে আসার পর প্রথম দিন অফিসে আপনাকে দেখা অবধিই কেমন যেন একটা আকর্ষণ আমি আমার মনের মধ্যে অনুভব করেছি। বিশ্বাস করুন আমার সেই

আকর্ষণের মধ্যে কোন নোংরামি বা অন্য কিছু অবশ্যই ছিল না। শুধু আপনাকে ভাল করে জানবার, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার একটা তৃষ্ণাই ছিল। জাত, ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজ আমাদের দু'জনেরই আলাদা, তবু কেন যেন আপনাকে জানবার, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার লোভটা সংবরণ করতে পারি নি। এবং আজ এখান থেকে চলে যাবার সময় সেই কথাটিই কোন রকম দ্বিধা না করে আপনাকে জানিয়ে গেলাম (অবশ্য যদি এই পর্যন্ত চিঠিটা আমার পড়েন) যে, ভুলতে আপনাকে কোন দিনই পারব না এবং কথাটা বলার দরুন আপনি আমাকে ক্ষমা করুন বা নাই করুন, আপনি হয়তো আমার চেহারাটা পর্যন্ত এক দিন ভুলে যাবেন কিন্তু আমি আপনাকে ভুলব না। এইখানেই চিঠি ইতি করি। আর চিঠি বাড়াব না। নমস্কার রইল। ইতি—করণ সিং

আশ্চর্য। চিঠিটা শেষ পর্যন্ত পড়ে শেষ করল মিতালী। কেমন করে যেন শেষ করে ফেলল। এবং তার চাইতেও আশ্চর্য আজ চিঠিটা দলামোচা করে পাকিয়ে বা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে না পড়েই আগের বারের মত জানালার বাইরে নিক্ষেপ করল না। কিন্তু সেই সঙ্গে মিতালীর নিজের মনের দিকে তাকিয়ে নিজেরই যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না। চিঠিটার মধ্যে কোন অভিযোগ নেই, কোন নালিশ নেই অপ্রাপণীয়ার প্রতি। কি একটা অক্ষম ব্যথার সুর প্রতি অক্ষরে অক্ষরে রণিয়ে উঠেছে। আর সেই ব্যথার সুরটা সামান্য হলেও মিতালীর মনকে যেন কোথায় স্পর্শ করেছে।

করণ সিং তার অফিসেরই এক জন কর্মচারী। কোন দিন তার দিকে সে ভাল করে তাকিয়েছে বলেও যেন মনে পড়ে না। এমনও হয়েছে কত দিন একই লিফ্‌টে দু'জনে একই সময় কত দিন উঠেছে, নেমেছে। বড় সাহেবের কামরার ঠিক দরজার এক ধারেই করণ সিংয়ের বসবার টেবিল। কত বার কত দিন মিতালীকে তাই ওর সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে হয়েছে কিন্তু কখনও কোন দিনের জন্য এতটুকু অশোভনতা করণ সিংয়ের ব্যবহারে সে দেখতে পায় নি। কখনও কোন কারণে কথাটুকু বলবার আজ পর্যন্ত সে চেষ্টা করে নি। আলাপ জমানোর চেষ্টা তো দূরে থাকে।

মধ্যে মধ্যে যদি বা কখনও অন্যমনস্ক ভাবেই বড় সাহেবের ঘরে যাতায়াতের পথে করণ সিংয়ের দিকে নজর পড়েছে, মিতালী দেখেছে ঘাড় গুঁজে নিবিষ্ট মনে সে কাজ করে চলেছে। অফিসে কখনও দু'জনার চোখাচোখি পর্যন্ত হয়েছে বলে মনে পড়ছে না মিতালীর। তবু সে মনে মনে ঐ মানুষটাকে ঘৃণা করে

এসেছে। ওর ছায়া পর্যন্ত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। আজ মনে হয় মিতালীর সব কিছুই হয়তো তার ঐ চিঠিগুলোর জন্যই।

প্রথম চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই লোকটার উপরে মনটা তার বিষিয়ে উঠেছিল বলেই হয়তো। অথচ সত্যি সত্যিই হয়তো তার কোন কারণ ছিল না। সত্যিই হয়তো মানুষটা নিষ্পাপ সাদা মনে তার সঙ্গে পরিচয় করবার লোভেই তাকে চিঠি দিয়েছিল মাত্র। আর বার বার তার চিঠির জবাব না পাওয়া সত্ত্বেও সেই কথাটার বোঝাবার চেষ্টা করেছে চিঠি লিখে লিখে হয়তো।

নিজের অজ্ঞাতেই যেন ভাবতে চেষ্টা করে করণ সিংয়ের চেহারাটা। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই মনে পড়ে না, মনে করতে পারে না ঐ মুহূর্তে মিতালী।

সত্যিই আশ্চর্য বুঝি মানুষের মন। প্রবীর হাজরাকে বিচার করতে গিয়ে ক্ষণপূর্বে যে পুরুষ জাতটার প্রতিই মিতালীর সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠেছিল, ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, সেই মনটাই মিতালীর ঐ মুহূর্তে একটু পরেই আবার সেই পুরুষ জাতেরই আর এক জনের উপরে কিসের একটা লজ্জায়, বোধ করি অনুতাপেও ব্রীড়াবনত হয়ে পড়ে। কুণ্ঠায় নিজের কাছেই যেন নিজের লজ্জার শেষ থাকে না। যে লোকটার সঙ্গে আজ পর্যন্ত তার পরিচয় হওয়া তো দূরের কথা, একটা কথা পর্যন্ত হয় নি, সেই লোকটারই চেহারাটা আঁতি-পাঁতি করে তার মনের মধ্যে অনুসন্ধান করে ফিরতে থাকে।

মিতালী সেদিন বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা।

কেন যেন অকস্মাৎ অহেতুক ভাবেই মনটা তার করণ সিংয়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। প্রবীরের কাছ থেকে যে অকস্মাৎ আঘাতটা কিছুক্ষণ পূর্বে সে পেয়েছিল এ যে সেই আঘাতেরই সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা এবং সেটা যে মানুষ মাত্রেরই প্রকৃতিগত সেটাই বুঝতে পারে নি। এবং মনের সেই প্রসন্নতার মুহূর্তে কখন যে সে টেবিলের উপর থেকে চিঠির প্যাডটা ও ঝর্না কলমটা টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করেছে নিজেও জানে না। বুঝতেও পারে না কেনই বা লিখতে শুরু করেছে।

করণ সিং,

তোমার প্রত্যেকটা চিঠিই পেয়েছি কিন্তু আমি প্রত্যেকটাই শেষ পর্যন্ত না পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি, কারণ—বিশ্বাস কর, যে পুরুষ জাতটার তুমিও এক জন, সেই গোটা পুরুষ জাতটার উপরেই আজ আমার সমস্ত শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছি। বিশ্বাসের অযোগ্য তোমরা। প্রয়োজনেই শুধু তোমরা স্বার্থপর নও, স্বার্থপরতা তোমাদের রক্তে, তোমাদের মজ্জায়।

হঠাৎই যেন খেয়াল হল মিতালীর। চমকে উঠল। এ কি, পাগলের মত আবোল-তাবোল সে কাকে কি লিখে চলেছে। তাড়াতাড়ি প্যাড থেকে পাতাটা টেনে ছিঁড়ে দলামোচা করে পাকিয়ে উঠে গিয়ে জানালা-পথে বাইরের অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এবং সোজা তার পর গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শয্যায় শুয়ে পড়ল। আজ সহজে ঘুম আসবে না জানে মিতালী, কিন্তু তবু সে অন্ধকারে শয্যায় শুয়ে চোখ বুজে সেই ঘুমেরই চেষ্টা করতে লাগল।

॥ ১৯ ॥

বৈঠকখানায় রঞ্জিতের মেসের ঘরে চিত্রা আর রঞ্জিৎ মুখোমুখি বসেছিল। প্রায় দশ দিন ধরে চেষ্টা করে তবে আজ রঞ্জিতের মেসে তাকে ধরতে পেরেছে চিত্রা। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিনকার ব্যাপারের জন্য এতটুকু দোষারোপ করে না রঞ্জিৎকে চিত্রা। কোন মান-অভিমান দেখায় না।

কেবল এক বার বলে, আচ্ছা মানুষ যাহোক তুমি রঞ্জিৎ।

কেন! কি হল?

কি হল বলছ! সেরাত্রে আমার সঙ্গে মৃণালিনী সয়খেলের ওখানে যাবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে একেবারে ভুলেই গেল।

ঠিক তা নয় চিত্রা।

তবে কি?

অফিসের কাজ করতে করতে রাত দশটা হয়ে গেল।

রাত দশটা হয়ে গেল, কিন্তু তার পর?

তার পর করণ সিং ধরে নিয়ে গেল হোটেলে তার ঘরে। শুনেছ বোধ হয় লখনউতে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে ও?

তাই নাকি! কই শুনি নি তো?

হ্যাঁ—অফিসিয়াল অর্ডার যদিও তখন এসে পৌঁছায় নি কিন্তু সে লখনউ অফিসের এক বন্ধুর চিঠিতে জানতে পেরেছিল ব্যাপারটা, তাই একটা ফেয়ার-ওয়েল ড্রিংক দিল আমাদের ক'জন বন্ধুকে। অবিশ্যি কথাটা দু দিন আগেই সে আমাকে বলে রেখেছিল কিন্তু তোমাকে জানাতে আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।

তা আমাকে একটা ফোনও তো করে দিলে পারতে মৃণালিনীর ওখানে।

তা অবিশ্যি পাওয়া যেত—তবে কি জান ঠিক মনে পড়ে নি আর।

বেশ করেছ! আর আমি ওদিকে তোমার অপেক্ষায় বসে—তুমি যাবার পথে খাবার সঙ্গে করে নিয়ে যাবে—খাওয়া পর্যন্ত সে রাত্রে আমার হয় নি।

I am so sorry!

চিত্রা হাসল প্রত্যুত্তরে।

আর অমন ভুল করো না কিন্তু—

না, আর ভুল হবে না।

কিন্তু আর দেরি করার প্রয়োজন কি বল তো? পরমুহূর্তেই প্রশ্নটা করে বসে চিত্রা।

দেরি কিসের?

বাঃ তুমি যেন কি! বুঝতে পারছ না কি বলতে চাইছি আমি?

কি?

Idiot কোথাকার? বলছিলাম আমাদের বিয়ের কথাটা।

ওঃ তাই বল। তা—তা সেজন্য ব্যস্ততার কি আছে!

ব্যস্ততার কি আছে মানে! না, না—আর দেরি করতে পারছি না আমি, এটা ভাদ্র চলেছে—সামনের আশ্বিনেরই যে কোন দিনে—

আশ্বিনে? কি বলছ পাগলের মত, পূজোর সময় আমি বলে এবারে ঠিক করে রেখেছি—

কি?

পূজোয়—মুসৌরী বেড়াতে যাব।

মুসৌরী! how lovely—চমৎকার হবে—আমরা সেখানেই হানিমুন করব!

হানিমুন!

হ্যাঁ—বিয়ের পর—মানে বিয়েটা সেরেই বের হয়ে পড়া যাবে—

তুমি বড় দ্রুত ভাবছ চিত্রা।

দ্রুত ভাবছি মানে?

প্রশ্নটা করে চিত্রা রঞ্জিতের মুখের দিকে তাকাল।

তা ছাড়া আর কি বলি। কোথায় কি তার ঠিক নেই—

হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়েছে চিত্রা—এমনি ভাবে রঞ্জিতের মুখের দিকে তাকাল।

দাঁড়াও, বিয়ে তো অমনি করব বললেই করা যায় না।

তবে ?

তুমিই বল, আজকের দিনে আমরা বিয়ে করব বললেই কি করতে পারি নাকি !

পারি না ?

কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে চিত্রা রঞ্জিতের মুখের দিকে বোকার মতই প্রশ্নটা করে।

নিশ্চয়ই না। তাছাড়া আমাদের বিয়ের পর এই মেসেই তো এসে আর আমরা কিছু উঠতে পারি না। যেমন ধর ভদ্র জীবন যাপনের ভদ্র পরিবেশে গোটা দুই ঘরের অন্তত একটা ফ্ল্যাট বল ফ্ল্যাট বা বাড়ি বল বাড়ি চাই, তার পর সংসার করবার জন্য খুঁটিনাটি নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র চাই—

আমার ব্যাংকে চার হাজার টাকা আছে তো। তা ছাড়া অনেক টাকার গহনা আছে—

কেমন যেন নির্জীব কণ্ঠে চিত্রা বলে।

হেসে ওঠে রঞ্জিৎ, টাকা হলেই কি সব হয় চিত্রা !

কথাটা বলতে বলতে এতক্ষণে বোধ হয় চিত্রার মুখের দিকে ভাল করে নজর পড়ে রঞ্জিতের।

কেমন যেন অসহায় করুণভাবে চেয়ে আছে চিত্রা ওর মুখের দিকে। ঐ করুণ অসহায় মুখখানার দিকে তাকিয়ে সত্যিই কেমন যেন একটা মমতা জাগে সহসা রঞ্জিতের মনে ঐ মুহূর্তে।

রঞ্জিৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটা যেন অন্য দিকে টেনে নিয়ে যায়। বলে, একেবারে চারিদিক গুছিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি বিয়ে করতে চাই চিত্রা। নিত্য ঘরে ঘরে যা ঘটছে তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না আমি। তা ছাড়া তাড়াহুড়োরই বা কি আছে। বিয়ের ব্যাপারটা যখন আমাদের স্থির হয়ে আছেই, বিয়ে ধর আমাদের এক রকম হয়েই গিয়েছে। কেবল এক দিন রেজেষ্ট্রী অফিসে গিয়ে আইনের ব্যাপারটুকু চুকিয়ে আসা। সে তো যে কোন এক দিন যে কোন মুহূর্তেই আমরা গিয়ে শেষ করে আসতে পারি।

চিত্রার মনে হয় তাদের পরস্পরের যা বক্তব্য ছিল হঠাৎ যেন তা শেষ হয়ে গেল। কথা যেন সব ফুরিয়ে গিয়েছে।

আমি আজ তা হলে উঠি।

উঠবে।

হ্যাঁ, মাথাটা কেমন যেন ধরেছে।

তা হলে চল।

রঞ্জিৎই আগে উঠে দাঁড়াল।

চিত্রাও উঠে দাঁড়াল।

চল, তোমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসি।

না, না—তুমি আবার কষ্ট করবে কেন!

বাঃ, এতে কষ্টের কি আছে। চল—

চিত্রার সঙ্গে সঙ্গেই বের হয়ে যায় ঘর থেকে রঞ্জিৎ।

কেমন যেন আচ্ছন্নের মত চিত্রা ফিরে এল সে রাত্রে হোস্টেলে। রঞ্জিতের কথাগুলো যেন সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

চিত্রাকে ট্রামে তুলে দিয়ে মেসে ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢুকে রঞ্জিৎ শয্যাটার উপরে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। চিত্রা যে শেষপর্যন্ত আজ এত সহজেই তাকে নিষ্কৃতি দেবে সত্যিই ভাবতে পারে নি রঞ্জিৎ। সেই ব্যাপারের পর থেকে কয়েক-দিন ধরে চিত্রাকে এড়াবার জন্যই রঞ্জিৎ একটু তাড়াতাড়িই অফিস থেকে এক ফাঁকে বের হয়ে মেসে ফিরছিল বেশ একটু রাত করেই। কারণ সে জানত ঐ দিনকার ব্যাপারে চিত্রার কাছে যা হোক একটা কিছু জবাবদিহি তাকে দিতেই হবে। সহজে চিত্রা তাকে নিষ্কৃতি দেবে না।

কেবল যে সেদিনকার ব্যাপারে জবাবদিহির জন্যই রঞ্জিৎ গত কয়েক দিন চিত্রাকে এড়িয়ে চলছিল তাই নয়, বেশ কিছু দিন ধরেই চিত্রাকে সে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল যদিও চিত্রা সেটা সঠিক বুঝতে পেরেছিল কিনা রঞ্জিৎ জানে না।

রঞ্জিতের চিত্রাকে এড়াবার চেষ্টার অন্যতম কারণ—চিত্রাকে ঘিরে সমস্ত আকর্ষণই যেন স্তিমিত হয়ে এসেছিল। চিত্রা তার কাছে যেন বহু-পঠিত একখানা উপন্যাসের মতোই আকর্ষণ ও উত্তেজনা-শূন্য হয়ে পড়েছিল। পরিচয় আর বহু দিনের ঘনিষ্ঠতার ক্লান্তিতে সে ক্রমশ অবসন্ন হয়ে পড়ছিল।

অথচ চিত্রা যেন তাকে কিছুতেই মুক্তি দেবে না, দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। এবং তার পক্ষেও এই দীর্ঘ বৎসরের পর বৎসর মেলামেশার পর স্পষ্টাস্পষ্টি প্রত্যাখ্যান জানানো সম্ভবপর হচ্ছিল না। কোথায় যেন একটা লজ্জা পীড়া দিচ্ছিল। এবং তার নিজের এই বিব্রত ভাবটা সে যেন বেশী করে বোধ করছিল উমাকে দেখবার পর থেকে, তার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকেই।

ইতিমধ্যে আরও এক দিন উমাদের ওখানে অফিসের পর গিয়েছিল রঞ্জিৎ। এদিকে সে সংবাদ পেয়েছে বারীনের মুখেই, চিত্রা নাকি চার-পাঁচ দিন তার খোঁজে মেসে এসেছে এবং এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা অপেক্ষা করে চলে গেছে। অফিসে যতক্ষণ রঞ্জিৎ থাকত, এমন কর্মব্যস্ততার ভান করত যে চিত্রা কিছুতেই তার কাছে ঘেঁষবার সুযোগ পাচ্ছিল না।

তবু পাঁচ-সাতদিন ওর মধ্যে দেখা করে কথা বলেছে। রঞ্জিৎ কথা দিয়েছে তাকে মেসে সে থাকবে, সেইখানেই দেখা হবে। কিন্তু অফিসের পরই মেসে যায় নি রঞ্জিৎ। অনেক রাত করে মেসে ফিরেছে। যেমন করে হোক চিত্রাকে এড়াতে চেষ্টার ত্রুটি করে নি।

কিন্তু এসব করেই বা কত দিন আর চলবে। চিত্রা এখনও আশা করে আছে তাকেই সে বিয়ে করবে। কথাটা ভাবতে গিয়েও রঞ্জিতের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি ফুটে ওঠে।

আজ টিফিনের পরই রঞ্জিৎ তার অফিস থেকে বের হয়ে পড়েছিল ছুটি নিয়ে। কাল শনিবার সে পিসীমাকে কথা দিয়ে এসেছে গোবরডাঙায় যাবে।

কয়েক দিন থেকেই মনে মনে ভাবছিল পিসীমাকে একটা পুজো করার দামী গরদের শাড়ি কিনে দেবে। এবং ঠিক করে রেখেছিল কাল শনিবার গোবর-ডাঙায় যাবার সময় গরদের শাড়িটা নিয়ে যাবে। তা ছাড়া নিজেরও মাসের প্রথম কিছু টুকিটাকি নিত্য ব্যবহার্য স্টেশনারী জিনিসপত্র কেনবার ছিল। তাই দুটো নাগাদ টিফিনের পর বের হয়ে পড়েছিল অফিস থেকে।

শাড়িটা কিনে কলেজ স্ট্রীটের একটা বড় স্টেশনারী দোকানে ঢুকতে যাবে হঠাৎ ফুটপাথে একটা পুরনো বইয়ের দোকানের সামনে দেখা হয়ে গেল উমার সঙ্গে। উমা ওল্ড্ বুক শপটার সামনে দাঁড়িয়ে একটা পুরনো ইতিহাসের বই উল্টে-পাল্টে দেখছিল। পুরনো বইয়ের দোকানে ঘোরা আর পুরনো বই এটা-ওটা কেনা উমার একটা চিরদিনের নেশা।

উমাকে দোকানটার সামনে দেখে রঞ্জিৎ থমকে দাঁড়ায়। উমা গভীর মনো-যোগের সঙ্গে বইটা দেখছিল। সাধারণ একটা কালো পাড় তাঁতের শাড়ি পরিধানে। মাথার চুল কালো একটা রিবনের সাহায্যে কোন মতে খোঁপা বাঁধা। পায়ে স্যাণ্ডেল সু। বগলে খাতা ও বই। বুঝতে পারে রঞ্জিৎ কলেজ-ফেরতাই উমা ওখানে এসেছে। ডাকবে কি ডাকবে না কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে রঞ্জিৎ।

শেষ পর্যন্ত সামান্য একটু এগিয়ে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকে, উমা।

কে ?

চমকে ফিরে তাকায় উমা। এবং রঞ্জিৎকে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মৃদু কণ্ঠে বলে, ও, আপনি ?

এখানে কি ব্যাপার, বই কিনবে ?

হ্যাঁ, একটা ইতিহাসের বই দেখছিলাম।

বলতে বলতে বইটা ফিরিয়ে দেয় দোকানীকে উমা।

কি হল, বইটা নেবে না ?

না। এখন ওর যা দাম তার সবটা জমিয়ে উঠতে পারি নি।

কত দাম ওটার !

একুশ টাকা। সে যাক কিন্তু এ সময় আপনি এখানে। অফিস নেই ?

ছিল, কিন্তু তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে চলে এসেছি। আচ্ছা উমা, একটা কথা বলব ?

দু'জনে এতক্ষণে পাশাপাশি মানুষের ভিড় বাঁচিয়ে এগোতে শুরু করেছিল। হাঁটতে হাঁটতেই উমা শুধায়, কি ?

বইটা যদি আমি তোমাকে দিই নেবে ?

অমনি দেবেন।

হ্যাঁ—

কেন ?

কেন আর কি এমনই, ধর প্রেজেণ্ট করলাম।

উমা মৃদু হেসে জবাব দেয়, না—

নেবে না ?

না। কারও দান আমি নিই না।

কিন্তু এ তো দান নয়—উপহার, প্রেজেণ্ট।

কিন্তু এখন সব কথা—মানে ওটা কেনবার আমার আপাতঃ-অক্ষমতা জানাবার পর আপনার কাছ থেকে নিলে উপহার থাকবে না। দানই হবে। আচ্ছা, আমি চলি, আমার বাস এসে গেছে ঐ যে—

সত্যিই যাত্রীভর্তি শিয়ালদহ-অভিমুখী একটা বাস তখন প্রায় নিকটবর্তী বাস স্ট্যাণ্ডটার কাছাকাছি এসে গিয়েছে।

ও বাসটায় উঠবে কি করে ? কি ভিড় দেখছ না।

ও তো আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক গা সহা ব্যাপার। ওতে ভয় করলে শেষ পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই স্টেশনে যেতে হবে।

কিন্তু আমিও স্টেশনের দিকেই যাচ্ছিলাম, ট্যাক্সিতেই যাব, চল তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।

ধন্যবাদ।

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না উমা, বাস-স্টপের দিকে এগিয়ে গেল।

সেই বাসেই কোনমতে উঠে পড়ল উমা।

উমার বাসটা চলে যাবার পর রঞ্জিৎ সোজা সেই ওল্ড বুক শপে গিয়ে হাজির হয়েছিল এবং একুশ টাকা দিয়ে সে বইটা কিনে এনেছে। এবং মেসে ফিরে এসে বইটার প্রথম পাতায় ছোট করে একটা সাদা কাগজে 'উমা দেবীকে' লিখে প্যাকেট মুড়ে শাড়িটার সঙ্গে রেখে দিয়েছে। ইচ্ছা ছিল রঞ্জিতের ঐ সময় মেসে ফিরবে না। বেলেঘাটায় এক বন্ধুর অসুখ শুনেছে, তাকেই দেখতে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় নি। কোথাও আর ঐ দিন বেরুবারই ইচ্ছা ছিল না বলে মেসের ঘরেই ছিল। নচেৎ চিত্রা আজও তার দেখা পেত কিনা সন্দেহ।

॥ ২০ ॥

পরের দিন ছটা নাগাদ হঠাৎ মিতালী হোস্টেল থেকে বের হয়ে পড়ল এবং রাস্তায় পড়ে হাওড়া-অভিমুখী একটা এইট-বি বাসে উঠে পড়ল। কনডাক্টর এসে টিকিট চাইলে, একটা হাওড়া স্টেশনের টিকিট নিল। টিকিটটা নিয়ে চুপচাপ বসে রইল চলন্ত বাসের জানালা পথে বাহিরের প্রবহমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে।

সন্ধ্যার কলকাতা ইতিমধ্যেই রং-বেরংয়ের আলোর মালায় যেন অভিসারিকার রূপ নিয়েছে। ভাদ্রের শেষাশেষি। কিন্তু এখনও কি বিশ্রী গুমোট গরম। আশ্বিনের মাঝামাঝি বোধ হয় এবারে পুজো। দোকানে দোকানে তাই বোধ হয় ইতিমধ্যেই সাড়া পড়ে গিয়েছে। অফিসেই আজ শুনেছিল মিতালী, সাতটা পঞ্চান্নয় করণ সিংয়ের ট্রেন ছাড়বে। তার পর থেকেই যেন সেই সময়টা তার কানের মধ্যে গেঁথে ছিল। সাতটা পঞ্চান্নয় করণ সিংয়ের ট্রেন ছাড়বে।

হাওড়া স্টেশনে মিতালী চলেছে। কিন্তু কেন যে চলেছে তা সে নিজেই বোধ হয় জানে না। করণ সিং সাতটা পঞ্চান্নর ট্রেনে যাচ্ছে তাতে তার কি?

যার সঙ্গে আজ পর্যন্ত একটা মৌখিক কথার আদান-প্রদান পর্যন্ত হয় নি, তার চলে যাবার মুহূর্তে সে হাওড়া স্টেশনে চলেছেই বা কেন? তবু সে চলেছে।

স্টেশনে পৌঁছে একটা প্ল্যাটফরম টিকিট কেটে নির্দিষ্ট প্ল্যাটফরমের খোঁজ নিয়ে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করল। ট্রেন ছাড়তে তখন আধ-ঘণ্টা প্রায় দেরি! ট্রেনটা প্ল্যাটফরমেই তখনও 'ইন' করে নি।

কিন্তু দূর পাল্লার যাত্রীরা ইতিমধ্যেই লটবহর নিয়ে প্ল্যাটফরমে এসে ভিড় করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে যে সব যাত্রীরা তৃতীয় শ্রেণীর। বহু যাত্রীর কণ্ঠনিঃসৃত গুঞ্জন, কুলী ও ফিরিওয়ালা এবং ভেণ্ডারদের চেঁচামেচিতে প্ল্যাটফরমটি বেশ সরগরম। মধ্যে মধ্যে প্ল্যাটফরমের মাইকে ট্রেনের আসা যাওয়ার সময় এবং যাত্রীদের সম্পর্কে নানা সতর্কবাণী ঘোষিত হচ্ছে।

প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করে অন্যমনস্ক ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে শ্লথ ভঙ্গিতে অগ্রসর হয় মিতালী। হঠাৎ মনে হয় মিতালীর করণ সিংকে বলতে হবে, তোমার চিঠিগুলো প্রত্যেকটিই পেয়েছি আমি, এত দিন জবাব দিই নি সত্যি এবং জবাব না দিলেও আমি কিছু মনে করি নি। পরক্ষণেই মনে হয় মিতালীর, এ ধরনের কথাটা হঠাৎ আজ তার সঙ্গে দেখা করে বলতেই বা সে এল কেন? তবে কি সে ফিরে যাবে। সত্যিই তো এ একটা পাগলের মত কি কাজ সে করতে চলেছে! কোন অর্থ নেই, যুক্তি নেই। তা ছাড়া তাদের অফিসের আর কেউ যদি করণ সিংকে আজ সী অফ্ করতে আসে, তারাই বা কি ভাববে, কি মন্তব্য করবে।

হয়তো ব্যাপারটা সত্য মিথ্যা কোন যাচাই না করে কাল অফিসে গিয়ে নানা ধরনের মুখরোচক সব মন্তব্য তার সম্পর্কে ছড়িয়ে দেবে সারা অফিসময়। তার পর কি সে-ই আর অফিসে টিকতে পারবে, না কারও মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবে? ছি ছি, ঝোঁকের মাথায় এ একটা কি বিশ্রী ব্যাপার সে করতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল মিতালী এবং ঘুরে দাঁড়াতেই মাত্র এক হাত ব্যবধানে যে লোকটির সামনে সে একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল, সে করণ সিং।

কয়েকটা মুহূর্ত তারা পরস্পরের মুখের দিকে যেন বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার পর ধীরে ধীরে মিতালী তার চোখের দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। চলে যে যাবে সেখান থেকে সেটুকু শক্তিও যেন তার দু'পায়ে তখন আর অবশিষ্ট নেই। পা দুটো যেন পাথরের মতই ভারী, অচল।

মিস চক্রবর্তী—

করণ সিংয়ের মৃদু কণ্ঠস্বরে মুখ তুলে ওর মুখের দিকে তাকাল মিতালী। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে তখন তার, সারাটা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

কাউকে বুঝি ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলেন? করণ সিংই আবার শুধায়।

হ্যাঁ, মা—নে—

কোন্ ট্রেনে?

সাতটা পঞ্চান্নর ট্রেনে।

কথাটা যেন সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাতে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিতালীর গলা দিয়ে বের হয়ে এল।

সাতটা পঞ্চান্ন, মানে আমি যে ট্রেনে যাচ্ছি!

হ্যাঁ—তার পরই আবার বলে মিতালী, আপনি—আপনিও বুঝি এই ট্রেনেই যাচ্ছেন?

হ্যাঁ—

কুলীটা পিছন দিক থেকে তাড়া লাগায় ঐ সময়, চলিয়ে না সাব্, খাড়া হ্যায় কিঁউ? ফার্স্ট ক্লাস তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—চল। ফার্স্ট ক্লাসই—

করণ সিং এগিয়ে চলে, কুলীটা মাল নিয়ে পিছনে পিছনে অগ্রসর হয়।

চারিদিকে এক বার তাকিয়ে দেখল মিতালী, আশেপাশে তার পরিচিত কোন মুখই নেই।

মিতালী যেন নিজের অজ্ঞাতে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কুলীর পিছনে পা বাড়ায়। ব্যাপারটা করণ সিংও পিছন ফিরে দেখতে পেয়ে চলার গতি শ্লথ করে মিতালীর একেবারে পাশে পাশেই নিঃশব্দে চলতে থাকে। করণ সিং পাশাপাশি চলতে চলতে চলতেই খুব নিম্নকণ্ঠে এক সময় বলে, দেখা হয়ে গেল মিস চক্রবর্তী আপনার সঙ্গে, ভালই হল। সামনা-সামনি ক্ষমাটা চেয়ে নিচ্ছি।

ক্ষমা?

হ্যাঁ, আপনাকে চিঠি দিয়ে দিয়ে যে ভাবে উত্যক্ত করেছি। সত্যি ক্ষমা করবেন আমাকে।

চিঠি কিন্তু একমাত্র শেষটি ছাড়া আর একখানাও আমি পড়ি নি।

জানি। জবাবও যে পাব না তাও জানতাম।

তবে চিঠি লিখতেন কেন?

কেন লিখতাম।

হুঁ।

কি জানি বোধ হয় লিখতে ভাল লাগত বলেই লিখতাম। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি ?

ভেবেছিলাম কেউ কারও সঙ্গে মাত্র আলাপ করতে চাইলেই বোধ হয় কোন অন্যায় হয় না।

চিঠি না দিয়ে সামনা-সামনি এসে আলাপ্ করতেও তো পারতেন ?

ভয় করেছে।

কেন ?

আপনি যে রকম গম্ভীর।

কুলীটা ঐ সময় আবার তাগিদ জানায়, দেখিয়ে না সাব্, আপকো কোন্ কামরা। নাম পড়্কে দেখিয়ে না।

কুলীর তাগিদে তাড়াতাড়ি করণ সিং পর পর ফার্স্ট ক্লাস কামরাগুলোর দরজায় ঝোলানো কার্ডে নিজের নামটা খুঁজতে শুরু করে। গোটা দুই কামরার পরে তৃতীয় কামরার হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে ঝোলানো কার্ডটাতেই নিজের নামটা ও ব্যর্থ নম্বরটা খুঁজে পায় করণ সিং। মালপত্র গাড়ির কামরায় উঠিয়ে কুলীকে কোনমতে বিদায় করে করণ সিং।

দু'জনে তখন আবার কামরার দরজাটার সামনে প্ল্যাটফরমের উপরই দাঁড়িয়ে।

কিন্তু আপনি যে কাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলেন মিস চক্রবর্তী ? করণ সিং হঠাৎ বলে।

কই না তো!

কেন এই একটু আগে যে আপনি বললেন ?

না।

তবে ?

আপনার সঙ্গে দেখা করতেই আমি আজ স্টেশনে এসেছিলাম এ সময়।

করণ সিং যেন চমকে হঠাৎ মিতালীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়। ঢং ঢং করে ট্রেন ছাড়বার প্রথম ঘণ্টা পড়ল।

সত্যি, সত্যি বলছেন মিস চক্রবর্তী !

হ্যাঁ।

আমি, আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না কথাটা। সত্যিই কি আমি so lucky!

প্রত্যুত্তরে নিঃশব্দে মৃদু হাসল মিতালী।

মিস চক্রবর্তী—

বলুন?

আপনি তা হলে আমার উপরে রাগ করেন নি?

রাগ! কেন—

ঐ ভাবে চিঠি দিয়ে দিয়ে আপনাকে গত ক-মাস ধরে উত্যক্ত করেছি বলে?

করেছিলাম কিন্তু এখন আর—

কি থামলেন কেন বলুন?

আর সে রাগ নেই।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল ট্রেন ছাড়বার।

বিশ্বাস করুন মিস চক্রবর্তী, কেবলমাত্র আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই বলেই আপনাকে চিঠি দিয়েছি, অন্য কোন কারণে নয়।

বিশ্বাস করি।

করেন?

হুঁ। কিন্তু কই বললেন না তো কেন আলাপ করতে চেয়েছিলেন আমার সঙ্গে।

গাড়ি ছাড়ার তৃতীয় ও শেষ ঘণ্টা পড়ল। গার্ডের হুইসেল তীব্রভাবে বেজে উঠল যাত্রীদের সচকিত করে।

উঠুন গাড়িতে, গাড়ি ছাড়ল। মিতালী বলে।

গাড়ি সত্যিই চলতে শুরু করেছে তখন। কিন্তু করণ সিংয়ের গাড়িতে ওঠবার কোন উদ্যোগ নেই যেন।

কি করছেন, গাড়ি যে ছেড়ে দিয়েছে, উঠুন।

হ্যাণ্ডেলটা ধরে গাড়িতে উঠে পড়ল এবারে করণ সিং। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে মিতালী।

আপনাকে আমার বড্ড ভাল লাগত মিস চক্রবর্তী, তাই আপনার সঙ্গে আমি আলাপ করতে চেয়েছিলাম।

গাড়ির সঙ্গে চলতে চলতে মৃদু হাসল মিতালী।

মিস চক্রবর্তী—চিঠি লিখলে জবাব পাব?

জবাব দেব।

গাড়ীর বেগ আরও দ্রুত হয়েছে তখন। মিতালী অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। পকেট থেকে রঙিন রুমালটা বের করে শূন্যে দোলাতে দোলাতে করণ সিং যে শেষ কথাটা কি বললে মিতালীর কানে আর পৌঁছল না, প্ল্যাটফরমের ভিড়ের গোলমালে হারিয়ে গেল। তবে অনেকক্ষণ পর্যন্ত করণ সিংয়ের হাতের রুমালটা দেখা গেল চলন্ত গাড়ির জানালা-পথে।

॥ ২১ ॥

চিত্রা ফিরে এল হোস্টেলে সে রাত্রে কেমন যেন একটা শূন্যতা নিয়ে। কথা দিয়েও সে রাত্রে রঞ্জিৎ মৃণালিনী সরখেলের ঘরে রাত্রিবাস করতে না যাওয়ায় দুঃখে, ক্ষোভে, লজ্জায় ও অভিমানে চিত্রা কি করবে বুঝে উঠতে পারে নি। এবং হোস্টেলে সে রাত্রে ফিরে এসে বাকী রাতটুকু এক বারের জন্যও দু'চোখের পাতা এক করতে পারে নি। কিন্তু তার পর ক্রমশঃ কেন যেন মনের সেই জ্বালাটা একটু একটু করে প্রশমিত হয়ে এসেছিল। এবং ক্রমে সে মনে মনে রঞ্জিৎকে ক্ষমাও করতে সক্ষম হয়েছিল।

অফিসে পরের দিন যখন গিয়ে হাজির হল, রঞ্জিতের উপরে গত রাত্রের সেই ক্ষোভ ও অভিমানের কিছু মাত্রই আর অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু তা হলেও সেদিনটা রঞ্জিতের সঙ্গে সে কথা তো বলতে পারেই নি, এমন কি সামনাসামনি যেতে পারে নি সেদিনটা তো বটেই, পরের দুটো দিনও। তাকায় নি পর্যন্ত রঞ্জিতের দিকে একটি বার। কিন্তু চতুর্থ দিনে আর স্থির থাকতে পারে নি। টিফিনের কিছু আগে যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে রঞ্জিতের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটা ফাইলের মার্জিনের নোট মনোযোগ দিয়ে পড়ছিল রঞ্জিৎ।

মৃদু কণ্ঠে শুধায় চিত্রা, খুব ব্যস্ত নাকি?

রঞ্জিৎ মুখ তুলে তাকাল, কিছু বলছিলে?

খুব ব্যস্ত নাকি?

না। ফাইলটা সরিয়ে রেখে রঞ্জিৎ ওর মুখের দিকে তাকাল, কি বলছ?

আজ সন্ধ্যায় ফ্রী আছ?

তা আছি।

সন্ধ্যায় মেসে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

বেশ তো, এসো—

কিন্তু সন্ধ্যায় রঞ্জিতের মেসে গিয়ে দেখা পেল না রঞ্জিতের চিত্রা। ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করে ফিরে এল। পরের দিনও কথা দিয়ে রঞ্জিৎ মেসে ছিল না। তার পরের দিনও।

শেষে চতুর্থবার গিয়ে দেখা পেল রঞ্জিতের। অবিশ্যি চিত্রা মনে মনে স্থিরই করেছিল, মৃণালিনী সরখেলের বাড়িতে সে রাত্রে কথা দিয়েও রঞ্জিৎ যায় নি বলে সে সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করবে না তাকে সে। কোন কৈফিয়তই চাইবে না রঞ্জিতের কাছে। আজ দেখা হওয়ার পর চায়ও নি। কিন্তু তবু রঞ্জিতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আজ কেন যেন চিত্রার মনে হল সেই এতদিনকার চেনা সুরটা কোথায় কেটে গিয়েছে।

রঞ্জিতের সে রাত্রের ব্যবহারের জন্য চিত্রার মনে হল, রঞ্জিতের মনের মধ্যে যেন কোথাও কোন অনুতাপ নেই। আর সে কথাটা যতই চিন্তা করে চিত্রা, কেমন একটা শূন্যতা অনুভব করে সে এবং নিজের অজ্ঞাতেই তার দু'চোখের কোল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। অন্ধকার ঘরে একা শয্যায়, ফোঁটার পর ফোঁটা অশ্রু তার চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। কাঁদতে কাঁদতেই এক সময় বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ে চিত্রা এবং বহুকাল পরে সে-রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে মনোতোষকে, অনীতাকে।

পরের দিন ভোর বেলা যখন ঘুম ভাঙল চিত্রার, কেমন যেন একটা ভয় তার সমস্ত মনটাকে ভরিয়ে তুলেছে। যে চিত্রার কোনরকম ভয়ের সঙ্গে এককাল কোন পরিচয় মাত্রও ছিল না আজ সেই চিত্রারই কি একটা অজানিত ভয়ে বুকের ভিতরটা জমাট বেঁধে উঠছে যেন।

সত্যিই কি আজ তবে রঞ্জিৎ পিছিয়ে দাঁড়াবে। তার এতদিনকার কল্পনা, এতদিনকার আশা মিথ্যা হয়ে যাবে? তা হলে সে দাঁড়াবে কোথায়? কোন্ মাটিতে পা দিয়ে চিত্রা দাঁড়াবে? কার হাত ধরে সে চলবে?

সে যে সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে এসেছে, সমস্ত পৃথিবীকে অস্বীকার করে এসেছে? না, না—তা হলে চিত্রা বাঁচবে না। হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে চিত্রা হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। না, না—এ মিথ্যা, এ হতে পারে না? রঞ্জিৎ তার? রঞ্জিৎ তাকে প্রতারণা করতে পারে না। আজ এমনি করে তাকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারে না। মিথ্যাই সে দুশ্চিন্তা করছে।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, তাই যদি হবে তো কাল রাত্রে রঞ্জিৎ তার সঙ্গে অমন করে কাটা কাটা কথা বলল কেন! সহসা তার কথাগুলো অমন অস্পষ্ট দুর্বোধ্য মনে হল কেন তার।

রঞ্জিৎ, রঞ্জিৎ—তুমি আমাকে ত্যাগ করো না, তুমি আমাকে ত্যাগ করো না। আমার যে কেউ নেই, কেউ নেই—তুমি ছাড়া যে আজ আমার কেউ নেই সমস্ত সংসারে।

রঞ্জিতের নিজেরও মনের মধ্যে যেন-কেমন একটা ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। ভয়টা হচ্ছে কেমন করে সে চিত্রার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। অনেক দিন ধরে চিত্রা তাকে বেঁধেছে, শুধু সে-ই বাঁধে নি, নিজেও সেই বাঁধনে ধরা দিয়েছে। শক্ত বাঁধন। কে জানত এমনি এক শক্ত বাঁধনের মধ্যে সে নিজেকে এমনি করে বেঁধেছে। সেদিন দ্বিপ্রহরের দিকে গোবরডাঙা যেতে যেতে কথাগুলোই ভাবছিল রঞ্জিৎ।

কিন্তু বাঁধন যতই শক্ত হোক না কেন, মুক্তি তাকে পেতেই হবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব মুক্তি তাকে পেতে হবে। কলকাতার বাইরে অনেক দূরে একটা বড় ফার্মে চাকরির চেষ্টা করছে রঞ্জিৎ। যদি সে চাকরিটা পেয়ে যায়, কাউকে কিছু না জানিয়ে সে সেখানে চলে যাবে। কিন্তু তাতে করেই কি চিত্রার হাত থেকে সে মুক্তি পাবে! ঠিক খোঁজ করে চিত্রা গিয়ে সেখানে হাজির হবে। না, মুক্তির পথ সেদিক দিয়ে সুদূরপরাহত।

তবে কি চিত্রার কাছ থেকে সে মুক্তি পাবে না? সহসা একখানি শান্ত মুখ ঐ সময় রঞ্জিতের মনের পাতায় ভেসে ওঠে।

উমা।

হ্যাঁ, একমাত্র উমাই তাকে চিত্রার এই বাঁধন থেকে মুক্তি দিতে পারে। উমা, উমা যদি আজ তার পাশে এসে দাঁড়ায় সে নিঃসন্দেহে চিত্রার বাঁধন থেকে মুক্তি পেতে পারে। তবে কি পিসীমার কাছে আজ সে উমাকে বিবাহের প্রস্তাব জানাবে। সে জানে পিসীমা বা উমার বাবা মণিমোহন বাবুর কোন আপত্তি তো হবেই না বরং তারা আনন্দিতই হবে। উমার পাত্র হিসাবে সে লোভনীয়ই। কিন্তু উমা, উমার যদি সম্মতি না পায়!

সামান্য কয়েক দিনের পরিচয়ে রঞ্জিৎ অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছে চিত্রা আর উমা এক জাতের মেয়ে নয়। উমার জাত আলাদা। সে সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র

জাতের। কিন্তু ট্রেনটা আজ এত ঢিমে তালে ঢিক ঢিক করে চলেছে কেন। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রঞ্জিৎ, বেলা তিনটে বাজে। এখনও ছুটো স্টেশন মাঝখানে আছে।

উমার ইতিহাসের বইটা কিনে এনেছে রঞ্জিৎ। কিন্তু সেদিনকার মত উমা যদি আজও তার উপহার নিতে প্রত্যাখ্যান জানায়। সে জন্য অবিশ্যি রঞ্জিৎ অনেক ভেবে-চিন্তে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। একটা চিঠি লিখে বইটার মধ্যে রেখে দিয়েছে প্যাকেট করে। লিখেছে :

উমা,

পাছে তুমি ফিরিয়ে দাও তাই তোমার হাতে দিতে সাহস হল না। লুকিয়ে রেখে গেলাম বইটা তোমার টেবিলের উপরে যদি না নাও তো সত্যিই দুঃখ পাব। রঞ্জিৎ

হ্যাঁ, চুপি চুপি আসার সময় বইয়ের প্যাকেটটা উমার পড়ার টেবিলে রেখে চলে আসবে রঞ্জিৎ। কিন্তু পিসীমাকে আজই সে প্রস্তাবটা জানাবে। দেরি করতে আর মন চায় না।

গোবরডাঙায় মণিমোহনের বাড়িতে যখন পৌঁছল গিয়ে রঞ্জিৎ, উমা সেদিন তখনও কলেজ থেকে ফেরে নি। কিন্তু জগদ্ধাত্রী সেদিন বাসায়ই ছিলেন। রঞ্জিৎকে দেখে খুশীই হলেন জগদ্ধাত্রী। মণিমোহন ঐ সময় কোন দিনই বাসায় থাকেন না, দোকানেই ছিলেন। একপক্ষে রঞ্জিতের সুবিধাই হল। জগদ্ধাত্রীর কাছে সে প্রস্তাবটা উত্থাপন করতে পারবে।

জগদ্ধাত্রী রঞ্জিৎকে এনে উমার ঘরেই বসালেন। বাড়িতে অবিশ্যি ঐ ঘরটি ছাড়া বাইরের লোক এলে বসাবার মত অন্য কোন ঘরও ছিল না।

বোস, অফিস থেকে এলি, চা খাবি তো? চা তৈরী করে নিয়ে আসি।

বসো তুমি পিসীমা, ব্যস্ত হবে না তোমাকে চায়ের জন্য। হবে'খন চা। বাধা দেয় রঞ্জিৎ।

দাঁড়া, চায়ের জলটা চাপিয়ে দিয়ে আসি—

জগদ্ধাত্রী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। এবং একটু পরেই ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করতে রঞ্জিৎ গরদের থানটা পিসীমার পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে প্রণাম করতেই তিনি সবিস্ময়ে বললেন, একি রে!

সাড়ে পাঁচশো টাকা মাইনে হল এ মাস থেকে আমার পিসীমা। চাকরি করে তোমাকে তো কখনও কিছু দিই নি, সামান্য প্রণামী দিলাম।

বেঁচে থাক বাবা। দীর্ঘজীবী হ। অশ্রুতে চোখের কোল দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে আসে জগদ্ধাত্রীর। গলার স্বরটা রুদ্ধ হয়ে আসে।

রঞ্জিতের মাথায় ও পিঠে হাত বুলোতে বুলোত জগদ্ধাত্রী বললেন, এবারে সংসার-ধর্ম কর। স্থিতু হয়ে বোস।

সংসার-ধর্ম বুঝি না পিসীমা। তবে মেসে থাকতে সত্যিই আর ভাল লাগছে না।

তাই কখনও লাগতে পারে। জগদ্ধাত্রী সখেদে বললেন।

তাই ভাবছি, এবারে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নেবো যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে—

আমার—আমার আপত্তি থাকবে কেন? নিশ্চয়ই করবি—

কিন্তু একা একা বাড়ি-ঘর সব দেখবে কে? তুমি যদি আমার সঙ্গে গিয়ে থাক—

আমি!

হ্যাঁ পিসীমা, অমত করো না। আমি থাকতে কেন তুমি এখানে শ্বশুরের ঘরে পড়ে থাকবে। চল আমরা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকব।

হুট্ বললেই তো কিছু যাওয়া হয় না রে। জানিস তো আমার ছোট জা বাতব্যাধিতে একেবারে শয্যাশায়ী, আমি আছি সংসারটা চলছে। তা ছাড়া—

তা হলে আর কি বলব। বাড়ি আর তা হলে করা হবে না।

কেন হবে না? বিয়ে-থা কর। বরং বিয়ে-থা হলে তোর সংসারটা গিয়ে গুছিয়ে দিয়ে আসব দু দিন দশ দিন থেকে।

তা হলেই হয়েছে। বিয়ে হবে তার পর তুমি যাবে? জান তো আজকালকার দিনে বাড়ি ভাড়া পাওয়া কি কষ্ট। একটা যাহোক পেয়েছিলাম খুঁজতে খুজতে দু'বছর ধরে—তা সেটাও ছাড়তে হবে।

না, না—ছাড়বি কেন। নিয়ে নে বাড়িটা।

কিন্তু তার পর?

তা হ্যাঁরে—কেমন মেয়ে পছন্দ হয় বল তো?

এ বয়সে আবার পছন্দ-অপছন্দ। বয়স কত হল খেয়াল আছে?

কি যে বলিস, কি এমন বয়সটা হয়েছে তোর শুনি? এ তো আর আগের দিন কাল নেই। যুগ পাল্টেছে—

পছন্দ-অপছন্দের কথা ছেড়ে দাও পিসীমা, তা ছাড়া তুমিই যদি ধর কাউকে

পছন্দ কর, সে কি আর অপছন্দের কিছু হবে? তোমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে কেউ সহজে—

মৃদু হেসে জগদ্ধাত্রী বলে, সে দিন-কাল কি আর আছে রে। তা ছাড়া তোরা হলি আজকালকার ছেলে—

না, না—কিছু তোমাকে ভাবতে হবে না। বলেই পরক্ষণে একেবারে সমস্ত লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে বলে, আছে নাকি পিসীমা তোমার জানা-শোনা কোন মেয়ে? আমি কিন্তু বাপু, দেখতে পরী চাই না, কিন্তু লেখাপড়া জানা মেয়ে এবং শান্ত ব্যবহার চাই। দিবা-রাত্রি ঝগড়া-ঝাঁটি করবে সে, কিন্তু আমার পোষাবে না।

না রে না, ঝগড়া-ঝাঁটি করবে কেন? তুমি তাকে অবিশ্যি দেখেছিসও। একটু এবার যেন ইতস্তত করেই কথাটা বলেন জগদ্ধাত্রী।

আমি দেখেছি। কোথায়, কে?—

আছে। সে মেয়ে আমার একেবারে নিজের হাতে গড়া।

কি বলছ পিসীমা, কিছু যে বুঝতে পারছি না।

বলছিলাম আমাদের উমার কথা।

উমা!

হ্যাঁ, উমা, আলাপ তো হয়েছে তোর, কেমন, তোর পছন্দ হয়?

কিন্তু—

তবে জানিস তো ঠাকুরপোর অবস্থা। দিতে-থুতে কিছু পারবে না। রাজী থাকিস তো বল, সামনের অঘ্রানেই চার হাত এক করে দিই।

বেশ। আমার কোন আপত্তি নেই পিসীমা।

একেবারে শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে নিতে হবে কিন্তু—

গয়না আমি পাঠিয়ে দেব তোমার নাম করে, তুমি সাজিয়ে দিও—

জগদ্ধাত্রীর দু'চোখের কোল জলে ভরে আসে।

রুদ্ধ গলায় তিনি বলেন, তোর ভাল হবে রন্তু—তুই সুখী হবি! নিজের হাতে গড়া আত্মীয়ের মেয়ে বলে বলছি না রে। সত্যিই উমার মত মেয়ে হয় না।

রঞ্জিৎ কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে কখন যে উমা কলেজ ফেরতা ঘরের খোলা দরজাটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, রঞ্জিৎ টেরও পায় নি।

জেঠিমা।

কে ? উর্মি। আয়—আজ তোর ফিরতে এত দেরি হল যে ?

পুজোর ছুটির আগে ফাংশন হবে তার রিহার্সাল চলছে যে। কথাটা বলে উমা রঞ্জিতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আপনি কতক্ষণ ?

অনেকক্ষণ—হাসতে হাসতে জবাব দেয় রঞ্জিৎ।

তোরা বসে গল্প কর, আমি চাটা তৈরী করে আনি।

জগদ্ধাত্রী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। এত বড় একটা আনন্দের সংবাদ ছোট বৌকে এখুনি যে দিতে হবে। সোজা জগদ্ধাত্রী একেবারে উমার মার ঘরে ঢুকলেন।

উমার মা জপমালা শয্যায় চোখ বুজে পড়েছিলেন।

জগদ্ধাত্রী ঘরে ঢুকে ডাকলেন, ছোট বৌ।

জপমালা চোখ মেলে তাকালেন, কিছু বলছিলে বড়দি ?

মস্ত বড় সুখবর আছে ছোট বৌ। উর্মির বিয়ে ঠিক করে ফেললাম। রাজপুত্র একেবারে—

রাজপুত্র ! বিস্ময়ে তাকান জপমালা জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে, কি বলছ বড়দি। এই দারিদ্র্যের মধ্যে—

পাত্র হচ্ছে আমার ভাইপো রনু—

রঞ্জিৎ ! তুমি কি ক্ষেপে গেল বড়দি ! ঐ ঘরে হবে আমার উমার বিয়ে ?

হবে না মানে। সব ঠিক হয়ে গেল। রণু রাজী আছে। এই সামনের অগ্রাণেই একটা দিন স্থির করে—

কি যে বল তুমি বড়দি। আজকের অবস্থা তো তুমি আমাদের সবই জান। কি ভাবে দিন চলছে দেখছ তো। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোচ্ছে না।

ও সব কথা তোর ভাবতে হবে না।

ভাবতে হবে না মানে? কথায় বলে বিয়ে তা কিছু না হোক হাজার দুই তিনের কমে তো হবে না। এক গাছি গয়না মেয়ের গায়ে নেই—তার পর বরাভরণ—

কিছু লাগবে না। সে কথা রণুকে আমি আগেই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি। একেবারে শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে মেয়ের বিয়ে আমরা দেবো। সেও তাই বলেছে—

সত্যি বলছ বড়দি ?

হ্যাঁরে হ্যাঁ—নইলে আর বলছি কি !

সত্যি—সত্যি উমার আমার এমন ভাগ্য হবে বড়দি। দু'চোখ জলে ঝাপসা হয়ে যায় জপমালার।

সত্যিই এ যে তার কাছে অবিশ্বাস্যই নয়, স্বপ্নাতীত। এক দিন অবিশ্যি সবই ছিল তাদের। বিয়ে হয়ে যখন এসেছিলেন জপমালা শ্বশুর-ঘরে, চারিদিকে সংসারের লক্ষ্মীশ্রী তখন উপচে পড়ছে। চকমিলানো বাড়ি, গোয়াল-ভরা গরু, গোলা-ভরা ধান—ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে চারিদিক তখন যেন রম রম করছে। বাড়ি-ভর্তি আত্মীয়-স্বজন, কর্মচারী, লোক-লস্কর। প্রতিদিন একশো পাতাই পড়ত।

কিন্তু সহসা এক দিন যেন শনির আক্রোশ এসে পড়ল সংসারে। নাম করা উকিল ছিলেন শ্বশুর মশাই। দু' হাতে অর্থ ঘরে আনতেন। বড় ভাশুর অর্থাৎ জগদ্ধাত্রীর স্বামী কলকাতায় ওকালতি করছিলেন এবং সবে নাম ও যশ হচ্ছিল, দু'দিনের জ্বরে মারা গেলেন। শ্বশুর রমণীমোহন সে আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। তিন মাসের মধ্যেই চোখ বুজলেন। ছোট ছেলে জপমালার স্বামী বিশেষ তেমন লেখাপড়া করেন নি, চালের ব্যবসা করছিলেন। সমস্ত সংসারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ল। ভাগ্যে তখন সংসারে জগদ্ধাত্রী ছিলেন। তিনিই হাল ধরলেন সংসারের। কিন্তু তবুও সংসারের ভাঙন ঠেকানো গেল না। লক্ষ্মী তখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

তবু যা ছিল সেও কম নয়। প্রাচুর্য না থাকলেও অভাব ছিল না। ক্রমে বড় ছেলে ও মেয়ের বিয়ে হল। উমাও ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠছে, তার জন্যও পাত্রের সন্ধান করছেন মণিমোহন, এমন সময় দোতলার সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে বাত-ব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে গেলেন জপমালা। আর তারই বছর দুই পরে ঘটল দেশ-বিভাগ। দাঙ্গা শুরু হল।

সর্বস্ব খুইয়ে সামান্য মাত্র সম্বল নিয়ে দেশ গাঁয়ের ভিটে ছেড়ে সকলে এক দিন কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে এসে নামলেন। তার পর এই ক বছর ধরে কি পরিশ্রমই না করছেন মণিমোহন। মাথা গোঁজবার মত একটু ঠাঁইও হয়েছে এবং দোকানের কল্যাণে দু'মুঠো জুটছেও। উমার বিয়ের আশা তো তাঁরা ছেড়েই দিয়েছিলেন এক রকম। মাথা গোঁজবার ঠাঁইও হয়েছে এবং দু'বেলা দু' মুঠো অন্নও ভদ্রভাবে জুটছে, কিন্তু মেয়ের বিয়ে দেবার মত উদ্‌বৃত্ত অর্থ কোথায়?

তবু মণিমোহন উমার বিয়ের চেষ্টা করছিলেন, শেষ কাজ তাঁর ধার কর্জ করেই না হয় শেষ করবেন, কিন্তু উমা জানতে পেরে বেঁকে বসেছিল। বলেছিল, তার বিয়ের জন্য কাউকে ব্যস্ত হতে না। কারণ বিয়ে সে করবে না।

যাক মা মঙ্গলচণ্ডী যে শেষ পর্যন্ত তাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।

বার বার জপমালা মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম জানান।

॥ ২২ ॥

রঞ্জিৎ সে রাত্রে চলে গিয়েছে তখন। উমা তখনও কিছু জানে না। তার কানে কোন সংবাদই তখনও যায় নি। কিন্তু বিশেষ সেই সংবাদটি না জানলেও রঞ্জিৎ বিদায় নেবার ঘণ্টাখানেক পরেই নিজের পড়ার টেবিলে এসে বসে বইগুলো নাড়া-চাড়া করতে গিয়ে বইয়ের মধ্যে রঞ্জিতের রেখে যাওয়া সেই ইতিহাসের প্যাকেটটা পেয়েছিল সেদিন উমা।

প্যাকেটটা পেয়ে উমা প্রথমে ভেবেছিল হয়তো রঞ্জিতেরই সেটা হবে, ভুল করে যাবার সময় ফেলে গিয়েছে তার টেবিলের উপরে। কিন্তু প্যাকেটটা হাতে নিয়ে তার উপরে নিজের নাম লেখা দেখে সে ভুল তার ভেঙে যায়। এবং একটু কৌতূহলী হয়েই যেন প্যাকেটটা খুলে ফেলে।

প্যাকেটটা খুলে পরিচিত ইতিহাসের বইটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে গতদিনের সমস্ত কথা মনে পড়ে যায় এবং বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় তাকে সম্বোধন করে রঞ্জিতের লেখাটা উমাকে যেন মুহূর্তে রীতিমত কঠিন করে তোলে। বিরক্তিতে ভ্রু দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকে উমা।

আজ যদিও তারা দুজনে ঐ ঘরে কিছুক্ষণ ছিল, কিন্তু বিশেষ তেমন কোন কথা হয়নি দুজনের মধ্যে। কিন্তু রঞ্জিৎবাবুর তার মনের কথা জানা সত্ত্বেও বইটাকে ঐভাবে গোপনে উপহার দিয়ে যাওয়া শুধু অসৌজন্যই নয়, অনধিকার-চর্চাও। তাদের উভয়ের সামান্য পরিচয়ের মধ্যে এমন কোন অধিকার রঞ্জিৎবাবুর আজও বর্তায় নি যাতে করে এতখানি জুলুম তার উপরে তিনি করতে পারেন।

তাকে একটা জবাব দিতে হবে। বইটা তো ফেরত দিতেই হবে, সেই সঙ্গে জবাবটাও তার দিতে হবে। পার্সেল করে কালই সে বইটা রঞ্জিৎবাবুকে ফেরত পাঠাবে এবং চিঠিও দেবে। খাতার একটা পাতা ছিঁড়ে লিখতে বসে তখনই উমা।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার এই ভাবে গোপনে বইটা রেখে যাওয়ার ব্যাপারে আমি সত্যিই বিস্মিত না হয়ে পারছি না। কারণ আমাদের উভয়ের সামান্য পরিচয়ের মধ্যে এই রকম অযাচিত ভাবে—গ্রহীতার অনিচ্ছা জানা সত্ত্বেও তার ঘাড়ে উপহার

চাপিয়ে দেবার অধিকার আপনার নিশ্চয়ই জন্মায় নি। বইটা ফিরত পাঠাতে তাই আমি বাধ্য হলাম। নমস্কারান্তে—

উমি।

কে ? চমকে তাড়াতাড়ি চিঠির কাগজটা সামনের একটা বই টেনে চাপা দিতে দিতে মুখ তুলে তাকাল উমা।

জেঠিমণি!

চিঠি লিখছিলি বুঝি ?

না, না—চিঠি নয়, ও এমনি।

আমরা কিন্তু তোর বিয়ের ঠিক করে করে ফেললাম উমি।

বিয়ে!

কথাটা বলে অবাক বিস্ময়ে তাকায় উমা জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে।

হ্যাঁরে বিয়ে।

কিন্তু বিয়ে তো আমি করব না তোমাদের বলে দিয়েছি জেঠিমণি।

পাগলী মেয়ের কথা শোন। বিয়ে করবি না কি রে। মেয়েছেলের বিয়ে না হলে তো জীবনটাই মিথ্যে হয়ে গেল।

তার পরই একটু যেন থেমে জগদ্ধাত্রী বলেন, অভাবিত সৌভাগ্য রে। অমন ছেলে হয় না! সোনার টুকরো ছেলে একেবারে। তা ছাড়া তোকে তার পছন্দও হয়েছে খুব।

পছন্দ হয়েছে ?

হ্যাঁ—

আমাকে দেখল কখন সে ?

দেখল না মানে ? এত দিন দেখল—ওরে বোকা মেয়ে আমার ভাইপো রণু—রঞ্জিতের কথা বলছি। এ মাস থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকা মাইনে হল। সামনের অগ্রাণেই কিন্তু আমরা বিয়ের ঠিক করছি। তোর বাবা ফিরতেই এইমাত্র তার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেল।

জেঠিমণি—

কালই পুরুত ঠাকুরকে ডেকে পাঠাই, অগ্রাণের গোড়াতেই যে প্রথম ভাল দিনটা আছে, তোর বাবার ইচ্ছা সেই দিনই বিয়েটা হয়ে যায়। একটা দিনও সে দেরি করতে চায় না।

উপবিষ্টা উমার কানে কথাগুলো আদৌ প্রবেশ করেছিল কি না এবং তার

কোন প্রয়োজন আছে কিনা সেটা জগদ্ধাত্রী যেন ভাববারও প্রয়োজন বোধ করেন না। তার বক্তব্য তিনি খুশির আমেজে যেন একটানা বলে যেতে থাকেন।

নিজের ভাইপো বলে বলছি না রে, দেখবি তপস্যা করেও অমন স্বামী পাওয়া যায় না। যেমন চরিত্র তেমনি সুন্দর স্বভাবটি। তা হবেই বা না কেন। কি বংশের, কি বাপের ছেলে। অন্য কোন ছেলে হলে ঐ অত টাকা মাইনের চাকরি দেখতিস দেমাকে মাটিতে হয়তো পা পড়ত না। কিন্তু দেমাক বলে কিছু আছে ওর দেখছিস্? আজকালকার ছেলে কিন্তু কি ভব্যতা-জ্ঞান, কি ভক্তি-শ্রদ্ধা। তুই সুখী হবি উমা। তুই সুখী হবি।

বোধ হয় মনে মনে আশীর্বাদ করবার জন্যই সস্নেহে উপবিষ্টা উমার মাথায় হাতটা রাখলেন জগদ্ধাত্রী। উমা কিন্তু পাথরের মতই বসে থাকে। ঘটনার আকস্মিকতায় বেচারী সত্যিই যেন বোবা হয়ে গিয়েছে তখন। কিছু ভাববারও শক্তি যেন তখন তার নেই।

ও ঘর থেকে মণিমোহনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বড় বৌ, কোথায় গেলে। এক বার এদিকে এসো না।

যাই ঠাকুরপো।

জগদ্ধাত্রী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

উমা কিন্তু বসেই থাকে। আরও অনেকক্ষণ তেমনি বসে থাকে। তার পর এক সময় শিথিল অবশ হাতে কিছুক্ষণ আগে রঞ্জিৎকে কে লেখা চিঠিটা বইয়ের তলা বের করে। এক বার দু বার তিন বার চিঠিটা পড়ে তার পর ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এবং টুকরো টুকরো চিঠির কাগজগুলো হাতের মধ্যে দলা-মোচা করে পাকাতে পাকাতে হঠাৎ টেবিলের উপর মাথা রেখে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে যেন ভেঙে পড়ে।

কাঁদতে থাকে উমা।

ঠিক ঐ সময় কলকাতার সেই হোস্টেলে ছাদের উপর অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল আর এক নারী। কাঁদছিল চিত্রা। একা একা অন্ধকারে ছাদে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল চিত্রা। মানুষের মন বুঝি সত্যিই কখনও মানুষকে প্রতারণা করে না। মন যেন নিঃসংশয়ে সত্য সংবাদটা কেমন করে আপনা হতেই পেয়ে পেয়ে যায়। কেমন করে কোথা দিয়ে যে পায় তা একমাত্র জানে মনই।

চিত্রার মনও যেন এতদিন পরে সেই সত্য সংবাদটিই পেয়ে গিয়েছে। আজ

সে যেন কেমন করে বুঝতে পেরেছে বালুচরেই সে বুঝি ঘর বাঁধবার চেষ্টা করেছিল গত ছ-বৎসর ধরে। বুঝতে পেরেছে বালুচরে বাসা বাঁধা চলে না। সব মিথ্যা সব ফাঁকি। মাথার উপরে ঐ অন্ধকার নিরালম্ব আকাশটার মতই সব শূন্য, সব ফাঁকি। রাত ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। হোস্টেলের ঘরে ঘরে আলো নিভে যায়। ক্রমশঃ সব কিছু একটা অদ্ভুত স্তব্ধতার মধ্যে তলিয়ে যায়।

অন্ধকারে স্তব্ধতার মধ্যে সেতারের সুরতরঙ্গ ছড়িয়ে পরে। মিতালী করণ সিংকে চিঠি লিখছিল। সেতারের সুর মধ্যরাত্রির স্তব্ধতায় কানে এসে বাজতেই হাতের কলমটা তার থেমে যায়। কি সুর? কান পেতে শোনবার চেষ্টা করে মিতালী।

আজ বাগেশ্রী নয়, সোহিনী। গত কালও রাত্রে ঐ সুরটাই বাজিয়েছিল রাণু সেন মিতালীর মনে পড়ে। গত সন্ধ্যায় তার রুম-মেট কৃষ্ণার কাছে রাণু সেনের অতীত কাহিনী শুনেছে মিতালী। হোস্টেল সুপারিনটেনডেণ্ট চারু সিংহী কৃষ্ণার কি রকম দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় হয় নাকি। চারু সিংহী তার বান্ধবীর কাছে শুনেছিল রাণু সেনের কাহিনী।

মধ্য রাত্রে সেতারের আলাপ শুনতে শুনতে মিতালীর যেন রাণু সেনের কাহিনীই মনে পড়ে। চিঠির জবাব আর লেখা হল না মিতালীর। করণ সিংয়ের চিঠিটা আবার খাম থেকে বের করে পড়তে লাগল।

মিস চক্রবর্তী,

যদিও আপনি সেদিন স্টেশনে কথা দিয়েছিলেন, চিঠি লিখলে চিঠির জবাব দেবেন, তবু সাত দিন লিখতে পারি নি। বিশ্বাস করুন লিখতে বসেও লিখতে পারি নি। চেষ্টা করেও লিখতে পারি নি। একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লিখতে পারি নি।

অথচ যখন অনুমতি পাই নি, পাবার আশা কল্পনাও করতে পারি নি তখন কিন্তু নিঃসংকোচে চিঠির পর চিঠি লিখেছি। আর আজ অনুমতি পেয়েও লিখতে পারছি না। ভয় হচ্ছে কি লিখতে কি লিখে বসব তার পর হয়তো এত সাধনা করে পাওয়া অনুমতিটাকে অপমানিত করে বসব। তাই সর্বাগ্রে প্রার্থনা জানিয়ে রাখি, অবুঝের মত কিছু যদি ঝোঁকের মাথায় লিখেই ফেলি ক্ষমা করবেন কিন্তু।

জানেন সে রাত্রে ট্রেনে একটি বারের জন্যও চোখের পাতা আমি এক করতে পারি নি। সারাটা রাত বার্থের উপরে বসে বসে নিজের কল্পনাতীত

সৌভাগ্যটাকেই যাচাই করেছি। ভেবেছি যা ঘটল তা কি সত্যি! না স্বপ্ন দেখলাম! জীবনে আমার কি এমন তপস্যা ছিল যাতে করে এত বড় সৌজন্য আমার হাতে এসে ধরা দিল, আমার চারিদিককার জগৎটা এমন সুন্দর হয়ে উঠল রঙে রসে গন্ধে। পৃথিবীটা কি সত্যিই এত সুন্দর! এত গান এত সুর কি সত্যিই পৃথিবীতে আছে!

এই দেখুন, কি সব আবোল-তাবোল লিখছি। আচ্ছা এরই নাম কি—না থাক, বলব না, এতখানি অধিকার তো আপনি আমাকে আজও দেন নি। ক্ষমা করবেন। আমি, আমি—ঠিক যা বলতে চাই বলতে পারছি না। যা লিখব ভেবেছিলাম তা লিখতে পারছি না। তা নাই বা বলতে পারলাম, যাকে বলতে চেয়েছিলাম, যাকে জানাতে চেয়েছিলাম সে তো জেনেছে।

আজ আর নয়। এইখানেই ইতি করি।

সেতার বাজছে এখনও রাণু সেনের ঘরে।

চিত্রা তখনও ঠিক তেমনি করেই অন্ধকারে ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে।

দূরের রেল লাইন দিয়ে একটা মাল গাড়ি চলে গেল বিচিত্র শব্দ জাগিয়ে। অন্ধকারের যেন একটা নিঃসঙ্গ একক রূপ আছে, বিশেষ করে মধ্যরাত্রির শব্দহীন অন্ধকারের। সামনে টেবিলের উপরে রক্ষিত টেবিল ক্লকটার দিকে তাকাল মিতালী, সাড়ে বারোটা বাজে প্রায়। লেটার প্যাড ও ঝর্না কলমটা একপাশে সরিয়ে রেখে মিতালী উঠে দাঁড়াল। নীচে একটা গাড়ি এসে থামবার শব্দ পাওয়া গেল। এত রাত্রে আবার কে এল হোটেলে! কৃষ্ণা ফিরে এল না তো। ঘরের জানালা-পথ নীচের দিকে ঝুঁকে তাকাল মিতালী।

হোস্টেলের গেটের সামনে রাস্তাটায় গাড়ির হেডলাইটে চোখ ধাঁধানো আলো এসে পড়েছে।

কৃষ্ণার গলাই শোনা গেল, টা—টা—

কৃষ্ণাই তা হলে এতক্ষণে ফিরল।

ভোলাটার যা কুম্ভকর্ণের মত ঘুম। সহজে দরজার তালা খুলে দেবে না। মিতালী নীচে নেমে গেল। ভিতরের দিকে একটা ছোট ঘরে ভোলা আর বাহাদুর শোয়। ওদের ঘরের দরজা অবিশ্যি খোলাই ছিল। মিতালী ঘরের সামনে গিয়ে ডাকে, এহ ভোলা, ভোলা—

ভোলার ঘুম ভাঙে না, কিন্তু বাহাদুরের ঘুম ভাঙে, কৌন!

এই বাহাদুর, কৃষ্ণা দিদিমণি এসেছে, উঠে গিয়ে দরজা খুলে দে—

বাহাদুর চাবিটা নিয়ে দরজা খুলতে চলে গেল।

মিতালী আবার নিজের ঘরে ফিরে গেল। একটু পরেই বাইরে পদশব্দ শোনা যায়। এবং কৃষ্ণার কণ্ঠে গুন গুন সুরে শোনা যায়। কৃষ্ণা এসে ঘরে ঢুকল গুন গুন করে গাইতে গাইতে :

আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আসবে যদি শূন্য হাতে—

কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল মিতালীর, কৃষ্ণা যেন একটু টলছে, গলার স্বরটাও যেন কেমন কেমন। কৃষ্ণা তখনও গাইছে—

আমি তাইতে কি ভয় মানি।

জানি জানি বন্ধু, জানি তোমার আছে তো হাতখানি—

কৃষ্ণা!

উঁ, জড়ানো দৃষ্টি তুলে তাকাল কৃষ্ণা মিতালীর মুখের দিকে।

তুমি মদ খেয়েছ কৃষ্ণা!

মদ! না, না—একটুখানি শেরি—কৃষ্ণেন্দু বললে, একটুখানি শেরি, **that won't do any harm**।

বলতে বলতে কৃষ্ণা তার বাইরের জামা-কাপড় বদলাতে থাকে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে যেন চেয়ে থাকে কৃষ্ণার দিকে মিতালী।

কৃষ্ণেন্দু বলল আর তাই তুমি মদ খেলে কৃষ্ণা।

মদ তো নয়, এ একটু শুধু শেরি।

কোথায় বসে খেলে?

হোটেলে, কৃষ্ণেন্দুর ঘরে। কি করব, কৃষ্ণেন্দু বললে—কথাগুলো বলতে বলতে কৃষ্ণা প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিল, মিতালী তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল কৃষ্ণাকে।

টলছ তুমি, শোও—

শুইয়ে দিল মিতালী কৃষ্ণাকে তার শয্যায়।

তার পর ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল।

চোখ থেকে ঘুম যেন একেবারে চলে গিয়েছিল মিতালীর। অন্ধকার ঘরে সে খোলা জানালাটার সামনে এসে দাঁড়াল। রাণু সেনের ঘরের সেতার থেমে গিয়েছে। ইচ্ছা হচ্ছিল মিতালীর কৃষ্ণার ঐ মাসতুত ভাই কৃষ্ণেন্দুকে সামনে পেলে গোটাকতক চড় তার গালে ঠাস ঠাস করে বসিয়ে দেয়।

মানুষটা শুধু কাওয়ার্ড নয়, ইতরও।

অবর্ণনীয় একটা আক্রোশে যেন মিতালী ফুঁসছিল।

হঠাৎ চমকে ওঠে মিতালী একটা চাপা কান্নার শব্দে।

কে—কে কাঁদে!

ঘুরে দাঁড়াতেই বুঝতে পারে মিতালী, শয্যায় শুয়ে গুমরে গুমরে কাঁদছে কৃষ্ণা। কেমন একটু যেন বিস্মিত হয় মিতালী। মুহূর্তের জন্য বুঝি একটু ইতস্তত করবার পরই অন্ধকারে পায়ে পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়া কৃষ্ণার শয্যার পাশে দাঁড়ায়।

কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা সে ডাকে কোন সাড়া দেয় না। গুমরে গুমরে কাঁদতেই থাকে।

কি ভেবে কৃষ্ণার শিয়রে বসল মিতালী। কৃষ্ণার মাথায় এক হাত রেখে আবার শুধাল, কি হল কাঁদছ কেন? এই, এই কৃষ্ণা—

মিতালী, **I—I am finished**!

চমকে ওঠে কৃষ্ণার ঐ কথাটা শুনে মিতালী।

কেন, কি—কি হয়েছে?

I am—আমি—আমি মা হতে চলেছি মিতালী।

ধক করে ওঠে মিতালীর বুকের ভিতরটা। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খায় যেন সে।

সে কি?

হ্যাঁ—কিন্তু কৃষ্ণেন্দু, কৃষ্ণেন্দু—আজ বলছে আমার পেটের এই সন্তান নষ্ট করবার জন্য—

কি বললে?

হ্যাঁ—সে সব ব্যবস্থা করে দেবে।

নষ্ট করবার সব ব্যবস্থা সে করে দেবে অথচ সে তোমাকে বিয়ে করতে পারবে না তাই কি? এতক্ষণের অবরুদ্ধ আক্রোশটা যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে মিতালীর কণ্ঠস্বরে, কাওয়ার্ড—

না, না—বিয়ে সে করবে বলেছে। বিয়ে আমাদের হবে, তবে—

তবে—তবেটা কি আবার এর মধ্যে আছে?

এটাকে সে নষ্ট করে ফেলতে চায়।

তোমার যদি এতটুকু মনুষ্যত্বও থাকে কৃষ্ণা তো এ গর্হিত কাজ তুমি করবে না আর বিয়েটা তোমাদের যত তাড়াতাড়ি পারো—

কিন্তু—

এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই কৃষ্ণা। আজ যদি সে তোমাকে বিয়ে না করে তো জেনো জীবনে আর কখনও সে তোমাকে বিয়ে করবে না।

না, না—কৃষ্ণেন্দুকে চেনো না—

চিনি না আবার, খুব চিনি। ওদের চিনতে আর আমার বাকী নেই। সুবিধাবাদী, নীতিহীন লম্পট—

মিতালী!

আশ্চর্য। কেন তোমরা এদের বুঝতে পার না?

তা হলে, তা হলে আমি কি করব মিতালী?

বললাম তো কি করবে।

কিন্তু ও রাজী হচ্ছে না এখন।

রাজী যেমন করে হোক তোমায় করাতেই হবে।

আর—আর যদি না রাজী হয়।

জানি না। জানি তা হলে তুমি কি করবে। কিন্তু এখন ওসব কথা থাক। ক্লান্ত তুমি, ঘুমোও। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

কৃষ্ণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে মিতালী তার শিয়রের ধারে বসে।

ইতিমধ্যে কখন এক সময় বুঝি এক ফালি চাঁদ উঠেছিল রাতের আকাশে। তারই একটুখানি আলো ওধারের জানালা-পথে কৃষ্ণার শিয়রের কাছে এসে পড়ে। সেই আলোতেই নজরে পড়ে মিতালীর, ঘুমিয়ে পড়েছে কৃষ্ণা। চোখের কোণে অশ্রুচিহ্ন চিক্ চিক্ করছে। মিতালীর সেই অশ্রু-ভেজা করুণ ঘুমন্ত মুখখানির দিকে চেয়ে মনে হয় আকাশের রং যেন বদলে গিয়েছে। পরিচিত আকাশটা আর চেনবার উপায় নেই। কেমন একটা হাঁফ ধরে মিতালীর।

কোথায় বাতাস, কোথায় আলো, কোথায় ভালবাসা, কোথায় বিশ্বাস? আজকের মানুষের কাছে সব কিছুই কি আজ অর্থহীন, নিষ্প্রয়োজন? তবে আজ তাদের কাছে কিসের প্রয়োজন রইল! কি নিয়ে তারা বাঁচবে! কোন্ মাটিতে পা রেখে তারা দাঁড়াবে!

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ ১ ॥

উমার জন্য রঞ্জিতের মত পাত্র জুটবে এ যেন সত্যিই মণিমোহনের কল্পনাতীত ছিল। জগদ্ধাত্রীর মুখে প্রথম একথাটা শুনে সত্যিই তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। পাঁচশো টাকা মাইনে পায় রঞ্জিৎ, সেই ছেলে বিনা পণে কেবলমাত্র শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে তাঁর উমাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে, বিশেষ করে আজকালকার দিনে অবিশ্বাস্য নিঃসন্দেহে।

তাই কথাটা জগদ্ধাত্রীর মুখে শুনে বলেছিলেন মণিমোহন প্রথমটায়, তুমি ঠিক বলছ তো বড়বৌ, শেষ পর্যন্ত সবটাই একটা প্রহসনে দাঁড়াবে না তো?

না, না—ঠাকুরপো। আমার সঙ্গে তার পাকা কথা হয়ে গেল যে। অবিশ্যি ওকে দেখা অবধি এবারে ঐ কথাটাই আমার মনে এলেও উত্থাপন করতে সাহস পাইনি। প্রথমে বলেছিলামও সংকোচের সঙ্গে। কিন্তু যখন দেখলাম প্রস্তাবটা তোলামাত্র রাজী হয়ে গেল তখন বুঝলাম—

কি?

মৃদু হেসে জগদ্ধাত্রী বলেন, আমাদের উমাকে ওর আগেই মনে ধরেছিল।

তা হলে আর দেরি করা উচিত নয় কি বল বড়বৌ?

নিশ্চয়ই না। চার হাত যত তাড়াতাড়ি হয় এক করে দাও। তুমি কাল সকালেই একবার ভট্টচায্যি মশাইকে ডেকে এনে দিনটা দেখ—

সে তো দেখবই। তা হলেও একটা কথা বড়বৌ।

কি?

উমার একটা মতামত—

সে তুমি ভেবো না ঠাকুরপো। সে আমি দেখব।

হ্যাঁ, তুমি তো জান ছোটবেলা থেকে ও কি রকম জেদী। যদি বেঁকে বসে তো—

বড় : না, না—আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখুনি যাচ্ছি তার কাছে।

জগদ্ধাত্রী ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। এবং কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরে এসে মণিমোহনকে জানালেন সব ঠিক আছে, মণিমোহন যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস নেন।

পরের দিনই সকালে মণিমোহন প্রতিবেশী কালীচরণ ভট্টাচার্যের ওখানে গিয়ে হাজির হলেন এবং ১লা অগ্রহায়ণই ভাল দিন আছে জেনে ফিরে এলেন।

জগদ্ধাত্রী রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে সকালের আনাজ কুটছিলেন। শুধালেন, গিয়েছিলে ভট্‌চায্যির ওখানে ?

হ্যাঁ—

কবে দিন দেখলে ?

মাসের প্রথম তারিখেই তো দিন আছে।

তবে সেই ব্যবস্থাই কর।

সে কথা আর বলতে। ভাদ্রের আজ চব্বিশে, হাতে মাত্র আর দুটি মাস আছে। যোগাড়-পত্তর তো এর মধ্যেই করতে হবে।

হ্যাঁ, সে চায় না বলেই তো কিছু আর আমাদের মেয়েকে আমরা খালি হাতে পায়ে একেবারে গামছা পরিয়ে পার করতে পারি না।

তা তো বটেই। কিছুই তো গয়না বলে নেই! ছোট বৌয়ের যা ছিল, তোমার যা ছিল, সবই তো এখানে এসে বিক্রি করে এই মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু আর দোকানটা করেছি। কিছু না দিলেও অন্ততঃ গলার একটা হার, হাতে চার গাছা করে চুড়ি তো দিতেই হবে কি বল ?

তা তো বটেই। তা ছাড়া এক প্রস্থ শয্যা, কিছু বাসন-পত্তর তাও দিতে হবে। তা দেখ বলছিলাম কি—

কি ?

শ্বশুর ঠাকুরের দেওয়া দশ ভরিটাক আন্দাজের এক জোড়া হাঙরমুখী বালা এখনও আমার কাছে, উমির বিয়ের জন্যই সেটা সরিয়ে রেখেছিলাম—

না, না—তোমার তো যা ছিল সবই নিয়েছি বড়বৌ। ওটা আর তোমায় দিতে হবে না। আমিই এদিক-ওদিক এক বার চেষ্টা করে দেখি—

কি যে তুমি বল ঠাকুরপো, ও গয়না দিয়ে আমার কি হবে।

তা হলেও আপদ-বিপদের কথা কি বলা যায় বড়বৌ!

একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই আর এক বেলা দু মুঠো আলো চালের ভাত এই তো—সে তোমার জুটলে আমারও জুটবে আমি জানি। তুমি আর কিন্তু করো

না। আমাদের গাঁয়ের মথুর স্যাকরা তো বেলিনীর নেতাজী কলোনীতে এসে দোকান দিয়েছে, তাকেই এক বার খবর দাও, সময় তো আর নেই—ওই দিয়েই হার আর চুড়ি গড়িয়ে নিই—

বেশ। তা হলে তুমি যা ভাল বোঝ কর।

কিন্তু মুখে যাই বলুন মণিমোহন, মনের মস্ত বড় একটা দুশ্চিন্তা তাঁর লাঘব হয়ে যায়। কাল সারাটা রাত ঐ গয়নার কথাই ভেবেছেন মণিমোহন। ভেবে কোন কূল পান নি।

উঠে দাঁড়ালেন মণিমোহন, তা হলে আমি দোকানে চললাম বড়বৌ।

দাঁড়াও চায়ের জল হয়ে গিয়েছে, চাটা খেয়ে যাও।

চা খেয়ে মণিমোহন দোকানে বের হয়ে গেলেন।

দোকানে যে ছোকরাটি থাকে অবিনাশ, মণিমোহনের গাঁয়েরই ছেলে, তাঁদেরই মত বাস্তুত্যাগী। গ্রামের স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করে গ্রামের বিন্ধ্যবাসিনী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছিল। কলকাতায় এসে ঐ সামান্য বিদ্যায় কোন সুবিধা করে উঠতে পারে নি। তবে সংসারের ঝামেলা বিশেষ ছিল না। একমাত্র বিধবা মা ও সে। বিয়ে-থা করে নি।

এখানে আসার পরে অনন্যোপায় হয়েই কতকটা লোকাল ট্রেনে চানাচুর ফেরি করে বেড়াচ্ছিল। তাতে পরিশ্রমই সার হচ্ছিল, দুটো পেট ভরছিল না। মণিমোহন জানতেন ছেলেটি পরিশ্রমী, সৎ এবং বিশ্বাসী। দোকানেও এক জন লোকের দরকার হচ্ছিল। মণিমোহন অবিনাশকে চল্লিশ টাকা মাইনেয় দোকানের কাজে নিয়ে নিলেন। সেও আজ বছর দুই হতে চলল।

ক্রমশঃ দোকানের বিক্রি বাড়ায় গত মাস থেকে অবিনাশের মাইনে আরও পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন মণিমোহন। মণিমোহন যখন দোকানে এসে পৌছলেন, তার ঘণ্টাখানেক আগেই দোকান খুলেছে অবিনাশ। প্রত্যহ অবিশ্যি দোকান খোলার মুখেই এসে পড়েন মণিমোহন, কিন্তু আজ কালী ভটচায্যির ওখানে দিন দেখতে যাওয়ায় ঘণ্টা খানেক তাঁর দেরি হয়ে গিয়েছিল। অবিনাশ মণিমোহনকে কাকাবাবু বলে ডাকত।

একজন খদ্দেরকে চা বিক্রি করছিল অবিনাশ, মনিমোহনকে দোকানে ঢুকতে দেখে শুধাল, কাকাবাবু, দোকানে আসতে দেরি হল যে! শরীর ভাল তো?

নিজের জায়গায় বসতে বসতে মণিমোহন বলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ—ভাল। একটা বড় সুখবর, আনন্দের খবর আছে হে অবিনাশ।

আনন্দের খবর!

হ্যাঁ, কাল হঠাৎ উমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল।

তাই নাকি! খুব আনন্দের কথা। তা পাত্র কোথাকার?

আমাদেরই জানা-চেনা ঘর। একেবারে রাজপুত্তুর—বুঝলে অনিবাশ, একেবারে রাজপুত্র। যেমন ঘর, তেমনি বংশ—

আহা, তাই নাকি? তা ছেলেটি করে কি—

করে কি মানে! পাঁচশো—যাকে বলে পাঁচশো টাকা মাইনে পায় ছেলে—এ তোমার গে হেঁজিপেঁজি চাকরি—কেরানীগিরি নয়—

সত্যি!

তবে আর বলছি কি হে। তা ছাড়া বাপের ঐ একমাত্র ছেলে, বাপ বড় চাকরি করত—মারা যাবার সময় অনেক টাকা রেখে গিয়েছে—

তা দিতে-থুতে হবে কেমন?

দিতে-থুতে হবে মানে! একি তোমার হাঘরের বংশ হে! একটি কপর্দকও নয়—বুঝলে একেবারে শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে বিয়ে করে নিয়ে যাবে আমার উমাকে। কেমন বংশ—কত বড় চাকরি করে, তা নজর উঁচু হবে না। কিন্তু তাই বলে আমি তো আর ওভাবে মেয়ে দিতে পারি না। আমারও তো একটা বংশের ঐতিহ্য আছে হে—

তা তো বটেই। কত বড় বংশ, কত বড় ঘর—আপনার পিতৃদেব তো যাকে বলে রাজা ছিলেন।

তবেই বল, আমার মেয়েকে তো শুধু হাতে গামছা পরিয়ে কিছু আর বিয়ে দিতে পারি না। তা ছাড়া এই আমার জীবনের শেষ কাজ।

সে তো বটেই।

হাতে যা আছে আর অন্তত কম পক্ষে হাজার দুই টাকার দরকার অবিনাশ, তাই ভাবছিলাম—

কি কাকাবাবু?

সুখন আগরওয়ালার কাছে—

কিন্তু সে লোকটা তো যতদূর জানি আর শুনেছি কাকাবাবু, এমনি শুধু হাতে কখনও টাকা দেয় না—

না, না—শুধু হাতে কেন!

তবে?

এই দোকানটা বন্ধক রেখে—

এই দোকান বন্ধক রাখবেন কাকাবাবু!

তা ছাড়া আর উপায় কি অবিনাশ। অবিশ্যি ভিটে বাড়িটুকু করেছি, সেটাও বন্ধক দিতে পারতাম, কিন্তু বসত-লক্ষ্মীকে বাঁধা রাখব, মনটা যেন অগ্রসর হচ্ছে না। তাই ভাবছিলাম—

কিন্তু কাকাবাবু, এ দোকান বাঁধা রাখলে তো তার লোক এনে বসাবে সে। আজ এই দোকানের কত নাম। অন্তত হাজার ছ-সাত টাকার মাল রয়েছে—

তা তো জানি হে। তবে সে রকম লেখা-পড়া করে নেবো। করে নিতে হবে—

দোকান বন্ধক রেখে টাকা জোগাড়ের কথা ভাবছিলেন মণিমোহন, কথাটা কিন্তু উমার কাছে চাপা থাকে না। কথাটা কানে যেতেই সেদিন জগদ্ধাত্রীকে ঘরের মধ্যে ডেকে আনে উমা।

জেঠিমণি।

কি রে!

এসব তোমরা কি শুরু করেছ?

কেন, কি হল আবার!

আমার বিয়ের জন্য বাবা নাকি দোকান বাঁধা দিচ্ছে!

তা সে কিছু নেবে না বললেও একেবারে তো ফুল সিঁদুর দিয়ে কয়েকটা মন্তর পড়ে দিয়ে বিয়ে হতে পারে না। তোর বাপেরও তো একটা ইজ্জত বলে জিনিস আছে।

শোন জেঠিমণি, দোকান বন্ধক দেওয়া-টেওয়া চলবে না, ওসব—ওসব যদি কর তো জেনো, এ বিয়ে হবে না।

পাগলামি করিস না উমা।

আমার যা বলবার ছিল আমি বললাম। এবারে তোমাদের যা খুশি করতে পারো।

জেদী মেয়ে উমা। উমাকে ভাল করেই চেনেন জগদ্ধাত্রী। উমার কথায় তিনি শংকিতই হয়ে ওঠেন, সেই দিনই রাত্রে মণিমোহন দোকান থেকে ফেরবার পর কথাটা তাঁর কর্ণগোচর করলেন।

মণিমোহন রীতিমত চটে ওঠেন কথাটা শুনে, তাকে বলে দিও বড় বৌ, এ

সব জেঠামি আমি সহ্য করব না। ওঃ, দু-পাতা ইংরেজী পড়ে মেয়ে আমার লায়েক হয়ে উঠেছেন।

জগদ্ধাত্রী দেখলেন মণিমোহন চটেছেন তাই আপাতত সেখান থেকে সরে পড়লেন। মণিমোহনের কথাগুলো অবিশ্যি উমার শুনতে বাকী রইল না কারণ পাশের ঘরই উমার, মণিমোহন উচ্চকণ্ঠেই কথাগুলো যেমন বলেছিলেন তেমনি উমাও সে সময় পড়ার টেবিলে বসে সব কথাই শুনতে পায়। উমা টেবিলের উপরে বসে বসে রঞ্জিতের উপহার দেওয়া সেই ইতিহাসের বইটাই পড়ছিল। কথাগুলো কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখটা তার কঠিন হয়ে উঠল।

টেবিলের সামনে খোলা ইতিহাসের বইটা উমা বুজিয়ে রেখে ঘরের আলোটা কমিয়ে দিল। নিজের বাপ মণিমোহনকে সে ভাল করেই চেনে। মণিমোহন যখন একবার স্থির করেছেন দোকান বন্ধক রেখেই টাকার যোগাড় করবেন, করবেনই তিনি। কিন্তু উমা, উমা কি বুঝতে পারছে না হৃতসর্বস্ব বাপের আজ এই বৃদ্ধ বয়সে জীবনের শেষ সম্বল দোকানটিই। এবং এই বয়সে প্রভূত পরিশ্রম করে গড়ে তোলা এই দোকানটিই একমাত্র আশা ও ভরসা।

দাদা আছে বটে, কিন্তু দাদা যা রোজগার করে, নিজের সংসার চালিয়ে অতগুলো সন্তান নিয়ে বাবাকে সাহায্য করা তার পক্ষে রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তার উপরে মা চিররুগ্না শয্যাশায়ী। প্রতি মাসে তাঁর কবিরাজী চিকিৎসাতেও কমব্যয় হয় না। যদিও মা আর চিকিৎসা করতে চান না, ঘোরতর আপত্তি করেন, তথাপি মণিমোহন মার কথায় কান দেন না।

বাবার যে মার প্রতি একটা নিদারুণ দুর্বলতা আছে সেটা আর কেউ না জানলেও উমা জানে। কাজেই মণিমোহনের পক্ষে আজ এত ঝুঁকি নেওয়া যে কতখানি দায়িত্বের, তা উমা খুব ভাল করেই বুঝছে। কিন্তু সেই মানুষটাই বা কি! এতই যদি উদারচেতা সে, এসব ব্যাপারে তার প্রতিবাদই বা জানায় না কেন! সে কি জানে না তাদের সংসারের খবর!

উমা মনে মনে স্থির করে কাল রঞ্জিতের মেসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে। স্পষ্ট ভাষাতেই সে জানিয়ে আসবে তার বিয়ে যদি সত্যিকারের শুধুমাত্র শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে না হয় তো সে বিবাহে রাজী নয়। রঞ্জিতের মেসের ঠিকানাটা আগেই শুনেছিল উমা। উমা স্থির করে কালই কলেজ ফেরতা রঞ্জিতের সঙ্গে গিয়ে দেখা করবে।

॥ ২ ॥

জগদ্ধাত্রীই চিঠি দিয়ে রঞ্জিৎকে জানিয়েছিলেন, রঞ্জিতের যদি কোন রকম আপত্তি বা অসুবিধা না থাকে তো তাঁরা অগ্রহায়ণের পয়লা তারিখেই যে বিবাহের দিন এবং লগ্ন আছে সেই দিন ও লগ্নতেই উমার বিবাহ দিতে চান। চিঠি পেয়ে রঞ্জিতের একবার ইচ্ছা হয়েছিল সে নিজেই গিয়ে গোবরডাঙায় জানিয়ে দেবে, কোন অসুবিধাই নেই তার, ঐ তারিখেই বিবাহ করতে সে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেমন যেন একটা সংকোচ বোধ করে সে। নিজে না গিয়ে চিঠিতেই জগদ্ধাত্রীকে সে তার সম্মতি জানিয়ে দিয়েছে। এবং সে দিন জগদ্ধাত্রীর কাছে সম্মতি দিয়ে আসার পর থেকেই ছোট একটা বাসা-বাড়ির সন্ধান করতে শুরু করে দিয়েছিল রঞ্জিৎ।

পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদেরও বাসা-বাড়ির কথাটা বলে রেখেছিল। বলেছিল আলো-বাতাসওয়ালা ছিমছাম দু'খানা ঘর হলেই তার চলবে এবং ভাড়া সে এক শো থেকে একশো পঞ্চাশ পর্যন্ত দিতে রাজী আছে। অবিশ্যি রঞ্জিৎ জানত ওর কমে বাড়ি পাওয়া স্বপ্নাতীত ব্যাপার আজকালকার দিনে।

সত্যিই আজকালকার দিনে বাড়ি পাওয়া যে কি কঠিন ব্যাপার তা অজানা ছিল না রঞ্জিতের। কেবল কি একটা বাসা-বাড়িই। মনের মত করে সাজাবে সেই বাড়ি রঞ্জিৎ। উমা আসবে তার ঘরে। উমাকে যোগ্য অভ্যর্থনা জানাতে হবে তো। যে ফার্নিচারগুলো এত দিন সে ব্যবহার করছে, সেগুলোও পুরানো হয়ে গিয়েছে। এক সেট নতুন ফার্নিচারও কিনতে হবে।

ইতিমধ্যে ফার্নিচারের অর্ডার পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে রঞ্জিৎ বৌ-বাজারের একটা ফার্নিচারের দোকানে।

বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত জনেদের বাড়ির জন্য তো বলে রেখেছিলই, নিজেও প্রত্যহ অফিসের পর সংবাদপত্রের 'টু-লেট' দেখে দেখে বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বালিগঞ্জের লেকের দিকে একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে ছোট একটি দুই কামরাওয়ালা ফ্ল্যাটের সন্ধান পেয়েছিল রঞ্জিৎ। সেদিন অফিসের ছুটির পর সেই ফ্ল্যাটটা দেখতে গিয়ে মোটামুটি ফ্ল্যাটটা পছন্দই হয়ে গেল রঞ্জিতের। ভাড়া অবিশ্যি একটু বেশী। একশো পঁচাত্তর।

ফ্ল্যাটটা পছন্দ হওয়ায় রঞ্জিৎ সেই ভাড়াতেই ফ্ল্যাটটা ঠিক করে যখন মেসে ফিরল, রাত তখন প্রায় সাতটা বাজে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই বারীন এসে সামনে দাঁড়াল, এত দেরি করে আজকাল ফের কেন, ভদ্রমহিলা কতক্ষণ থেকে তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন....

ধক করে ওঠে রঞ্জিতের বুকটা। কে আবার ভদ্রমহিলা তার জন্য অপেক্ষা করছে! চিত্রা নয় তো? দাঁড়িয়ে পড়ে রঞ্জিৎ, ভদ্রমহিলা!

হ্যাঁ—

কে?

তা কি করে জানব, কখনও আগে দেখিনি তো তাঁকে।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই রঞ্জিৎ গিয়ে ঘরে ঢোকে। এবং ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায়। চেয়ারে বসে উমা।

একি উমা! তুমি—

আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে—

জরুরী কথা। আমাকে একটা চিঠি দিলেই তো পারতে। আমিই যেতাম গোবরডাঙায়।

আপনি কি বলে এসেছেন আপনার পিসীমাকে?

আমি! কেন, কি বলে এসেছি!

উমার পর পর প্রশ্নে রঞ্জিতের মত ছেলেও যেন কেমন একটু থতমতই খেয়ে যায়।

কেন, আপনি বলে আসেন নি কোন রকম দাবিদাওয়া আপনার নেই, শাঁখা-সিঁদুর দিয়েই আপনি বিবাহ করবেন?

এতক্ষণে যেন রঞ্জিৎ দাঁড়াবার মত একটা ঠাঁই পায়।

ব্যাপারটা কিছুটা তার বোধগম্য হয়।

তবু রঞ্জিৎ যেন একটা ঢোক গিলে মৃদু কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ—

তবে বাবা তাঁর একমাত্র সম্বল দোকানটা বন্ধক দিচ্ছেন কেন?

বন্ধক দিচ্ছেন?

হ্যাঁ, উদারতাই যদি দেখাতে চান তো খুঁত রাখলে কেউ আপনাকে তো বাহবা দেবে না।

ছি ছি, এ তুমি কি বলছ উমা। আমি বাহবা নেবার জন্য তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছি?

তা ছাড়া আর কি বলতে পারি বলুন। আপনার পিসীমার কাছে বাহাদুরি নেবার জন্য—

আর যেন বলতে পারে না উমা,…গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে।

বিশ্বাস কর সত্যিই সে সব কিছু নয়—

তবে কি আমার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে না আমাকে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবেসে? যাকে আপনারা বলে থাকেন—**Love at first sight**।

রঞ্জিৎ কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে উমার মুখের দিকে। উমা বলতে থাকে, কিন্তু সে রকম আহামরি দূরে থাক, সামান্য উল্লেখযোগ্য রূপ-গুণও তো আমার নেই। এবং ব্যাপারটা নিছক যদি মেয়েদের প্রতি আপনার মহানুভবতা দেখানোই তা হলে হয় আমার মত বয়স্থা অবিবাহিতা মেয়ে তো বাংলাদেশে আজ হাজারে হাজারে লক্ষে লক্ষে আছে।

রঞ্জিৎ বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

উমা বলতে থাকে, তবে ব্যাপারটা আপনার পিসীমার কাছে বাহাদুরি নেওয়া ছাড়া আর কি বলব বলুন?

কিন্তু বিশ্বাস কর উমা, সত্যিই ওর মধ্যে বাহাদুরি নেওয়ার ব্যাপার কিছু ছিল না। আমি—মানে আমার সত্যিই তোমাকে ভাল লেগেছিল।

বিচিত্র একটা মৃদু হাসির রেখা যেন উমার ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

কিন্তু আমার মত সাধারণ এক গেঁয়ো মেয়ের মধ্যে চিরদিন শহরের মানুষ আপনার কি এমন ভাল লেগেছিল বলুন তো আমাকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখেই।

সে কথাটা নাই বা জানতে চাইলে উমা।

তাই কি হয়, জেনে রাখা ভাল।

উমা, তুমি কি আমার সঙ্গে আজ ঝগড়া করতেই এসেছ! আর ঝগড়া করবে বলেই এতক্ষণ আমার অপেক্ষায় এখানে বসে ছিলে? রঞ্জিৎ শুধায়।

সহসা উমা যেন কোন কথার জবাব দিতে পারে না। কারণ কেবলমাত্র দোকান বন্ধক দেবার ব্যাপারটায় বাধা দেওয়ার জন্যই উমা আসে নি। সে যেন রঞ্জিতের ব্যাপারটা সত্যিই বুঝে উঠতে পারছিল না, কেন হঠাৎ রঞ্জিৎ তাকে বিয়ে করবার জন্য এভাবে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছে। উভয়ের সঙ্গে তাদের কোন পূর্ব পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা বা আলাপ কিছুই নেই। উমা এমন একটা কিছু আহামরি সুন্দরীও নয়। তার বাপের প্রচুর সম্পত্তিও নেই। তবে কি। কিন্তু ঐ মুহূর্তে

ব্যাপারটা যাচাই করতে গিয়ে উমার যেন হঠাৎ মনে হল রঞ্জিতের ব্যাপারটার মধ্যে আর যাই থাক, ছলনা নেই। তাই সে এবারে কতকটা শান্ত ভাবেই মাথাটা নীচু করে মৃদু কণ্ঠে বলে, না ঝগড়া করতে আসি নি।

তবে?

বলতে এসেছিলাম কেবল—বাবা যদি তাঁর দোকান বন্ধক দেন আমার বিয়ের জন্য, তা হলে এ বিয়ে হবে না।

আর তা যদি না হয়?

উমা চুপ করে থাকে।

কি বলছ না যে, তা হলে আমাদের বিয়ে হবে তো?

উমা মাথা নীচু করে থাকে।

তুমি আমাকে কথাটা জানিয়ে ভালই করেছ উমা। যাক তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমার বিয়ের জন্য তোমার বাবাকে তাঁর দোকান বন্ধক দিতে হবে না। তার পর একটু মৃদু হেসে আবার বলে রঞ্জিৎ, কই বললে না তো এখন আর আমাদের বিয়েতে তোমার আর কোন আপত্তি আছে কি না।

উমা কোন সাড়া দেয় না।

পূর্ববৎ হাসতে হাসতে রঞ্জিৎ বলে, রাগের মাথায় কলেজ থেকে ছুটে এসেছিলে নিশ্চয়ই এক কাপ চাও পেটে পড়ে নি। চা আনাই—

না, না—এখন আমি যাব। কটা বেজেছে জানতে পারলে হত। মৃদুকণ্ঠে উমা বলে।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রঞ্জিৎ বলে, সাতটা পঁয়ত্রিশ—

আটটা দশের ট্রেনটা তা হলে পেয়ে যাব। আমি উঠি।

ভয় নেই। এক কাপ চা খেয়েও যেতে পার তুমি, তা ছাড়া আটটা দশের ট্রেনটা যাতে ধরতে পার সে ব্যবস্থা আমি করব। একটু বসো তুমি।

তাড়াতাড়ি রঞ্জিৎ ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এবং তর তর করে নীচে নেমে গিয়ে চাকরকে দু কাপ চায়ের ও কিছু খাবারের কথা বলে উপরে চলে আসে।

উমা তখনও চুপটি করে খাটের উপর বসে।

রাগ পড়েছে উমা?

উমা মুখ তুলে তাকাল।

রাগ পড়ল?

রাগ কিসের?

বাবাঃ, ঘরে ঢুকতেই যে ভাবে তেড়ে এসেছিলে!

উমা মৃদু হাসে।

কিন্তু দুঃখ নেই আমার সেজন্য, একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম আজ।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে উমা মুখ তুলল।

রাগলে তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায়।

চাকর একটা প্লেটে কিছু খাবার ও গরম দু কাপ চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। চাকরের হাত থেকে একটা চায়ের কাপ ও খাবারের প্লেটটা এগিয়ে দিল উমার দিকে রঞ্জিৎ, নাও চটপট সেরে নাও—

কিন্তু একি, আমি—আমি এসব এখন খাব না।

মাত্র আর কুড়ি মিনিট আছে কিন্তু—মৃদু হেসে রঞ্জিৎ বলে।

কিন্তু—

এক থালা লুচি তরকারী ও মিষ্টির চাইতে এ কিন্তু অনেক কম।

তার মানে?

মনে করে দেখ সেদিন তোমাদের ওখানে আমাকে তোমরা কি ভাবে খাইয়েছিলে। কোন কথাতেই আমার কান দাও নি।

তার প্রতিশোধ নাকি?

না, না—সে সব কিছু নয়। আমি হলপ করে বলতে পারি তোমার ক্ষিধে পেয়েছে, নাও খেয়ে নাও।

শেষ পর্যন্ত উমাকে অর্ধেক খাবার না খাইয়ে ছাড়ল না রঞ্জিৎ। উমাও বেশী আর পীড়াপীড়ি করে না কারণ ট্রেনের সময় হয়ে গিয়েছিল।

ট্যাক্সিতে করে একেবারে উমাকে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এল রঞ্জিৎ, উমার আপত্তি সত্ত্বেও। ফেরার সময় কতটুকুই বা পথ, রঞ্জিৎ হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এল। কিন্তু দোতলায় উঠে নিজের ঘরের দরজা খোলা দেখে এবং ভিতরে আলো জ্বলতে দেখে থমকে দাঁড়াল রঞ্জিৎ এবং নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি বুকের ভিতরটা ধক করে ওঠে। মুহূর্তকাল ইতস্তত করে, তার পরই ঘরে ঢুকে দ্বিতীয়বার থমকে দাঁড়ায় রঞ্জিৎ। শয্যার উপরে চিত্রা বসে।

॥ ৩ ॥

একি, চিত্রা, তুমি কতক্ষণ ?

অনেকক্ষণ—

অনেকক্ষণ ?

হ্যাঁ, তুমি যখন ওকে নিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠ, সে সময় তো মেসের দরজায় আমি। ফিরেই যাচ্ছিলাম কিন্তু চাকরটা বললে তুমি নাকি তাকে বলে গিয়েছ ওকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছ।

একটা কথাও বলতে পারে না রঞ্জিৎ। কেমন যেন অসহায় বোবা দৃষ্টিতে চিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু অবলীলাক্রমে যেন কথা বলে যাচ্ছে চিত্রা। কোন রকম রাগ অভিমান দ্বিধা লজ্জা বা বিব্রত ভাবই যেন তার কথায় বা ব্যবহারে বিন্দুমাত্রও প্রকাশ পায় না।

চিত্রা বলে, কিন্তু ওকে তো চিনতে পারলাম না!

ওকে তুমি কখনও দেখ নি তো।

তাই মনে হল। কি নাম ওর ?

উমা।

আত্মীয় ?

না।

পরিচিতা কেউ ?

বলতে পারো।

কখনও তো ওর কথা তোমার মুখে শুনি নি ? কত দিনের পরিচয় ?

হঠাৎ যেন দপ করে জ্বলে ওঠে রঞ্জিৎ। একটু রূঢ় ভাবেই বলে, এত জেরা করছ কেন জানতে পারি কি ?

জেরা! না, না—জেরা করব কেন ? এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

তার পরই যেন সহসা নিভে যায় কিছুক্ষণের জন্য চিত্রা। কোন কথাই বলে না। রঞ্জিৎও কোন কথা বলে না। চুপ করে থাকে।

হঠাৎ এক সময় আবার চিত্রা কথা বলে, কিন্তু কেন এসেছি তা তো কই এক বারও জিজ্ঞাসা করলে না রঞ্জিৎ ?

জিজ্ঞাসা আবার করব কি। তুমি তো বলবেই।

না রঞ্জিৎ, আর কিছু আমি বলব না।

চিত্রার ঐ মুহূর্তের কণ্ঠস্বরে কি যে ছিল, একটু যেন বিস্মিত হয়েই ওর মুখের দিকে তাকায় রঞ্জিৎ।

আজ বুঝতে পারছি সেদিন মৃদুলা ভৌমিক বোধ হয় ঠিকই বলেছে।

মৃদুলা ভৌমিক!

হ্যাঁ, চমৎকার হাত গুণতে পারে মৃদুলা ভৌমিক। সে কি বলেছিল জান?

কি?

আমাদের নাকি বিয়ে হবে না।

রঞ্জিৎ তাকিয়েছিল তখনও চিত্রার মুখের দিকে। হঠাৎ মনে হল যেন রঞ্জিতের চিত্রার চোখের তারা দুটো জলে চিক্ চিক্ করছে।

কি বল, ঠিকই বলেছে সে না?

রঞ্জিৎ চুপ করে থাকে।

কিন্তু একটা কথা সে হাত দেখে আমায় বলতে পারল না, তা হলে আমার কি হবে? আচ্ছা রঞ্জিৎ, তুমিও কি বলতে পার না আমার কি হবে?

চিত্রা—

সত্যি, কি বকর বকর করছি। তুমি হয়তো পরিশ্রান্ত খুব। আচ্ছা রঞ্জিৎ আমি উঠি।

উঠবে?

হ্যাঁ।

সত্যি সত্যিই চিত্রা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে চিত্রা আবার ঘুরে দাঁড়ায়, রঞ্জিৎ—

কি?

কবে কোন্ তারিখে ঠিক হল তা তো কই বললে না আমাকে।

তারিখ!

হ্যাঁ, তোমাদের বিয়ের তারিখ।

:লা অগ্রহায়ণ।

তবে তো আর সময় নেই কি বল?

ও-কথায় যে কি জবাব দেবে রঞ্জিৎ বুঝতে পারে না। এবং জবাব খুঁজে না পেয়েই বোধ হয় মাথাটা নীচু করেছিল।

কিন্তু মুখ তুলে যখন আবার তাকাল দরজার দিকে, চিত্রা তখন চলে গিয়েছে। কখন যে চিত্রা চলে গিয়েছিল রঞ্জিৎ টেরও পায় নি। রঞ্জিৎ ধীরে ধীরে চেয়ারটার উপর বসে পড়ে।

হঠাৎ সেদিন প্রায় মাস চারেক বাদে রাণুর কাছে কলেজে কৃষ্ণ আয়ারের ফোন এল। প্রথমে বুঝতে পারে নি রাণু কে তাকে ফোন করছে। ফোন ধরে কণ্ঠস্বরেও চিনতে পারে নি গলা কার।

কে?

আমি কৃষ্ণ আয়ার।

নমস্কার। এত দিন পরে মনে পড়ল বুঝি?

কিন্তু সে কথা তো আমিও বলতে পারি মিস সেন। আপনিও তো একটা খবর নেন নি।

খবর পাই নি বটে তবে সর্বদাই আপনার মনে পড়ে কিন্তু মিঃ আয়ার। তার পর খবর কি বলুন?

আপনার ঠিকানা বদলেছেন?

হ্যাঁ—গভর্ণমেণ্ট হোস্টেলে উঠে গিয়েছি মাস দুই হতে চলল।

তাই। পুরোনো ঠিকানায় গিয়ে ঘুরে এলাম। তারা সেখানে বলতে পারল না আপনার বর্তমান ঠিকানা।

তাদের তো বলে আসি নি। তারা জানবে কি করে!

আমিও অবিশ্যি কিছু দিন হল ঠিকানা পাল্টেছি।

কোথায়?

নিউ সি. আই. টি স্কিমের ফ্ল্যাটে। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে আমার বিশেষ একটু প্রয়োজন ছিল মিস সেন।

বেশ তো। কোথায় দেখা হতে পারে বলুন?

অনুগ্রহ করে আমার ফ্ল্যাটে কি আসবেন!

বেশ তো। যাব।

কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি।

আজ কলেজের ছুটির পর যেতে পারি। আমার শেষ ক্লাস সাড়ে চারটেয় শেষ হবে।

বেশ, আসুন তা হলে, আমি বাসায় থাকব।

রুক্ষ আয়ার যে দিকটায় থাকে রাণু কখনও সেদিকে বড় একটা যায় নি। তাই আয়ারের ফ্ল্যাটটা খুজে নিতে তার বেশ একটু দেরিই হয়। আয়ারের ফ্ল্যাটে যখন সে গিয়ে পৌছল আবছা আবছা সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে বাইরে। তিন তলায় তিন কামরাওয়ালা একটা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে আয়ার।

উনিশ বছর বয়সের সময় আয়ারের বিবাহ হয়েছিল তার খুড়তুতো বোন লক্ষ্মীর সঙ্গে। কিন্তু বৎসর তিন বাদে আয়ার যখন এম. এ. পড়ছে সন্তান হতে গিয়ে লক্ষ্মী মারা যায়। সেই সঙ্গে সন্তানটিও মারা যায়। আর বিবাহ করে নি আয়ার। মা-বাপ আত্মীয়-স্বজনরা অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু আয়ারকে সম্মত করাতে পারেন নি। এবং স্ত্রীর মৃত্যুর বৎসরখানেক বাদেই প্রথমে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের একটা চাকরি নেয় কলকাতাতেই আয়ার, কিন্তু সে চাকরি বেশী দিন করে নি। বৎসর দুই বাদে সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে অধ্যাপনার কাজ নেয়। কারণ অধ্যাপক হবে সেটাই তার বরাবরের ইচ্ছা ছিল। এত দিন একা মানুষ ছিল। কিছু দিন হল এক বুড়ী মাসী এসে ঘাড়ে চেপেছে। ঐ বুড়ী মাসী ও একটা চাকর।

বেল টিপতেই আয়ার এসে দরজা খুলে দিল, আসুন মিস সেন, এত দেরি হল যে?

আর বলেন কেন, খুঁজতে হল। সে সময় ফোনে আপনার কাছ থেকে একটা ডিরেকশন নিয়ে নিলেই হত।

হাসতে হাসতে রাণু বলে।

ইউ লুক টায়ার্ড মিস সেন, একটু কফি বলি?

না কফি না, চা—জানেন তো কফিতে আমার বড্ড ইনসম্‌নিয়া হয়।

তাই হবে, বসুন আপনি।

রাণুকে একটা সোফায় বসিয়ে আয়ার ভিতরের দিকে চলে গেল।

রাণু চেয়ে চেয়ে দেখছিল। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর ভাবে সাজানো ঘরটি। সব কিছুর মধ্যে যেন একটি রুচির স্পর্শ রয়েছে। বাইরের ঐ ঘরটিই আয়ারের বসবার ও পড়াশুনা করার ঘর। এক ধারে একটি রাইটিং টেবিল ও চেয়ার। খান চারেক মাঝারী সাইজের আলমারিভর্তি নানা ধরনের বই। বেশির ভাগই ইতিহাসের বই। এক দিকে মাঝারী সাইজের একটি সোফা সেট সুন্দর প্লাষ্টিকের ঢাকনা দেওয়া আলোর স্ট্যাণ্ড।

আয়ার এসে পুনরায় ঘরে ঢুকল।

কাল আপনার পুরাতন ঠিকানায় গিয়ে আপনার ঠিকানাটা দিতে পারল না সেখানকার কেউ, কেন বলুন তো? তাদের ঠিকানা দিয়ে যান নি কেন? আয়ার সোফায় মুখোমুখি বসে প্রশ্নটা করল।

জানেন তো ভিড় আমার ভাল লাগে না। মৃদু হেসে বলে রাণু।

তাই বলে একেবারে অজ্ঞাতবাস!

অজ্ঞাতবাস কোথায়, তা হলে কি আপনি আমার ঠিকানা পেতেন? মৃদু হেসে জবাব দেয় রাণু।

রাণুর মনের মধ্যে তখন অনবরত যে চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল অথচ মুখ ফুটে কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছিল না, সেটা হচ্ছে পার্থর চিঠি হয়তো আয়ার পেয়েছে তাই তার খোঁজ করেছে আয়ার। কারণ পাঁচ-ছ মাস অন্তর অন্তর পার্থ আয়ারকে একটা চিঠি দেয়। এবং চিঠি পেলেই আয়ার রাণুর খোঁজ করে। চিঠিটা যদিও পার্থ আয়ারকেই লেখে তবু তার মধ্যে কোন এক জায়গায় রাণুর উল্লেখ থাকেই। এবং চিঠিটা যে আয়ারকে সম্বোধন করে লেখা হলেও আসলে রাণুর জন্যই লেখা সেটা আয়ারও যেমন জানে পার্থও তেমনি জানে।

আয়ার তাই প্রতিবারই গত পাঁচ বছর ধরে পার্থ তাকে যে চিঠি লিখেছে, রাণুকে সংবাদ দিয়ে এনে তাকে পড়তে দিয়েছে। ওদের শেষ বন্ধন বা স্মৃতিটুকু যেন পাঁচ-ছ মাস অন্তর অন্তর লেখা ঐ চিঠিগুলোর মধ্যেই এখনও বেঁচে ছিল লৌকিক ভাবে। যদিও পার্থও যেমন জানত, রাণুও তেমনি জানত অনেক হাজার মাইল দূরের ব্যবধানে তারা পরস্পর থেকে সরে থাকলেও মনের নিভৃতে আজও তারা কাছাকাছি, একান্ত ঘনিষ্ঠ।

ভৃত্য এসে একটা ট্রেতে করে এক কাপ চা ও এক কাপ কফি সামনের ছোট গোল টেবিলটার উপরে নামিয়ে রেখে চলে গেল।

রাণুর মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু আয়ারের মনে হয় রাণুর শরীরটা সেখানে থাকলেও মনটা যেন সেখানে নেই। সে যেন কেমন অন্যমনস্ক, আত্মসমাহিত।

মিস সেন!

অ্যাঁ, চমকে তাকায় সে ডাকে রাণু আয়ারের মুখের দিকে, কিছু বলছিলেন মিঃ আয়ার!

চা দিয়ে গিয়েছে—

হ্যাঁ। চায়ের কাপটা তুলে নেয় রাণু। ধীরে ধীরে চুমুক দিতে থাকে রাণু চায়ের কাপে।

মিস সেন!

বলুন।

কি যেন ভাবছেন বলে মনে হচ্ছে তখন থেকে?

আয়ারের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল রাণু, না, কি আর ভাবব।

কথাটা বলতে বলতে রাণু অর্ধসমাপ্ত চায়ের কাপটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রাখল।

ওকি, চা খেলেন না?

না আর খাব না।

অনেক দিন পরে আপনাকে দেখছি মিস সেন, এই ক মাসে যেন আপনি অনেকখানি রোগা হয়ে গিয়েছেন।

রোগা। কই না?

যাক যে কথা বলবার জন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

রাণু আয়ারের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

আজ দু'দিন হল আপনার মা কলকাতায় এসেছেন—

কে!

যেন ভূত দেখার মতই চমকে উঠে প্রশ্নটা করে রাণু।

আপনার মা। মিসেস গ্লোরিয়া সেন।

কেন?

প্রত্যুত্তরে শুধু ঐ একটি মাত্র কথাই যেন রাণুর কণ্ঠ দিয়ে বের হয়।

তা জানি না। এসেছেন তা জানতামও না, জেনেছি কাল সকালে মাত্র। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আমার আত্মীয় রামস্বামী আপনাদের ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়িটা কিনেছিল?

হ্যাঁ—তা কি?

আপনার মা কলকাতায় এসেই সেই বাড়িতে আপনার খোঁজে যান।

তার পর?

কিন্তু রামস্বামী তো আপনার কোন সংবাদই রাখে না। বাড়ি বেচে দিয়েছেন আপনি—সেও প্রায় চার বছর হল। অগত্যা রামস্বামী গ্লোরিয়াকে সঙ্গে করে গত কাল সকালে আমার এখানে আসে। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা তো সে জানত। তাই আমার কাছে তাঁকে সে নিয়ে আসে।

আপনি, আপনি—বলেছেন নাকি তাকে আমার ঠিকানা?

রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্নটা করে রাণু।

মৃদু হেসে আয়ার বলে, ভয় নেই। যদিও আপনাকে ফোন করার আগে আপনার নতুন ঠিকানা আমি জানতাম না—তবু সেই পুরাতন ঠিকানাও তাঁকে আমি দিই না।

না, দেবেন না। আপনার কাছে কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ রইল—আমার ঠিকানা কাউকেই আপনি দেবেন না মিঃ আয়ার।

না দেবো না।

তার পর দু'জনে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। কেউ কোন কথা বলে না। এক সময় সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে মৃদু কণ্ঠে রাণু ডাকে, মিঃ আয়ার?

বলুন।

কেন সে এসেছে ভারতবর্ষে আর কেনই বা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কিছু জানেন?

না। সে সব কোন কথাই তাঁর সঙ্গে আমার হয় নি মিস সেন।

কিন্তু—

ভয় নেই আপনার। আমি তাঁকে স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছি, আপনার কোন খবরই অনেক দিন আমি আর রাখি না। কি করেন কোথায় থাকেন কিছুই আমি জানি না। এমন কি এ ইঙ্গিতও তাঁকে আমি দিয়েছি—

কি?

আপনি হয়তো বর্ত্তমানে বাংলা দেশেই নেই।

খুব ভাল করেছেন। কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো মিঃ আয়ার।

কিন্তু মিস সেন?

রাণু আয়ারের মুখের দিকে তাকাল।

হয়তো সত্যিই তাঁর আজ আপনাকে প্রয়োজন আছে—

প্রয়োজন?

হ্যাঁ, নচেৎ এত দূর পথ তিনি আপনার খোঁজে আসবেন কেন?

কি প্রয়োজন থাকতে পারে তার আজ আর আমার সঙ্গে! সেও আমাকে চেনে না, আমিও তাকে চিনি না।

যদিও তার সমস্ত কথা আপনার মুখে আমি শুনেছি তবু একটা কথা কি মনে হচ্ছে জানেন?

কি?

তিনি আপনার মা।

সেটা যে আমার জীবনের কত বড় দুর্ভাগ্য সে তো আপনারও আজ আর অজানা নেই মিঃ আয়ার।

তবু বলছিলাম—

না, বাধা দিয়ে আয়ারকে থামিয়ে দিয়েই বলে রাণু, আমার যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স সে আমাদের ছেড়ে চলে যায়—

তবু বলছিলাম কি একটি বার দেখা করতে দোষ কি?

কিন্তু কি হবে দেখা করে মিঃ আয়ার। সত্য তার পেটেরই সন্তান আমি, তাকে মা বলে ডেকেছিও এক দিন কিন্তু তার পর এই ছাব্বিশটা বছর—না, সে সম্পর্ক কবে শেষ হয়ে গিয়েছে। আর সে নিজের হাতেই সে সম্পর্ক আমাদের শেষ করে দিয়ে গিয়েছে। না, না—আজ আর তা হয় না মিঃ আয়ার।

আমাকে বলছিলেন তিনি, গ্র্যাণ্ডে নাকি উঠেছেন। আপনার সঙ্গে কি কথা আছে, সেটা হয়ে গেলেই তিনি নাকি আবার ফিরে যাবেন।

শেষ চেষ্টা বুঝি করে আয়ার কথাগুলো বলে, কিন্তু রাণু যেন একেবারে পাথর, তাকে টলানো যায় না।

তা হলে আজ আমি উঠি মিঃ আয়ার—রাণু বলে।

উঠবেন?

হ্যাঁ, রাত হল উঠি।

চলুন—

রাণু উঠে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে আয়ারও উঠে দাঁড়ায়! নীচে রাস্তায় বাস স্ট্যাণ্ডে এসে রাণুকে বাসে তুলে দেয় আয়ার। বাসে বিশেষ ভিড় ছিল না। এক ধারে একটা সীটে একাই বসে রাণু।

গ্লোরিয়া তার মা। এত কাল পরে হঠাৎ তার কি এমন রাণুর কাছে প্রয়োজন পড়ল যে এই দূর পথ ভারতবর্ষে ছুটে এল সে। এই দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর যে তার এক লাইন লিখেও কোন খোঁজ নেয় নি, সে বেঁচে আছে কি মরে আছে সেটুকু জানবারও যে চেষ্টা মাত্রও করে নি, হঠাৎ আজই বা তার কাছে গ্লোরিয়ার কি এমন প্রয়োজন পড়ল! এত দিন বাদে মনে পড়ল কি তবে তার মেয়ের কথা! কিন্তু কেন, কি জন্য মনে পড়ল!

॥ ৪ ॥

চলন্ত বাসে বসে বসে রাণু নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি বহু দিন আগেকার দেখা কোন এক খানি মুখ স্মৃতির ধুসর পৃষ্ঠাগুলিতে হাতড়াতে থাকে। কোন এক নারীর একখানি মুখ, যে মুখের সঙ্গে হয়তো তারই মুখের আদল ছিল, স্পষ্ট একটা সৌসাদৃশ্য ছিল। কিন্তু কই, আজ আর খুঁজে তো পাচ্ছে না রাণু স্মৃতির পৃষ্ঠায় সে ধরনের কোন এক নারীর মুখ। অথচ আশ্চর্য, সেই নারীই নাকি তার মা।

তারই রক্ত আজ তার দেহের শিরায় বইছে, তারই গর্ভে একদিন স্নেহে হোক হতাদরে হোক তার এই দেহটা তিলে তিলে দশ মাস দশ দিন ধরে বেড়ে উঠেছিল। তারই বুকের দুধ এক দিন সে পান করে তার ক্ষুধা মিটিয়েছিল। তারই শেখানো বিজাতীয় ভাষায় বললেও এক দিন তাকেই সে মা বলে ডেকেছে। তার বুকে পিঠেও হয়তো উঠেছে। একটি নারী আর এক অসহায় অজ্ঞান শিশু।

মনে পড়ল যেন সহসা বাল্যজীবনের একটা দিনের কথা। ঠিক বাল্যজীবন বললে হয়তো ভুলই হবে। বাল্যজীবনের শেষপ্রান্ত কৈশোরের প্রারম্ভ। এবং বাবার সেদিনের কথাগুলো আজও স্পষ্ট তার মনে আছে। তাদের ক্যামাক স্ট্রীটের বাড়ির এঘরে ওঘরে, করিডোরে গ্লোরিয়ার নানা বেশের নানা ভঙ্গীর অনেক ছোট, বড়, এনলার্জ করা সব বাঁধানো ফটো দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙানো ছিল। হঠাৎ এক দিন স্কুল থেকে ফিরে এসে লক্ষ্য করল রাণু, সে সব ফটোর একটাও আর তাদের বাড়ির কোথাও টাঙানো নেই। দেওয়ালের যেখানে যেখানে ফটোগুলো টাঙানো ছিল, সেখানে সেখানে শুধু সাদা দেওয়াল।

মনের মধ্যে কৌতূহল জেগেছে, ফটোগুলো কোথায় গেল? কিন্তু তবু তার বাবাকে শুধাতে পারেনি কথাটা। কেমন যেন ভয় ভয় করেছে। অথচ সেদিন তার বালিকা-মন থেকে মায়ের ছবিটা তখনও একেবারে মুছে যায় নি। মন তার তখনও খুঁজছে যেন তার মাকে। তার পর ক্রমশঃ একটু একটু করে স্মৃতিটুকু ঝাপসা হয়ে আসে। এবং স্মৃতি যখন মুছে গিয়েছে প্রায় এমন সময় অর্থাৎ তার মা ইংলণ্ড চলে যাবার বছর ছয় কি সাতেক বাদে, এক ঘটনা ঘটল।

মা চলে যাবার পর থেকে মার ব্যবহারের ঘরটা বরাবর তালা-বন্ধই থাকত।

সেদিন রবিবার। রবিবার রবিবার ভৃত্য গিয়ে সে ঘরটার তালা খুলে ঘরটা এক বার ঝাড়-পোঁছ করে রাখত। সেদিনও দ্বিপ্রহরে ভৃত্য যখন ঝাড়-পোঁছ করছে ঘরটা, রাণু গিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে কি এক খেয়ালে এটা-ওটা নাড়া চাড়া করতে করতে কখন সে সবের মধ্যেই তন্ময় হয়ে গিয়েছে রাণুও জানে না এবং ভৃত্যের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় রাণু সে ঘরের মধ্যে এটা ওটা নাড়া চাড়া করছে দেখে সেও চলে যায়।

হঠাৎ একটা ড্রয়ারের মধ্যে এটা-ওটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা ফটোর এ্যালবাম রাণুর নজরে পড়ে। এ্যালবামের প্রথম পৃষ্ঠাতেই তার মায়ের একখানা বড় ফটো পেস্ট করা ছিল। নির্নিমেষ নয়নে রাণু ফটোটা দেখতে থাকে। কখন ইতিমধ্যে এক সময় রাধেশ সেন তন্ময় রাণুর পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছেন, সে টেরও পায় নি। বাপের গলা শুনে চমকে ওঠে রাণু।

কি দেখছ রাণু—

অজ্ঞাতেই যেন রাণুর কণ্ঠ দিয়ে কথাটা বের হয়ে যায়, মার ফটো।

কার, কার—ফটো?

দু'পা এগিয়ে আসেন রাধেশ সেন।

থতমত খেয়ে রাণু কথাটার বুঝি পুনরাবৃত্তি করে, মার ফটো।

সহসা হাত বাড়িয়ে এ্যালবামের পাতা থেকে ফটোটা ছিঁড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন রাধেশ সেন এবং কঠিন কণ্ঠে বললেন, না, তোমার কোন দিন কোন মা ছিল না রাণু! তোমার মত মেয়ের মা হবার মত সুকৃতি সে কোন দিন করে নি। চল এ ঘর থেকে—

হাত ধরে অতঃপর রাণুকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিলেন রাধেশ সেন। এবং ঘর থেকে বের হয়ে এসে চাকরকে ডেকে বলেছিলেন ঘরে তালা দিয়ে দিতে। আর নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর যেন কোন দিন সেই ঘর না খোলা হয়।

সত্যিই তার পর আর কোন দিন সে ঘর খোলা হয় নি।

এমন কি রাণু যেদিন রামস্বামীকে বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে চলে আসে সেদিনও ঘরটা বন্ধই ছিল।

সেদিন কিন্তু বুঝতে পারে নি রাণু তার বাপ রাধেশ সেনের সত্যিকার ক্ষোভ বা ব্যথাটা কোথায় ছিল এবং কতখানি ছিল। বোঝবার মত বয়সও অবশ্যি

সেদিন রাণুর ছিল না। কিন্তু বুঝেছিল আর বৎসর দুই পরে। তার বাপের সে কথাগুলো ঘটনাচক্রেই যেন কানে এসেছিল রাণুর। রাণুর বোঝবার মত বয়সও তখন হয়েছে।

রাধেশ সেনের এক বাল্যবন্ধু সেদিন দেখা করতে এসেছিলেন রাধেশ সেনের সঙ্গে। গ্লোরিয়া চলে যাবার পর রাধেশ সেন কোথায়ও বড় একটা বেরোতেনই না। আদালত ও তাঁর নিজস্ব কন্‌সালটিং রুমটাই ছিল যেন তাঁর সব কিছু। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ক্লাব সব কিছু বর্জন করেছিলেন রাধেশ সেন। রাধেশ সেনের বন্ধু অমিতাভ সে খবর রাখতেন না। তারও কারণ ছিল অবিশ্যি। অমিতাভ রায় দীর্ঘকাল বিলেতে কাটিয়ে সেই সময় দেশে ফিরেছেন।

রাধেশ সেনের বছর খানেক পরে অমিতাভ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন। তার পর এক দিন ডিগ্রী লাভের পর সেই খানেই চাকরি করছিলেন। দীর্ঘ সাত বছর বাদে ফিরেছিলেন ইওরোপীয়ান বৌকে নিয়ে। দেশে ফিরে সর্বাগ্রে রাধেশ সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বন্ধুকে সেদিন রাধেশ সেন যে কথাগুলো বলেছিলেন, ঘটনাচক্রে রাণু পাশের ঘরেই থাকায় কথাগুলো তার কানে এসেছিল।

রাধেশ সেন তার বন্ধুকে বলছিলেন, তুমি বলছ তুমি তোমার ইওরোপীয়ান স্ত্রীকে নিয়ে সুখী হয়েছ, ভালই কিন্তু আমার মনে হয় তুমিও বোধ হয় আমারই মত ভুল করেছ।

ভুল করেছি? অমিতাভ শুধান।

হ্যাঁ, হয়তো সে ভুল তোমার এক দিন ভাঙবে। কি জানি ভাই, দুটো একেবারে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাত, ভিন্ন সংস্কার, ভিন্ন সংস্কৃতি। মিল তো ঠিক হতে পারে না। যৌবনের রঙিন চশমায় কি সবটুকু সত্যি ধরা পড়ে না পড়তে পারে! যতই খাপ খাওয়াবার চেষ্টা কর খাপ খায় না, খেতে পারে না।

কেন খাপ খাবে না। একটু সহানুভূতি, একটু সহনশীলতা দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেই খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।

সহনশীলতা যদি বল, সহানুভূতি যদি বল তো সেটা আমারও ছিল। তবু গ্লোরিয়াকে ধরে রাখতে পারি নি।

কিন্তু সবাই তো গ্লোরিয়া নয় রাধেশ।

তা হয়তো নয়, কিন্তু তবু আমি বলব আমাদের নিজের দেশে তো মেয়ের অভাব নেই। কটা চামড়ার সৌন্দর্যের কথাই যদি বল তো তারও অভাব

নেই, তবে কেন আমরা জীবনসঙ্গিনী খুঁজতে সেখানে যাব। আমাদের দেশের এক জন মেয়ের চাইতে তাদের দেশের একটি মেয়ের কি এমন বেশী গুণ আছে! কি এমন শ্রেষ্ঠত্ব তাদের আছে যে আমাদের নিজের দেশের একটি মেয়ের ঘর বাঁধবার সম্ভাবনাকে নাকচ করে তাদের দেশের একটি মেয়েকে ঘরে এনে তুলব।

তুমি যা বলছ রাধেশ সেটা অবিশ্যি অন্য একটা দিক। এবং সেদিক দিয়ে বিচার করতেও আমি চাই না।

চাও না নয় অমিতাভ, ক্ষমতা নেই তোমার।

সে তর্কও নাই বা তুললাম। মৃদু হেসে জবাব দেয় অমিতাভ।

তুলো না। তবে এক দিন বুঝবে জীবনসঙ্গিনী আর সহধর্মিণী এক নয়। যে দেশের মেয়ে ওরা সে দেশে ওদের চোখে এবং শিক্ষায়-দীক্ষায় সঙ্গিনীটাই বড় কথা, সহধর্মিণীর সঙ্গে ওদের পরিচয় নেই, অথচ আমরা যুগ যুগ ধরে তার সঙ্গেই পরিচিত।

আচ্ছা রাধেশ, তোমাদের সেপারেশনের পর তার কি আর কোন খোঁজই তুমি পাও নি?

পাবার চেষ্টাও করি নি আর করবও না বাকী জীবনটা। She is dead to me! আমার কাছে সে মৃত।

সেও কি কোন চিঠি দেয় নি?

না। আর চিঠি পেলেও পড়তাম না।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য নয়, তার সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকলে তুমি বুঝতে সে এক বিচিত্র মেয়েমানুষ। নইলে দশ মাস দশ দিন যাকে গর্ভে ধরেছিল তার কথাই বা সে এমনি করে ভুলতে পারল কি করে? একটা কথা কি মধ্যে মধ্যে ভাবি জান অমিতাভ!

কি?

তার একমাত্র সন্তানের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবার সম্ভাবনাটুকু থেকেও সে নিজেকে বঞ্চিত করে জীবনের শেষ সান্ত্বনাটুকুও সে যে হারাল চিরদিনের মত সে কথাটা কি এক বারও তার মনে হয় না?

বাসে ফেরার পথে অতীত দিনের টুকরো টুকরো ঐ সব কথাগুলোই রাণুর মনের মধ্যে এসে ভিড় করতে থাকে।

সে রাত্রে হোস্টেলে ফিরে অনেকক্ষণ আলো না জেলে অন্ধকার ঘরের মধ্যে চুপচাপ শুয়ে রইল রাণু শয্যায়। ক্রমে রাত বাড়তে থাকে। হোস্টেলের ঘরে ঘরে আলো নিভে যায়। সমস্ত হোস্টেলটা ক্রমশঃ নিঝুম হয়ে যায়। কিন্তু রাণুর চোখে ঘুম আসে না।

গ্লোরিয়ার কথাটা যেন রাণু কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। যে গ্লোরিয়ার সমস্ত কিছু তার জীবনের মধ্যে থেকে একেবারে মুছে গিয়েছে, যে গ্লোরিয়ার মুখের সামান্য একটা রেখা পর্যন্ত আজ আর মনের কোথাও নেই, সেই গ্লোরিয়াই যেন বার বার তার সামনে এসে দাঁড়াতে থাকে।

কেন এল গ্লোরিয়া ভারতবর্ষে। এত কাল পরে হঠাৎ রাণুকে তার কি প্রয়োজন হল। যার সঙ্গে এক দিন স্বেচ্ছায় সে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গিয়েছিল, আজ এত কাল পরে, দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর পরে তার কাছে তার কি এমন প্রয়োজন থাকতে পারে যে সে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভারতবর্ষে এল!

কিন্তু না, গ্লোরিয়ার তার কাছে যে প্রয়োজনই থাক তার গ্লোরিয়াকে কোন প্রয়োজন নেই। কোন গ্লোরিয়াকেই রাণু সেন আজ আর চেনে না, জানে না।

শুধু সেই রাতই নয় পর পর আরও দু'দিন ও দু'রাত রাণু নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে। গ্লোরিয়াকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করে। মন থেকে গ্লোরিয়াকে একেবারে মুছে ফেলবার চেষ্টা করে কিন্তু মনের সমস্ত জোর যেন ধীরে ধীরে কেমন লোপ পেয়ে যায়। কেমন অসহায় হয়ে পড়ে রাণু।

অবশেষে তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরে কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে বের হয়ে পড়ল। একটা ট্যাক্সি নিয়ে গ্র্যাণ্ডের সামনে এসে নামল। অফিসে খোঁজ নিল গ্লোরিয়া তখন হোটেলেই আছে কিনা। এনকোয়ারী অফিসার তখনই ফোনে খোঁজ নিয়ে জানাল, গ্লোরিয়া তখন তার ঘরেই আছে। কোন ঘর কেমন করে যেতে হবে জেনে নিয়ে রাণু দোতলায় উঠে গেল।

বন্ধ দরজা গায়ে মৃদু আওয়াজ করতেই একটু পরে দরজাটা খুলে গেল এবং খোলা দরজার উপরে যে নারী এসে দাঁড়াল তার মুখের দিকে কেমন যেন এক বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে রাণু। সত্যিকারের বয়স সে নারীর যাই হোক না কেন, তার সমগ্র চোখেমুখে ও দেহে যে বয়সের ছাপ পড়েছে, সেটা যেন প্রৌঢ়ত্বের সীমানারও বাহিরে গিয়েছে বলেই মনে হয় ঐ মুহূর্তে রাণুর।

কোঁচকানো কপাল, কোঁচকানো চোখের কোল ও গাল, এক কালের স্বর্ণকেশ আজ একেবারে ধবধবে সাদা। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। পরিধানে গেরুয়া রঙের সিল্কের থান। এবং সব চাইতে যা বিস্ময় তা পরিধানের ঐ গেরুয়া রঙের সিল্কের থান।

পুরু লেন্সের ভিতর থেকে যথাসম্ভব দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে সেই নারী শুধায়, তোমাকে তো আমি চিনতে পারছি না, কে তুমি?

আমি!

হ্যাঁ—

আপনি, আপনি আমাকে চিনবেন না। আপনিই কি গ্লোরিয়া?

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি?

আপনার সঙ্গেই আমি দেখা করতে এসেছি।

তাই না কি? তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, এসো, ভিতরে এসো! বলতে বলতে গ্লোরিয়া একটু সরে গিয়ে রাস্তা ছেড়ে রাণুকে আহ্বান জানায়।

রাণু ভিতরে প্রবেশ করে। সত্যিই তার বুকের মধ্যেটা তখন কাঁপছিল।

টিপ টিপ করছিল বুকটার মধ্যে।

বসো?

রাণু একটা সোফার উপরে বসল। গ্লোরিয়াও তার সামনের সোফাটায় বসল।

চোখের দৃষ্টি আমার অত্যন্ত কমে গিয়েছে, ভাল দেখতে পাই না গ্লোরিয়া বলে।

কি হয়েছে চোখে?

দীর্ঘ দিনের অত্যাচারের ফল।

অত্যাচারের ফল!

হ্যাঁ দীর্ঘ দিন ধরে অত্যধিক মদ্যপানের ফল। কিন্তু যাক সে কথা, তুমি কে তা তো কই বললে না।

আমি—রাণু সেনের বান্ধবী!

কি, কি বললে, রাণুর বান্ধবী তুমি! পরমুহূর্তেই ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় যেন সোজা হয়ে বসে গ্লোরিয়া, কোথায় সে? তুমি—তুমি জান সে কোথায়?

আপনি নাকি মিঃ আয়ারের কাছে তার খোঁজ করেছিলেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—কিন্তু সে কোথায় জান তুমি?

না।

ও, জান না!

না।

হতাশায় যেন ভেঙে পড়ল গ্লোরিয়া। সোফাটার উপরে নিজেকে এলিয়ে দিল।

তবে সে মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করে।

দেখা হয় তার সঙ্গে তোমার?

হয়।

কত দিন আগে তার সঙ্গে তোমার শেষ দেখা হয়েছে?

তা মাস তিনেক আগে হবে।

আবার কবে দেখা হবে আশা কর?

তা ঠিক কিছু নেই, এক মাস হতে পারে, দু'মাসও হতে পারে—

করুণ হতাশায় মুখখানি যেন গ্লোরিয়ার ম্লান হয়ে যায়।

॥ ৫ ॥

কিন্তু আপনি তাকে খুঁজছিলেন কেন? তাঁর কাছে আপনার কি দরকার বলুন তো? আপনার কথা কখনও তার কাছে আমি শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না।

না শোনবারই কথা। তার পর একটু থেমে আবার বলে, জিজ্ঞাসা করলে না তুমি আমি তার কে হই?

হ্যাঁ—

আমি—আমি এক দিন—হয়তো তার কেউ ছিলাম, কিন্তু আজ আর কেউ নই। কথাগুলো বলতে বলতে রাণুর যেন মনে হল, গ্লোরিয়ার গলাটা কেমন ধরে এল। গ্লোরিয়া যেন নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। একটা রুদ্ধ আবেগকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে যাতে করে সেটা না প্রকাশ পায়।

তুমি তো তার বান্ধবী, তাই না?

হ্যাঁ।

সে—সে আমার মেয়ে।

আপনার মেয়ে?

হ্যাঁ! খুব অবাক হচ্ছ কথাটা শুনে, না? সেও হয়তো অবাক হত

তোমারই মত। অবাক কেন শুধু, বিশ্বাসও হয়তো করত না কথাটা। বিশ্বাস করবেই বা কি করে, সত্যিই তো অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা। তবু—it is a fact! সত্যিই সে আমার গর্ভজাত। কিন্তু যাক সে কথা, তার সঙ্গে সত্যিই দেখা করবার আমার প্রয়োজন ছিল। দুটো কারণে প্রয়োজন ছিল।

দুটো কারণে?

হ্যাঁ, প্রথমত ক্ষমা চেয়ে নেব ভেবেছিলাম তার কাছে—

ক্ষমা?

হ্যাঁ, ক্ষমা।

কিসের ক্ষমা?

আজ আমার স্বামী বেঁচে থাকলে তাঁর কাছেই ক্ষমা চেয়ে নিতাম, কিন্তু তিনি আজ নাগালের বাইরে, তাই ভেবেছিলাম তাঁর আত্মজার কাছেই ক্ষমা চেয়ে নেব। অবশ্য বলতে পার সে ক্ষমা তো চিঠিতেই তার কাছ থেকে আমি চেয়ে নিতে পারতাম। চেষ্টা করেছিলাম। গত দু'বছর ধরে বহু বার চিঠি দিয়ে সে চেষ্টা করেছি, কিন্তু একখানা চিঠিও তার কাছে পৌঁছয় নি। প্রত্যেকটি চিঠিই তার রি-ডাইরেকট্ হয়ে আমার কাছেই ফিরে গিয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত এত দূর আমাকে ছুটে আসতে হল।

ক্ষমা চাওয়ার জন্য?

হ্যাঁ। তার কাছে ক্ষমা না পেলে কি জবাবদিহি করব আমি মৃত্যুর পর ঈশ্বরের কাছে গিয়ে। সেও বটে আর দ্বিতীয়ত তার বাপের দেওয়া টাকাগুলো তাকে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত যে আমার নিষ্কৃতি মিলবে না।

তার বাপের দেওয়া টাকা!

হ্যাঁ, শেষ যে টাকাটা তার বাপ আমাকে উইলে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই টাকাটা।

কিন্তু সে টাকা যদি তিনি আপনাকে দিয়েই গিয়ে থাকেন—

দিয়েছিলেন সে তাঁর সৌজন্য, কিন্তু কোন অধিকারে তার সে টাকা আমি নেব বলতে পার?

কিন্তু রাণুই যে সে টাকা ফিরিয়ে নেবে তাই বা আপনি বুঝলেন কি করে? আপনি হয়তো জানেন না তার বাপ তাকে যা দিয়ে গিয়েছিল তাও সে দান করে দিয়েছে।

জানতাম না কিন্তু এখানে এসে আয়ারের মুখেই সে কথা জানলাম। কিন্তু কেন সে এ কাজ করল বলতে পার?

হয়তো তার ঐ অর্থের উপরে আর কোন আ সক্তি ছিল না বলে।

কিন্তু কেন, তাই তো জিজ্ঞাসা করছি। তুমি যখন তার বন্ধু তুমিও কি সত্য কথাটা জান না? তার পর একটু থেমে গ্লোরিয়া আবার বলে, যদি আমার জন্যই হয় তো সে এত বড় ভুলটা করল কেন?

ভুল!

নিশ্চয়ই, আমি তার কে! আমি তো কেউ নই তার।

কিন্তু পৃথিবী তো তা স্বীকার করবে না।

করবে না? কিন্তু কেন করবে না? খুব করবে, খুব করবে। সত্যিই আমি তার কেউ নই। আমার গর্ভে সে জন্মেছিল, it was an accident! একটা দুর্ঘটনা তার জীবনের। আয়ার আরও বলল, সে নাকি সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে যৌবনে যোগিনী হয়েছে। কিন্তু তুমি তো তার বন্ধু—বলতে বলতে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে সহসা গ্লোরিয়া রাণুর একখানা হাত চেপে ধরে।

থর থর করে যেন কেঁপে ওঠে গ্লোরিয়ার হাতে মুষ্টিবদ্ধ তার হাতটা।

আবার যখন তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে তাকে বুঝিয়ে বলো আমি তার কেউ নই। কোন দিন ছিলাম না, আজও নই—বলতে পারবে না, পারবে না বলতে তাকে তুমি একথাটা?

রাণু পাথরের মতই যেন নির্বাক। একটি শব্দ পর্যন্ত তার কণ্ঠ থেকে বের হয় না।

আর টাকাগুলো তোমার কাছে আমি রেখে যেতে চাই—

আমার কাছে?

হ্যাঁ, তোমার কাছে। তাকে তুমি দিও।

না, না, আমি—আমি তা পারব না।

পারবে না!

না, না—তা ছাড়া—তা ছাড়া আমি জানি সে তা নেবে না। সে টাকা সে স্পর্শও করবে না। আচ্ছা আমি যাই—

হাতটা গ্লোরিয়ার মুষ্টি থেকে এক প্রকার টেনেই মুক্ত করে নিয়ে সোফা থেকে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে যায় রাণু।

টলতে টলতে হোটেল থেকে বেরে হয়ে এল রাণু এবং সামনে একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে তাতে উঠে বসল।

কিধার জায়গা ?

হোস্টেলের ঠিকানাটা বলে দিল রাণু। এবং কোন মতে ঠিকানাটা বলে দিয়ে গাড়ির গদিতে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। এতখানি দুর্বল হয়ে পড়বে রাণু কখনও তো ভাবে নি। কোথায় গেল তার সেই দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে তিলে তিলে বুকের মধ্যে সঞ্চিত সেই বিতৃষ্ণা, সেই অবিমিশ্র ঘৃণা। কোথায় গেল তার সেই লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞা। নিমীলিত দুই চক্ষুর কোল বেয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু তখন রাণুর চিবুক ও গণ্ড প্লাবিত করে দিচ্ছে। তার বক্ষের বসন সিক্ত করে দিচ্ছে।

চীৎকার করে যেন রাণু বলতে চায়, না, না, না। কিন্তু কণ্ঠ তার কে যেন রুদ্ধ করে রাখে।

এক হতভাগিনী নারীর কণ্ঠস্বর যেন তার কানের মধ্যে রিম ঝিম রিম ঝিম করে বাজতে থাকে, যে হতভাগিনী সব পেয়েও কিছু পেল না, জীবন-ভোর এক আকণ্ঠ মরুতৃষ্ণা নিয়ে ছটফট করল, পৃথিবীতে যার আপনার বলতে কেউ নেই, কেউ রইল না।

আজ তো কই তার সেই দুঃখ, তার সেই চরম বেদনাকে অস্বীকার করতে পারছে না। ছুটে তার কাছ থেকে চলে এসেও তো কই তার সেই কান্না-ঝরা কণ্ঠস্বরকে সে ভুলতে পারছে না। মুখে তাকে যাই সে বলে আসুক না কেন, মন থেকে তো কই তাকে সে কোন মতেই মুছে ফেলতে পারছে না। সে নিজে নারী বলেই কি আর এক নারীর বেদনাকে সে অস্বীকার করতে পারছে না আজ! কিন্তু কেন, কি দিয়েছে সেই নারী তাকে? কি পেয়েছে সে তার কাছে?

এবার কোন্ দিকে যাব ?

ড্রাইভারের ডাকে চমকে উঠে রাণু। চেয়ে দেখে নির্দিষ্ট জায়গার কাছাকাছি সে পৌঁছে গিয়েছে।

আর যেতে হবে না। এইখানেই রাখো।

ড্রাইভার ট্যাক্সি থামাল। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল রাণু। তার পর শ্লথ পায়ে হোস্টেলের দিকে অগ্রসর হল।

পরের দিন এক মাসের ছুটির একটা দরখাস্ত কলেজে পাঠিয়ে দিয়ে দিল্লীর একটা টিকিট কেটে দিল্লী কালকা মেলে উঠে বসল রাণু। এবং ট্রেনটা ছাড়বার

পর সত্যিই যেন রাণু বুক ভরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয় কদিন পরে।

সে রাত্রে রাণু চলে যাবার পর অনেকক্ষণ গ্লোরিয়া কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। প্রথম থেকেই মেয়েটিকে যে রাণুর বান্ধবী বলে ধরে নিয়েছিল। আর বান্ধবী ভেবেই সে তার সঙ্গে কথা বলে গিয়েছে।

কিন্তু অকস্মাৎ গ্লোরিয়ার যেন চমক ভাঙল যখন টাকাটা দেবার কথায় মেয়েটি বলে উঠল, না, না···আমি পারব না, আমি পারব না।

এবং তার শেষ বিদায় মুহূর্তের কথাগুলো—আমি জানি সে তা নেবে না, সে টাকা সে স্পর্শও করবে না।

গ্লোরিয়ার সমস্ত অন্ধকার মনটা জুড়ে যেন বিদ্যুতের আলোর একটা ঝলকানি দিয়ে গেল অকস্মাৎ। মা হয়েও গ্লোরিয়া তার মেয়েকে চিনতে পারল না! রাণু, রাণুই যে এসেছিল তার কাছে!

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় গ্লোরিয়া, চিৎকার করে ডাকে, রাণু, রাণু—

কিন্তু চিৎকার করলেও কণ্ঠ দিয়ে যেন স্বর বের হয় না।

না, না—এমনি করে সে রাণুকে চলে যেতে দিতে পারে না। কিছুতেই তা সে দেবে না। রাণুকে যেতে দেবে না।

ক্ষমা করে নি রাণু আজও তাকে, ক্ষমা করে নি। নিজের ঘর থেকে বের হয়ে গ্লোরিয়া হোটেলের নীচে চলে এল, কিন্তু কোথায় রাণু! রাণু তখন চলে গিয়েছে।

কেমন করে সে রাণুর দেখা পাবে! রাণু কোথায় আছে তা তো সে জানে না। কেমন করে তা হলে সে রাণুকে খুঁজে বের করবে। হঠাৎ ঐ সময় গ্লোরিয়ার মনে পড়ল আয়ারের কথা। আয়ার নিশ্চয়ই জানে রাণু কোথায় থাকে। সে তাকে মিথ্যা বলেছে। নিশ্চয়ই সে তাকে মিথ্যা বলেছে।

গ্লোরিয়া একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আয়ারের ওখানেই গিয়ে হাজির হল। সন্ধ্যা তখন প্রায় সাতটা। আয়ার গ্লোরিয়াকে দেখে চমকে ওঠে, একি, মিসেস সেন—

ঘরের মধ্যে ঢুকে গ্লোরিয়া তার পুরু লেন্সের ওধার থেকে তাকালো আয়ারের মুখের দিকে।

মিঃ আয়ার—

বলুন!

রাণু আজ আমার সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে গিয়েছিল।

কথাটা শুনে যেন ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে আয়ার, কি বললেন?

রাণু আজ আমার ওখানে গিয়েছিল।

বিশ্বাস করি না আমি মিসেস সেন।

বিশ্বাস আমিও করতে পারি নি বলেই এক বারও কথাটা আমার মনে হয় নি, যতক্ষণ সে আমার ঘরে আমারই সামনাসামনি বসেছিল। মিঃ আয়ার তুমি জান, নিশ্চয়ই তুমি জান সে কোথায় থাকে। দয়া করে আমাকে তার ঠিকানাটা দাও।

আমি আপনার কথা কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না মিসেস সেন। তা ছাড়া সত্যিই আমি তার ঠিকানা জানি না!

জান তুমি। তার ঠিকানা তুমি জান। আয়ার মানুষ ভুল করে, আমিও ভুল করেছিলাম, কিন্তু আজ যদি তার কিছু অন্তত প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই সে সুযোগটুকুও কি তোমরা আমাকে দেবে না? বল আয়ার, প্লীজ, কোথায় থাকে সে বল।

I am sorry, মিসেস সেন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তাকে না জিজ্ঞাসা করে তার ঠিকানা আপনাকে আমি দিতে পারব না।

তুমি, তুমি—তা হলে জান তার ঠিকানা?

জানি। অবিশ্যি প্রথম দিন যখন আপনি এসেছিলেন তখন জানতাম না, কিন্তু এখন জানি। তা হলেও তার ঠিকানা আপনাকে আমি দিতে পারব না কারণ তার কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

তা হলে তার ঠিকানা আমি পাব না!

গ্লোরিয়ার গলায় স্বরে যেন কান্না ঝরে পড়ে। আয়ারের বুকের ভিতরটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে।

গ্লোরিয়া অতঃপর ফিরে দাঁড়ায়, আমি তা হলে চলি—গুড নাইট।

মিসেস সেন—

আয়ারের ডাকে গ্লোরিয়া আবার ঘুরে দাঁড়াল।

আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম প্রথম দিন আপনি আসার পর সে যাতে আপনার সঙ্গে দেখা করে, কিন্তু কিছুতেই তাকে রাজী করাতে পারি নি। তবে আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি আবার কাল আমি চেষ্টা করব—

করবে, সত্যিই তুমি চেষ্টা করবে! সত্যি বলছ?

করব। আপনি কাল এই সময় এক বার আসবেন।

বেশ আসব।

কিন্তু আয়ার পর দিন কলেজ থেকে রাণুর কলেজে ফোন করে জানল সে নাকি দীর্ঘ দিনের জন্য কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছে। তবু বিকেলের দিকে এক বার গেল খুঁজে খুঁজে রাণুর হোস্টেলে, রাণু দেখা করে নি। সে বলে দিয়েছে, সে নেই।

আবার তার ফ্ল্যাটে যখন ফিরে এল সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ঘরে ঢুকেই আয়ার থমকে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে সোফায় বসে আছে গ্লোরিয়া।

আয়ারের পদশব্দে গ্লোরিয়া তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, কি হল মিঃ আয়ার? কি বলল রাণু?

আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিসেস সেন, সে কলকাতায় নেই—

নেই?

না। ছুটি নিয়ে সে কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছে।

ওঃ।

গ্লোরিয়া সোফাটার উপর বসে পড়ল।

তার দু' চোখের দৃষ্টি জলে ঝাপসা হয়ে যায়।

॥ ৬ ॥

মিতালী পরের দিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখল কৃষ্ণা ঘরেই রয়েছে। জানালার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে চুপচাপ বসেছিল কৃষ্ণা। তৈলহীন রুক্ষ মাথার নিবিড় কেশ চেয়ারের পিছনে ছড়িয়ে রয়েছে। বোধ হয় আজ স্নানও করে নি কৃষ্ণা। সকালে যখন অফিসে বের হয় মিতালী, কৃষ্ণা তখনও ঘুমোচ্ছে দেখে তাকে ডাকে নি, জাগায় নি। ভেবেছিল মিতালী ঘুমোক কৃষ্ণা। ঘুমোলে মনটা হয়তো অনেকটা শান্ত হবে।

কৃষ্ণা—

মিতালী কৃষ্ণার পশ্চাতে এসে দাঁড়াল।

কে! ফিরে তাকাল কৃষ্ণা, তুমি—

একি, স্নান-টান কর নি নাকি আজ?

কৃষ্ণা তাকাল মিতালীর মুখের দিকে। এক রাত্রের মধ্যেই যেন অভূতপূর্ব পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে কৃষ্ণার মুখের চেহারার।

যাও ওঠ—স্নান করে এসো। মিতালী আদেশের সুরে বলে।

যাচ্ছি—

যাচ্ছি নয়। এখুনি যাও। ওঠ!

মিতালী কৃষ্ণাকে সঙ্গে করে বাথরুমে পৌঁছে দিয়ে আসে।

স্নান শেষ করে কৃষ্ণা যখন ঘরে ফিরে এল, একটা প্লেটে খান কয়েক বিস্কুট ও এক কাপ গরম চা এগিয়ে দেয় মিতালী।

বলে, নাও চাটা খেয়ে নাও—

কৃষ্ণা বিনা বাক্যব্যয়ে চায়ের কাপটা তুলে নেয়।

সারা দিন উপোসই গেছে বোধ হয়?

কৃষ্ণা কোন জবাব দেয় না।

চা-পানের পর মিতালীই চিরুনি দিয়ে কৃষ্ণার চুল আঁচড়ে দেয়। কৃষ্ণা চুপ করে বসে থাকে।

কি হয়েছে তোমার বল তো যে একেবারে মুষড়ে পড়েছ?

মিতালীর কথায় কৃষ্ণা ওর মুখের দিকে তাকায়, চোখ দুটো তার ছল ছল করছে।

মনে রেখো, এখন তোমাকে শক্ত হতে হবে।

শক্ত!

হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে একটা কথা সত্যি করে বল তো কৃষ্ণা।

কি?

সত্যিই কি তুমি কৃষ্ণেন্দুকে ভালবাস।

জল ভরা চোখে আবার তাকায় কৃষ্ণা মিতালীর মুখের দিকে নিঃশব্দে এবং তাকিয়েই চোখের দৃষ্টিটা নামিয়ে নেয়।

তুমি যে তাকে ভালবেসেছ সেটা আমি ধারণাই করে নিয়েছিলাম কৃষ্ণা, কারণ ভালবাসা না থাকলে কেবল মাত্র দেহের ক্ষুধায় কোন এক পুরুষের হাতে দেহটা তোমার তুলে দেবে সে জাতের মেয়ে তুমি যে নও আমি জানি। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম তুমি যেমন তাকে ভালবেসেছ সেও কি তেমনিই তোমাকে ভালবেসেছে?

মৃদু কণ্ঠে কৃষ্ণা বললে, সে আমাকে ভালবাসে মিতালী!

তাই যদি জান তো তোমার ভয়টা কোথায়? আর কেনই বা কাল তা হলে অমন করে মদ গিলতে গিয়েছিলে?

কৃষ্ণেন্দুর কোন অনুরোধ যে আমি ফেলতে পারি না মিতালী।

আর তোমার অনুরোধ কৃষ্ণেন্দু—?

হয়তো ফেলবে না।

জোর করে তোমার নিজের মত বলতে পারলে না, তাই ঐ 'হয়তো' কথার মধ্যে ব্যবহার করলে। যাক গে, কৃষ্ণেন্দু নিশ্চয়ই সব কথা জানে!

জানে।

তা হলে আর কি, এবারে একটা বিয়ের দিন ঠিক করে ফেল। যদিও আমি আশা করেছিলাম সব কথা জানার পর কৃষ্ণেন্দুই বিয়ের প্রোপোজাল তোমাকে দেবে, তা যখন দেয় নি তোমাকেই বলতে হবে।

বলব।

নিশ্চয়ই কালই যাবে, গিয়ে বলবে।

পরের দিন কৃষ্ণা আর অফিসে গেল না, বিকেলের দিকে সোজা গেল কৃষ্ণেন্দুর ওখানে। কৃষ্ণেন্দু বাসাতেই ছিল।

কৃষ্ণাকে সাদর আহ্বান জানাল, কৃষ্ণা এসো এসো—

কৃষ্ণাকে মিতালী বার বার করে বলে দিয়েছিল, কোন রকম ভণিতা না করে সোজা স্পষ্টাস্পষ্টিই কথাটা জানাবে কৃষ্ণেন্দুকে। কৃষ্ণাও তাই ঘরে ঢুকেই কোন ভণিতা না করেই তার বক্তব্য শুরু করে।

কৃষ্ণেন্দু, কেন এসেছি আজ তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?

কৃষ্ণার গলার স্বরে ঐ মুহূর্তে এমন কিছু ছিল যাতে করে একটু যেন অবাক হয়েই কৃষ্ণেন্দু কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকায়।

কি ব্যাপার?

আমার অবস্থার কথা তো সেদিনই তোমাকে আমি বলেছি, আমি ভেবে দেখলাম, সত্যিই আর আমাদের দেরি করা উচিত হবে না।

কি বল তো?

বুঝতে পারছ না?

না।

বলছিলাম আমার বিয়ের কথা।

বিয়ে!

হ্যাঁ, কাল-পরশুই ব্যাপারটা সেরে ফেলতে হবে।

ওঃ I see, এখনও তুমি সেই বোকা কথা নিয়ে দুশ্চিন্তায় মাথা ঘামাচ্ছ!

কৃষ্ণেন্দু!

বলেছি তো, তোমাকে কিছুই ভাবতে হবে না।

ভাবতে হবে না?

না। যা করবার আমিই করব। ও ভূত মাথা থেকে নামাও তো। চল, নিউ এম্পায়ারে একটা ভাল বই এসেছে, দেখে আসা যাক—

না।

কি না?

ওসব এখন আর আমার ভাল লাগছে না।

ননসেন্স। চল—ওঠ—মনকে তোমার আমি ফ্রেশ করে দেব'খন।

তাহলে তুমি বিয়ে করবে না কৃষ্ণেন্দু!

ডোণ্ট বি সিলি। বিয়ে কোন দুঃখে আমরা করতে যাব। আজকের এই সায়েন্সের যুগে বিয়ের মত দায়িত্ব কোন দুঃখে আমরা বইতে যাব বল তো। দিব্যি কেমন আছি। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, কোন দায়িত্ব নেই—কী সামান্য একটা ব্যাপার তার জন্য তুমি একেবারে মুষড়ে পড়েছ। খবর রাখ কিছু, দেশে কত মেয়েরা বিয়ে না করেও সন্তানের জন্ম দিচ্ছে।

কৃষ্ণেন্দুর কথা শুনতে শুনতে কৃষ্ণা যেন পাথরে পরিণত হয়।

বোবা দৃষ্টিতে কৃষ্ণেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কৃষ্ণা।

বুঝলে ওতে কোন লজ্জা বা অপমানের ব্যাপার নেই। কোয়াইট ন্যাচারাল। অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তোমার কিছু চিন্তা করতে হবে না, পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই আমি একটা ব্যবস্থা করছি। 'হেডেক'টা আমার যখন, আমিই ব্যবস্থা করব। নাও—এখন ওঠ তো—

কৃষ্ণেন্দু আবার তাগিদ দেয়।

আমি, আমি যাই কৃষ্ণেন্দু। কেমন যেন মুহ্যমানের মত উঠে দাঁড়ায় কৃষ্ণা।

যাবে মানে, বসো—বসো—

কৃষ্ণেন্দু হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণার হাত ধরবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার স্পর্শ বাঁচিয়ে সরে যায় কৃষ্ণা, না—তুমি আমাকে ছুঁয়ো না—

কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা সে ডাকের আর কোন সাড়া দেয় না। ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

মিতালীর শরীরটা সেদিন তেমন ভাল না থাকায় সে রাত্রে কিছু খাবে না বলে শয্যায় শুয়ে একটা বাংলা উপন্যাসের পাতা ওল্টাচ্ছিল। কৃষ্ণা এসে ঘরে প্রবেশ করতেই তার পদশব্দে ফিরে তাকাল মিতালী।

কিন্তু ঘরের আলোয় কৃষ্ণার রক্তহীন ফ্যাকাশে মৃতের মত মুখখানার দিকে তাকিয়ে যেন ও চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে শয্যার উপর উঠে বসে বইটা এক পাশে রেখে।

কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা মিতালীর সে ডাকে কোন সাড়া দেয় না।

ঘরে ঢুকে শয্যাটার উপরে ঝুপ করে বসে পড়ল।

শয্যা থেকে নেমে কৃষ্ণার সামনে দাঁড়াল মিতালী, কি হয়েছে কৃষ্ণা?

কেমন যেন অসহায় শূন্য দৃষ্টিতে তাকায় কৃষ্ণা মিতালীর মুখের দিকে।

কি হয়েছে?

আমি কৃষ্ণেন্দুর কাছে গিয়েছিলাম মিতালী।

গিয়েছিলে? কি বললে সে?

সে—সে সব ব্যবস্থা করে দেবে?

ব্যবস্থা করে দেবে। তবে তো খুব ভাল! বিয়ের তারিখ কিছু ঠিক হল।

বিয়ে তো নয়।

তবে, তবে সে কি ঠিক করে দেবে?

সায়েন্সের যুগের মানুষ আমরা আমাদের আবার ভয়টা কি? সব নাকি ঠিক হয়ে যাবে মিতালী। কেমন যেন এলোমেলো ভাবে কথাগুলো বলে কৃষ্ণা।

কি আবোল-তাবোল বকছ কৃষ্ণা!

বিয়ের দায়িত্ব কেউ আবার আজকালকার যুগে নেয় নাকি। ওদের দেশে নাকি হাজার হাজার মেয়ে—অবিবাহিত মেয়ে সন্তানের জন্ম দিচ্ছে—

কৃষ্ণা!

সমস্ত ব্যাপার যেন জলের মতই এতক্ষণে মিতালীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। কৃষ্ণা শয্যার উপর বসে তার শাড়ির আঁচলের প্রান্তটা টানছে। সে দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে মিতালী। সত্যিই যেন কোন বাক্য সরে না মিতালীর মুখ দিয়ে।

স্কাউণ্ড্রেল—ঐ কথা সে বলেছে তোমাকে?

তাই তো বললে?

আর তুমি সেই কথা শুনে চলে এলে? ইডিয়েট, ফুল।

রুদ্ধ আক্রোশে যেন ফেটে পড়ে মিতালী বলে, পায়ে তোমার জুতো ছিল না কৃষ্ণা, সেই জুতোটা পা থেকে নিয়ে কয়েক ঘা সেই ইতরটাকে বসিয়ে দিয়ে আসতে পারলে না। পারলে না গোটাকতক চড় বসিয়ে দিতে তার ত্নু' গালে—

কিন্তু মুখের কথাটা শেষ করতে পারে না মিতালী। হঠাৎ সে যেন থেমে যায় কৃষ্ণার মুখের দিকে ঐ মুহূর্তে তাকিয়ে।

নিঃশব্দ অশ্রুর ধারা কৃষ্ণার দু'চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থাকে মিতালী, তার পর শান্ত কঠিন কণ্ঠে মিতালী বলে, কাঁদছ কেন, কেঁদো না। মুছে ফেল চোখের জল। সে যাবে কোথায়, মেয়ে জাতটাকে ওরা ভেবেছে কি! আমরা কি এতই অসহায়! জোর করে চিরদিন অমনি করে ওদের যৌন ক্ষুধার সমস্ত দায়িত্বটা আমাদের— মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সরে দাঁড়াবে হাত ধুয়ে!

হ্যাঁ, ছাড়ব না ওকে আমরা। ওর তোমাকে বিয়ে করতেই হবে।

না, না—ছি—

ছি মানে!

জোর করে তার ঘাড়ের উপর গিয়ে চেপে বসব? না, না—সে অপমানের জ্জা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না মিতালী।

তার মানে—তুমি তার অন্যায়টা মেনে নেবে!

আমরা যে মেয়েমানুষ!

হ্যাঁ কিন্তু তাদের মতই মানুষ! শোন কৃষ্ণা এমনি করে কিছুতেই তোমাকে ামি কৃষ্ণেন্দুর কাছে ছোট হতে দেব না। আমি কাল তার সঙ্গে দেখা করব।

না, না—ও চেষ্টা তুমি করো না মিতালী। মিথ্যে অপমান হবে কেন?

অপমান!

সমস্ত মুখের রেখাগুলো যেন মিতালীর অদ্ভুত কঠিন হয়ে ওঠে। সে বলে, তালী চক্রবর্তী কৃষ্ণা মৈত্র নয়।

মিতালী!

তুমি আমাকে বাধা দিও না কৃষ্ণা।

কিন্তু লাভ কি! কি লাভ হবে তাতে করে মিতালী! সে যদি আমাকে জ বিয়ে করেও আমার পক্ষে তো আজ আর তাকে নিয়ে ঘর করা সম্ভব নয়!

তবে তুমি কি করবে ?

কি করব।

হ্যাঁ—

তা—তা জানি না।

দিন দুই পরে এক দিন প্রত্যুষে কৃষ্ণার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল হোস্টেলে দোতলার বাথরুমে। বাথরুমের উঁচু জানালার গরাদের সঙ্গে পরিধেয় শাড়ি গলায় বেঁধে আত্মহত্যা করেছে কৃষ্ণা। এবং ঐ দুর্ঘটনার মাত্র দিন কুড়ি বা ঘটল আর এক দুর্ঘটনা।

॥ ৭ ॥

উমার রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা করে যাবার পরের দিনই দ্বিপ্রহরে গোবরডাঙা গিয়ে হাজির হল রঞ্জিৎ। মণিমোহনও তখন বাসাতেই ছিলেন উমা অবি তখন যথারীতি কলেজে গিয়েছে, বাড়ি ছিল না।

রঞ্জিতের আসার সাড়া পেয়ে জগদ্ধাত্রী তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন, খবর রে ?

বসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—

রঞ্জিতের কথার ধরণ দেখে জগদ্ধাত্রীর বুকের মধ্যে কেঁপে পঠে। কে জা রঞ্জিৎ আবার তার মত বদলাল কিনা। তা হলে কারও কাছে আর তিনি মু দেখাতে পারবেন না।

তোমাকে আমি কি বলে গিয়েছিলাম পিসীমা!

কেন ? কি হয়েছে ?

আমি বলি নি কেবলমাত্র শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে তোমরা উমাকে আমার হা তুলে দেবে ?

হ্যাঁ, তা তো বলেছিস। তা হয়েছে কি ?

কোন রকম দানসামগ্রী, অলঙ্কার শয্যা আমি চাই না। আমার স বরযাত্রীও দু-দশ জনের বেশী আসবে না। এর কোন রকম যদি ব্যতিক্রম তো জেনো, বিয়ের আসর থেকে উঠে চলে যাব। উমার বাবাকেও তুমি কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলে দিও। বলো আমি স্বেচ্ছায়ই তাঁর মেয়েকে বিয়ে কর যখন, তখন কেবল মাত্র তাঁর মেয়েটিকেই চাই আর কিছুই আমি চাইও না।

জগদ্ধাত্রী এতক্ষণে যেন নিশ্চিন্ত হন। হেসে বলেন, তাই হবে রে, ত

হবে। তা হ্যাঁরে—একটা কথার জবাব দিবি, সত্যি বলতে হবে কিন্তু—

কি ?

উমা বুঝি গিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করেছিল ?

না তো, কে বললে ?

নিশ্চয়ই দেখা করেছিল আমি জানি। কি শয়তান মেয়ে রে বাবা। আসুক —দেখাব মজা।

উঁহু। এসব কথা তুমি উমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না পিসীমা। সে কথাটাও তোমাকে দিতে হবে।

জগদ্ধাত্রী হাসতে হাসতে বলেন, বেশ, বেশ—

আর একটা কথা শোন, বিয়ের দিন তুই আগে ব্যাঙ্ক থেকে মার গয়নাগুলো তুলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। উমাকে সাজিয়ে দিও সেই গয়না দিয়ে।

আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে। তুই বোস, তোর জন্য আমি চা করে নিয়ে আসি—

না, এখন আমার চা খাওয়ার সময় নেই, এখুনি আমাকে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে, আমি উঠলাম।

না, না—চা খেয়ে যা।

না পিসীমা। চা খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? সম্পর্ক যখন হচ্ছে দিন তো রইলই।

রঞ্জিৎ বিদায় নিয়ে চলে গেল।

রঞ্জিৎ চলে যেতেই ব্যস্ত হয়ে মণিমোহন জগদ্ধাত্রীর ঘরে এসে ঢুকলেন, কি ব্যাপার বড় বৌ, হঠাৎ বাবাজী এসময় এসেছিল যে ?

জগদ্ধাত্রী ঘটনাটা খুলে বলেন, তুমি বাপু ওসব বন্ধক-টন্ধকের ব্যাপারে তা হলে আর যেও না ঠাকুরপো।

কিন্তু বড় বৌ—

না, না—এরা আজকালকার ছেলেমেয়ে, শেষকালে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

বেশ। তুমি যখন বলছ।

হ্যাঁ, নমো নমো করেই বিয়ে সেরে দাও।

মণিমোহন বললেন, তাই হোক তবে।

মণিমোহন কিন্তু মনে মনে রঞ্জিৎকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারলেন না।

সত্যিই যে লোকের কাছে দোকান বন্ধক দিতে যাচ্ছিলেন টাকার জন্য

তাকে বিশ্বাস নেই। শেষকালে হয়তো সে তাঁকে পথেই দাঁড় করিয়ে ছাড়ত।

লেক অঞ্চলের সেই দু-কামরাওয়ালা ফ্ল্যাটটাই ঠিক করে ফেলে রঞ্জিৎ। নবপরিণীতা বধূ উমাকে নিয়ে সে মেসের ঐ হাটে কখনই এসে উঠবে না। ফ্ল্যাট ঠিক করে, ঘুরে ঘুরে সব ফার্নিচার ও খুঁটিনাটি জিনিসপত্র কিনে রঞ্জিৎ তার ফ্ল্যাট সাজাতে থাকে। উমাকে সে নিয়ে এসে একেবারে তাক লাগিয়ে দিতে চায়।

দিন দশেকের ছুটিই নিয়েছিল রঞ্জিৎ অফিস থেকে। পরিচিত বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মী কাউকেই জানতে দেয় নি রঞ্জিৎ যে সে বিবাহ করছে। এমন কি মেসে পাশের ঘরের কবি বারীনকে পর্যন্ত জানায় নি। গোপনে গোপনে সব ব্যবস্থা করেছিল রঞ্জিৎ। বিয়ের আর মাত্র দিন পাঁচেক বাকী।

দুপুরের দিকে আহারাদি সেরে চলে যেত রঞ্জিৎ নতুন ফ্ল্যাটে, তার পর রাত আটটা-নটা পর্যন্ত সেখানেই থাকত। ঘর সাজানো যেন তার আর কিছুতেই মনের মতন হয় না। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জিনিসগুলো কেবল নাড়াচাড়া করে। মেসের চাকরটা একটা রাতদিনের ঝি ঠিক করে দিয়েছে, বেশ বয়স হবে। তার সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে বিয়ের দিন সকাল থেকেই সে কাজে লাগবে। সেদিনও নিয়মিত এসে ঘর সাজাচ্ছিল রঞ্জিৎ।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আলো জ্বেলে নতুন রেডিও-সেটটা চালিয়ে দিয়ে একটা রকিং চেয়ারে গাটা ঢেলে দিয়ে দুলছিল চোখ বুজে রঞ্জিৎ খুশির আনন্দে। রেডিওতে এনায়েত খাঁর সেতার বাজছিল।

হঠাৎ পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর কানে যেতেই যেন ধড় মড় করে উঠে বসে রঞ্জিৎ।

বাঃ বেশ সুন্দর সাজিয়েছ তো ঘর।

ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল।

পর্দা তুলে কখন যে ঘরে এসে ঢুকেছে চিত্রা ও জানতেও পারে নি। কোন শব্দই পায়নি রঞ্জিৎ। রঞ্জিৎ যেন বোবা বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে চিত্রার মুখের দিকে। ঘটনার আকস্মিকতা তাকে একেবারে পাথর করে দেয়।

মনে হচ্ছে যেন ভূত দেখেছ? মরি নি, ভূতও নই। রক্তমাংসেরই—

ফ্যাল ফ্যাল করে তখনও চেয়ে আছে রঞ্জিৎ চিত্রার মুখের দিকে।

অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই যেন চিত্রা ঘরে এসে একটা চেয়ারে

উপবেশন করল। চারিদিক ঘরের চোখ বুলিয়ে দেখল। দেখা তো নয় যেন তার কত জন্মের তৃষ্ণা মিটোচ্ছে চিত্রা। এমনি একটি ছিমছাম সাজানো-গোছানো মনের মত নিরালা ঘরেরই কি সে এই দীর্ঘ সাড়ে ছয় বছর ধরে স্বপ্ন দেখেছিল, যে ঘরে সে নতুন করে সংসার পাতবে? সংসার বাঁধবার যে হাহাকার তার জীবনে ছিল, যে তৃষ্ণা তার কোন দিন মেটেনি, এমনি একটি ঘরে সেই সংসার সেই তৃষ্ণা সে মিটাবে কি ভাবে নি? চোখের কোলে বুঝি জল আসছিল চিত্রার। কিন্তু আজ আর কাঁদতে সে আসে নি। ছি, কাঁদবে কেন। আর কার সামনেই বা কাঁদবে।

সত্যি তোমার সুন্দর রুচির প্রশংসা না করে পারছি না রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ তাকাল চিত্রার মুখের দিকে।

সত্যি, যে আসছে তোমার ঘরে বৌ হয়ে সে খুশীই হবে। কিন্তু আমার কাছে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা গোপন করলে কেন রঞ্জিৎ?

গোপন?

হ্যাঁ, এ চাতুরির তো কোন প্রয়োজন ছিল না। আমাকে বললে দেখতে নিজেই আমি এসে তোমার ঘর সাজিয়ে দিয়ে যেতাম।

চিত্রা!

কি?

আমি মানে—

না, না—কৈফিয়েত আমি চাই না তোমার কাছে রঞ্জিৎ। তুমি সুখী হও, বিয়ে করে তুমি সুখী হও। যে আসছে তোমার বৌ হয়ে সে সুখী হোক। সর্বান্তঃকরণে সেই প্রার্থনাই জানাচ্ছি আজ আমি ভগবানের কাছে। তার পর একটু থেমে আবার বলে, আমাকে নিমন্ত্রণ করবে তো তোমার বৌভাতে?

আস যদি খুশী হব।

সত্যি বলছ!

নিশ্চয়ই।

তবে আসব। আসব বৈকি! কিন্তু কি পরিচয় তার কাছে আমার দেবে বল তো?

পরিচয়!

হ্যাঁ, পরিচয়। বৌ যখন তোমায় জিজ্ঞাসা করবে, এ কে! কি বলবে? মনে রেখো, মেয়েদের মন কিন্তু স্বামীর প্রাক্‌বিবাহ কালের বান্ধবীদের ব্যাপারে

চিরদিনই সন্দিগ্ধ। কথাটা বলতে বলতে হেসে ফেলে চিত্রা এবং হাসতে হাসতে বলে, না, না—ভয় নেই, সে রকম বিপদে তোমাকে কি চিত্রা ফেলতে পারে! যাক, বড় খুশী হয়েছি। তুমি যে সত্যি, সত্যিই শেষ পর্যন্ত ঘর বাঁধতে চলেছ জেনে খুব খুশী হয়েছি। আচ্ছা আজ আমি উঠি—

চিত্রা যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। এগিয়েও যায় দরজার দিকে।

পিছন থেকে ঐ সময় হঠাৎ ডাকে রঞ্জিৎ, চিত্রা—

পিছন ফিরে দাঁড়াল চিত্রা, কি?

দু'জনে পরস্পর কিছুক্ষণ দুজনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে নিঃশব্দে।

কিছু বলবে?

না।

তা হলে চলি! নেমন্তন্ন করো কিন্তু—

কথাটা বলে চিত্রা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

রেডিও চলছিল।

এনায়েত খাঁর সেতার শেষ হয়ে তখন কার যেন রবীন্দ্র-সংগীত শুরু হয়েছে—

কেন রে এই দুয়ারটুকু তোর পার হতে সংশয়।

আগেই জেনেছিল চিত্রা, সেই দিনই সন্ধ্যালগ্নে উমার সঙ্গে রঞ্জিতের বিয়ে। সে দিনটা ছুটি নিয়েছিল অফিস থেকে চিত্রা।

কেন যে ছুটি নিয়েছিল আগের দিন চিত্রা নিজেও তা ভাল করে বোঝে নি। তবু ছুটি নিয়েছিল। মনের ভিতর থেকে যেন ছুটি নেবার অদ্ভুত একটা তাগিদ অনুভব করেছিল চিত্রা। ছুটি মানে নিজের একান্ত নিজস্ব করে কিছুটা সময়। সমস্ত মনটা সত্যি যেন চিত্রার কেমন শূন্য, ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বিচিত্র একটা অনুভূতি যেন মনটা কেমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, আনন্দ নেই, ব্যর্থতা নেই, সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। অকস্মাৎ সব যেন মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। সব যেন অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। কি আশা করেছিল সে অথচ কি যে পেল না সেটা যেন নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। একটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে অনুভূতি। তিন রাত ঘুমোয় নি চিত্রা। কেবল সেই অস্পষ্ট ধোয়াটে অনুভূতির মধ্যে যেন কি একটা হাতড়ে হাতড়ে ফিরছে। একটা বুঝি অবলম্বন, একটা বুঝি আশ্রয়। কেবল দাঁড়াবার মত একটু শক্ত মাটি যেন। একটু হাওয়া, যে হাওয়া সে বুক ভরে নিতে পারে। একটু আলো, যে আলোয় কিছু অন্তত চোখে পড়ে। কিন্তু কিছুই সে পায় না।

বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা হাঁপ ধরে।

কোথাও শান্তি নেই যেন। না অফিসে না হোস্টেলে। না নির্জনতায়, না কোলাহলে। না একক না দশ জনের ভিড়ের মধ্যে। দুটো দিন দুটো রাত সেই অনুভূতির মধ্যে যেন চিত্রা নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিল। তার পরই যেন একটা ভূত তার কাঁধে এসে ভর করে। সে ভূতটা যেন কেবলই সামনের দিকে তাকে ঠেলতে থাকে। কে যেন অদৃশ্য কণ্ঠে কানে কানে তাকে বলতে থাকে, এখানে নয়, এখানে নয় চিত্রা। এই পরিচিত জগৎ এই পরিচিত জন—চেনা মুখ এদের মধ্যে আর নয়।

সকলেই এরা আজ তার মুখের দিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে। এদের সকলের কৃপার পাত্রী হয়ে এদের কাছাকাছি আর থাকা নয়। এদের থেকে দূরে অনেক দূরে। কিন্তু কোথায় সেটা? এ জগৎ নয়। তবে কোথায়? অন্য কোন এক জগৎ কি? কেমন সে জগৎটা! সেখানেও কি এখানকার মতই অনেক মানুষ আছে! কেমন তারা দেখতে!

এ জগতের ব্যথা-বেদনা কি সে জগতে গিয়েও বোধ করতে হয়। এ জগতের দুঃখ কি সে জগতে গিয়েও অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে! মধ্যে মধ্যে কেমন যেন একটা ভয় ভয় করে চিত্রার কথাটা ভাবতেও। কিন্তু আবার মনে হয়, ভয়টাই বা কিসের। এক দিন তো এ জগৎ থেকে সকলকেই সে জগতে পা বাড়াতে হয়। কত জন তো স্বেচ্ছায় সে জগতে চলে যায়। এই তো সে দিন কৃষ্ণাও চলে গেল। কেন যায়? নিশ্চয়ই এ জগতের দুঃখ সে জগতে পৌঁছয় না বলেই যায়।

সর্বক্ষণ যেন চিত্রার চারপাশে আবছা আবছা কারা এসে দাঁড়ায়। ফিস ফিস করে কারা যেন কানের কাছে কি সব তাকে বলে। চিত্রা ভাল করে বুঝতে পারে না। তবু আশ্চর্য, তারা যেন একটা নেশা ধরিয়ে দিয়েছে চিত্রার মনে। তার সমস্ত মনে যেন কেমন একটা ঘোর লেগেছে। এবং সেই নেশার মধ্যেই, সেই ঘোরের মধ্যেই কোথা থেকে যেন আসে চিত্রার মনের মধ্যে ক্ষমা। সে ক্ষমা করে সকলকে। যে যেখানে ছিল, যার প্রতি এতটুকুও কোন দিন বিদ্বেষ ছিল, তাকে পর্যন্ত মনে মনে চিত্রা ক্ষমা করে! এমন কি রঞ্জিৎকে পর্যন্ত ক্ষমা করে। বার বার মনে মনে উচ্চারণ করে, ক্ষমা করেছি, সকলকে আমি ক্ষমা করেছি, সকলকে।

চিত্রার রুম-মেট সুধীরা চ্যাটার্জী। সুধীরা রেলওয়েতে চাকরি করে।

সেদিন সকাল বেলা অর্থাৎ রঞ্জিতের বিয়ের তারিখে—বেলা নটায় সেদিন তার ডিউটি বলে আটটায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, চিত্রা তার সামনে এসে দাঁড়াল।

বেরুচ্ছ সুধীরা ?

হ্যা—ডিউটি আছে আজ সকাল থেকে চারটে পর্যন্ত।

আমার একটা কাজ করে দেবে ভাই ?

কি কাজ ?

বিশেষ একটা জরুরী কাজে আজই দুপুরের ট্রেনে অফিস থেকেই কৃষ্ণনগর যেতে হচ্ছে, নচেৎ তোমাকে কষ্ট দিতাম না—

কি বল না।

আমার এক আত্মীয়ের গোবরডাঙায় আজ বিয়ে। তাকে আমি কিছু প্রেজেনটেশন পাঠাতে চাই। যদি তুমি ছুটির পর মানে তোমার তো শিয়ালদাতেই ডিউটি, গোবরডাঙায় সেই আত্মীয়ের বাড়িতে জিনিসটা একটু পৌঁছে দিয়ে আস ভাই—

কিন্তু—

খুলেই বলি তোমাকে ভাই। কতকগুলো গয়না, অনেক টাকার ব্যাপার। যার তার হাত দিয়ে তো পাঠানো সম্ভব নয় অথচ আমারও গিয়ে দিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে না—

গয়না !

হ্যা। যদি তুমি গয়নাগুলো সেখানে একটু পৌঁছে দাও—

কি গয়না ?

বাক্স থেকে একটা ছোট চামড়ার এটাচি কেস বের করে আনল চিত্রা। এটাচি কেসের ডালাটা চাবি দিয়ে খুলতেই সুধীরার চোখ চোখ দুটো যেন বড় বড় হয়ে যায়। ছোট এটাচি কেসটা ঠাসা একেবারে গয়নায়। চুড়ি, বালা, কঙ্কন—নেকলেস—জরোয়ার একটা সেট—অন্তত কম পক্ষে আট-ন হাজার টাকার গয়না তো হবেই।

ডালাটা বন্ধ করে চাবি দিতে দিতে চিত্রা বলে, যদি পৌঁছে দাও ভাই, বড্ড উপকার হয়।

বেশ। দেবো।

আঃ বাঁচলাম। একটু অপেক্ষা কর তুমি, এখুনি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি

—যার নামে চিঠিটা দেবো তার হাতে চিঠিটা আর গয়নাগুলো পৌঁছে দিয়ে এলেই হবে।

বেশ।

রঞ্জিতের নামে একটা চিঠি লিখে খামে ভরে, খামের মুখটা এটে চিঠিটা ও এটাচি কেসটা চিত্রা সুধীরার হাতে তুলে দিল।

দেখো, অন্য কারও হাতে যেন না পড়ে।

তাই হবে।

এটাচি কেসটা ও চিঠিটা নিয়ে সুধীরা বের হয়ে গেল।

॥ ৮ ॥

মাত্র দিন পনের হল চিত্রার রুম-মেট হয়ে সুধীরা এসেছে। বয়সে তার চাইতে সুধীরা চার-পাঁচ বছরের ছোট তো হবেই, তারও বেশী হবে।

ভারি সাদাসিধে খোলাখুলি মেয়েটি। সামান্য পরিচয়েই সুধীরাকে ভাল লেগেছিল চিত্রার। বিয়ে হয়েছিল সুধীরার। বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়। গরীবের ঘরের—অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে সুধীরা। ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে আই. এ. পড়তে পড়তেই বিবাহ হয়েছিল। কারণ সুধীরার দেহে রূপ ছিল, যে রূপ তার স্বামী অভয়পদকে আকৃষ্ট করেছিল।

অভয়পদ ভালই চাকরি করত। রেলওয়েতে শ' চারেক টাকা মাইনে পেত। মধ্যবিত্ত দরিদ্রের ঘর থেকে অভয়পদর ঘরে এসে যেন সুধীরা হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সুধীরার মেয়ে নীপার যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স, বাসের তলায় চাপা পড়ে অভয়পদ মারা গেল। সুধীরা যেন চোখে অন্ধকার দেখে। বাপের অবস্থা এমন নয় যে সেখানে ফিরে যেতে পারে, তা ছাড়া গত কয়েক বছর অভয়পদ প্রাচুর্যের মধ্যে রেখে সুধীরার মনটাও বিগড়ে দিয়ে গিয়েছিল। দারিদ্র্যের মধ্যে ফিরে যাবার কথা ভাবতেও যেন সে শিউরে উঠেছিল।

এমন সময় তার জীবনে এল অনিরুদ্ধ চৌধুরী। সাহিত্যিক অনিরুদ্ধ চৌধুরী। সাহিত্যজগতে সবে তখন সে আবির্ভূত হয়েই রাতারাতি দশ জন বন্ধুর পাবলিসিটির জোরে একটা আসন করে নিয়েছে। সাহিত্য করলেও অনিরুদ্ধ চৌধুরীর ওটা ছিল পেশা নয় নেশা। পেশা ছিল তার বাপের রেখে যাওয়া শাঁসালো হার্ডওয়্যারের বিজনেস। কলকাতায় একখানা বড় বাড়ি ও ব্যাংকে নগদ টাকা।

আরও কিছু ছিল অনিরুদ্ধ চৌধুরীর, দৈহিক রূপের একটা ঔজ্জ্বল্য এবং সে ঔজ্জ্বল্যকে উজ্জ্বলতর করে রাখত সর্বদা অনিরুদ্ধ তার ছিমছাম রুচি-দুরস্ত দামী বেশভূষায় ও চলনে-বলনে। হাতে সর্বদা ৫৫৫-এর একটা টিন, উন্নাসিক কথাবার্তা—বৈশিষ্ট্য ছিল বৈকি একটা অনিরুদ্ধের চরিত্রে। সুধীরা মধ্যে মধ্যে মাসিকে সাপ্তাহিকে কবিতা লিখত এবং সেই সূত্রেই এক ছোটখাটো সাহিত্যের আসরে দুজনার পরিচয়। পরিচয় পর্যবসিত হয় ঘনিষ্ঠতায়। আজও সে ঘনিষ্ঠতা অটুট। এবং অনিরুদ্ধেরই চেষ্টায় বছর খানেক আগে সুধীরা রেলওয়েতে চাকরিটা পেয়েছিল। তার পূর্বে অবিশ্যি বেশ কিছু দিন সুধীরা ও তার মেয়ের যাবতীয় খরচ অনিরুদ্ধই বহন করে এসেছে। দীর্ঘ তিন বছরের আলাপ ও ঘনিষ্ঠতায় সুধীরা অবিশ্যি একটা কথা নিঃসংশয়ে বুঝেছিল, আর যাই করুক, অনিরুদ্ধ তাকে বিবাহ করে সংসার পাতবে না। অথচ প্রত্যেক নারীরই জন্ম-গত যে আকাঙ্ক্ষা, ঘর বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা, সুধীরার সেটা ছিল। এবং অভয়পদই এক দিন তার মনের মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা তীব্র করে দিয়ে গিয়েছিল।

সুধীরা তাই বরাবরই এমন এক জনকে খুঁজছিল যাকে নিয়ে আবার সে সংসার পাততে পারে। তা সে অভয়পদর মত পাত্র না হলেও তার কোন আপত্তি ছিল না। কারণ আজ সে নিজেও রোজগার করছিল। নীপার জন্য তার আর কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। নীপাকে সে একটা বোর্ডিংয়ে রেখে দিয়ে-ছিল। নিয়মিত টাকা পাঠাত বোর্ডিংয়ে, মধ্যে মধ্যে দেখাও করত মেয়ের সঙ্গে কিন্তু কোন ঘনিষ্ঠতা মেয়ের দিক থেকে সে আজ পর্যন্ত গড়ে উঠতে দেয় নি। বরাবরই মেয়ের সঙ্গে একটা ছাড়া ছাড়া ভাব রেখেছিল। যাতে করে আবার যদি সে বিবাহ করেই, নীপার দিক থেকে যাতে তার কোন দুশ্চিন্তা না থাকে।

গয়নার এটাচি কেসটা নিয়ে সুধীরা হোস্টেল থেকে বের হয়ে সোজা একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে স্টেশনে চলে এল। স্টেশনে এসে সুধীরা কিন্তু ডিউটিতে গেল না। ওদের যে স্টেশনে অফিসের ওয়েটিং রুম, সেই রুমে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

হোস্টেলে মুহূর্তের জন্য তার চোখের উপরে চিত্রা ঐ এটাচি কেসটার ডালাটা খোলায়, মধ্যস্থিত দামী গয়নাগুলোর যে ঔজ্জ্বল্য তার চোখের দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, সেটা তখনও তার কাটে নি। বার বার তার চোখের উপরে যেন ভেসে ভেসে উঠছিল সেই দামী দামী গয়নাগুলো। গয়নাগুলো চিত্রা তাকে

দিয়েছে এক জনকে তার বিবাহের যৌতুক হিসাবে পৌঁছে দিতে। যৌতুক! এত টাকার গয়নার যৌতুক!

কিন্তু কে সে যাকে চিত্রা তার বিবাহে এত মূল্যবান যৌতুক দিতে পারে। কেমন যেন একটা কৌতূহল অনুভব করে সুধীরা। যে চিঠিটা দিয়েছিল চিত্রা তাকে পৌঁছে দেবার জন্য, সেই চিঠিটা ভ্যানিটি ব্যাগের ভিতর থেকে বের করল। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে চিঠিটা খুলল।

রঞ্জিৎ,

এক দিন তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখে স্বামী কন্যা সংসার সমাজ সব পিছনে ফেলে গৃহস্থ বধূ আমি চলে এসেছিলাম ঘরের বাইরে। ভাবতেও পারবে না তুমি এক জন নারী—এক জন মেয়েমানুষ এত বড় অনিশ্চিতের পথে কত বড় আশায় আর দুঃসাহসে পা বাড়ায় বা পা বাড়াতে পারে। তার পর এই দীর্ঘ ছ'বছর ধরে, বিশ্বাস করতে পারবে কি, সেই আশাই আমাকে সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত অপমানের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াবার দুঃসাহস যুগিয়েছে। কিন্তু যাক সে কথা। ওসব কথা তোমাকে শুনিয়ে আমার যেমন লাভ নেই, তোমারও তেমনি নিশ্চয়ই শুনে আজ লাভ নেই।

কারণ কি মূল্য আজ আছে তোমার কাছে এক দুর্ভাগিনী নারীর চরম দুঃখ ও লজ্জার। তা ছাড়া তুমি আজ যে নতুন জীবনের পথে পা বাড়াতে চলেছ সে জীবনকে আমি কেন আমার চোখের জলে অমঙ্গল আর লজ্জা দিয়ে অপমানিত করব। সে জীবন তোমার সুখের হোক, আনন্দের হোক এই প্রার্থনাই জানাই সেই অদৃশ্য জীবন-দেবতার কাছে। এবং সেই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে যে গয়নাগুলো পরে এক দিন জীবনের আমার সর্বাপেক্ষা রমণীয় দিনটিকে তোমার হাতে হাত রেখে সুন্দর করে তুলব ভেবেছিলাম, সে গয়নাগুলো তোমাকেই পাঠালাম। তোমার বধূ যদি এই গয়নাগুলো একটি দিনের জন্য গায়ে পরে তো জানব সত্যিই আমি সার্থক হলাম। সুখী হও। তোমরা সুখী হও।

ইতি—চিত্রা

আশ্চর্য!

চিঠিটা পড়তে পড়তে কিন্তু হেসে ফেলে সুধীরা। এমন বোকাও কেউ হয়! স্বামী সংসার ফেলে বের হয়ে এসেছিল এক দিন আর এক জনকে নিয়ে সংসার বাঁধবে বলে। ভালবেসে বের হয়ে এসেছিল।

এই ভালবাসার কথাটা মনে হলেই সুধীরার কেমন যেন হাসি পায়। এই

যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে কেতাবী স্বপ্ন নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজের লুকোচুরি খেলা, নিজেকেই নিজের অহেতুক প্রতারণা করা, সুধীরা যখনই ভেবেছে মনে মনে না হেসে পারে নি। বাঁচার সংগ্রামেই মানুষ সর্বশ্রান্ত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, তার মধ্যে ঐ স্বপ্ন দেখার সময় যে কখন আসে সত্যি ভেবে পায় না সুধীরা।

কিন্তু বেশীক্ষণ চিত্রাকে নিয়ে হাসবার সময়ও পায় না বুঝি সুধীরা। মনের কোণে কিছুক্ষণ আগে থাকতে যে প্রলোভনের একটা কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল ধীরে ধীরে, সেটা ইতিমধ্যে তার সমস্ত মনটাকে একেবারে কালো করে ফেলেছে। সুধীরার সমস্ত সত্তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। চিত্রা রঞ্জিতের ঐ নববধূকে যৌতুক দেবার জন্য তার হাতে যে গয়নাগুলো দিয়েছে, তার থেকে কিছু যদি সে সরিয়েই রাখে তো ক্ষতি কি। দিয়েই তো দিচ্ছে সে। তার থেকে সামান্য যদি সে নেয়ই, সেটাও তো দানই হবে চিত্রার।

তা ছাড়া গয়নার তো কোন ফর্দ চিঠির মধ্যে দেয়নি চিত্রা যাতে করে রঞ্জিৎ তার কাছ থেকে গয়নাগুলো নেবার সময় সেই ফর্দ দেখে মিলিয়ে নেবে। মিলিয়ে যে রঞ্জিৎ নেবে সে সুবিধা বা সময়ই বা সুধীরা তাকে দিতে যাবে কেন? চিঠিটা আর এটাচি কেসটা তার হাতে পৌঁছে দিয়েই সে চলে আসে! চিত্রা যদি পরে তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাই করে, সে স্পষ্ট জবাব দেবে, এটাচি কেসটা সে পৌঁছে দিয়ে এসেছে নিজের হাতে। কোন কিছু তার থেকে খোয়া যেতে পারে না। আর খোয়া যদি গিয়েই থাকে তার জন্য নিশ্চয়ই সুধীরা দায়ী নয়।

সুধীরাকে কি চিত্রা অবিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসই যদি করে তো তার হাতে দিয়ে গয়না সে পাঠাতেই বা গিয়েছিল কেন? নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলেই তো পারত বা অন্য কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই তো পারত। ছি ছি, এ ব্যাপার হবে জানলে নিশ্চয়ই ওর মধ্যে যেত না।

মিথ্যাই সুধীরা ভাবছে। তেমন কোন পরিস্থিতি হলে সে পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াবার মত বুদ্ধি আছে সুধীরার। সুধীরা মনে মনে সঙ্কল্প নেয়। কি করবে সে স্থির করে ফেলে। ঘণ্টাখানেকের ছুটি নিয়ে সুধীরা বাইরে বের হয়ে এসে একটা ট্যাক্সিতে উঠে ট্যাক্সিওয়ালাকে হোস্টেলের ঠিকানায় চালাতে বলল।

হোস্টেল থেকে বের হয়ে চিত্রা হাঁটতে হাঁটতে এক সময় লেকে গিয়ে উপস্থিত হল। অনির্দিষ্ট ভাবে কিছুক্ষণ হাঁটল এদিক ওদিক। সেই ভূতটা যেন মনের

মধ্যে চেপে বসেছে। অশরীরী এক কণ্ঠস্বর কেবলই যেন তার কানের কাছে ফিস ফিস করে করে বলে : চল, চল—এখানে নয়, এখানে নয়। এখানকার কাজ তোর ফুরিয়েছে। বোকার মত কেন মিথ্যে আর সময় নষ্ট করছিস।

একটা দুর্দমনীয় অদৃশ্য ইচ্ছাশক্তি যেন চিত্রাকে সীমাহীন অনিশ্চিত এক অন্ধকারের দিকে ঠেলতে থাকে। তার সমস্ত চেতনা, সমস্ত বুদ্ধিকে যেন সেই দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি গ্রাস করে। তার নিজের বলতে যেন আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ব্যথা নেই, আনন্দ নেই, ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। ইচ্ছা নেই অনিচ্ছা নেই। বর্তমান নেই ভবিষ্যৎ নেই।

কোথায় চলেছে জানে না কেন চলেছে জানে না। চোখ আছে তবু যেন চোখ চেয়ে নেই, দেখছে অথচ যেন কিছুই দেখছে না। শব্দ নেই, গন্ধ নেই, আলো নেই। ঐ যে মানুষগুলো এদিক ওদিক চলা-ফেরা করছে ওদের সঙ্গে যেন চিত্রার কোন সম্পর্ক নেই। কোন দিন যেন কোন সম্পর্ক ছিল না। সব কিছু হতে বিচ্ছিন্ন, একক সে যেন বিশেষ একজন, বিশেষ একটা সত্তা, বিশেষ একটা চেতনা।

লেক থেকে বের হয়ে যেন তন্দ্রার ঘোরে, একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে চিত্রা এসে হাওড়া স্টেশনগামী একটা বাসে উঠে বসল।

চেকার এসে বললে, টিকিট।

হাওড়া স্টেশনের একটা টিকিট কাটল চিত্রা।

বাসটা ছুটে চলেছে যাত্রী নিয়ে হাওড়া স্টেশনের দিকে। প্রখর দিবালোকে ঝলমল করছে পৃথিবীটা। কত মানুষ কত শব্দ।

॥ ৯ ॥

অলস শিথিল ভঙ্গিতে বসে থাকে বাসের মধ্যে চিত্রা। বাসটা ছুটে চলেছে। কর্মব্যস্ত কলকাতা শহর। কত মানুষের আনাগোনা। চিত্রার মনে হয় কখনও কোন দিন যেন ঐ সব কিছুর সঙ্গে কোন সম্পর্কই তার ছিল না এবং আজও তার নেই। সামনের সীটে একটি তরুণ আর একটি তরুণী বসে আছে। টুকরো টুকরো তাদের কথাগুলো থেকে থেকে কানে আসে চিত্রার।

রাগ করেছ? মেয়েটি বলে।

ছেলেটি জবাব দেয়, রাগ করতে যাব কেন?

কিন্তু তোমার গলার স্বর যে বলছে রাগ করেছ।

খুব চাপা কণ্ঠে যেন ফিস ফিস করে ওরা কথা বলছে।

রাগ করলেই বা তোমার তাতে কি এসে যায়, আমি তোমার কে ?

অমন কথা বলো না। তুমি কি জান না, তুমিই আমার সব।

তাই বুঝি ?

নিশ্চয়ই, তোমার জন্য আমি এ প্রাণটাও দিতে পারি।

সত্যি নাকি !

সত্যি, সত্যি, সত্যি,—

প্রাণ দিতে পারে ছেলেটি মেয়েটির জন্য। প্রাণ কি ! প্রাণ বলে কিছু আছে নাকি ! কোথায় থাকে প্রাণ ! ভাবতে ভাবতে সব যেন গুলিয়ে যায় চিত্রার আচ্ছা বাসটা কি চলছে ? কোথায় চলেছে বাসটা ! পৃথিবীতে এত আলো কেন ? একটা মাত্র সূর্য এত আলো দেয়। এত আলো কোথায় পেল সূর্যটা ? সে জগৎটা কেমন, যেখানে সূর্য নেই, আলো নেই ! শুধুই অন্ধকার আর অন্ধকার। হঠাৎ বাসটা থেমে গেল। হুড়োহুড়ি করে সকলেই নামছে। চিত্রাও নামল।

স্টেশনের মধ্যে এসে এক সময় প্রবেশ করল চিত্রা। টিকিট কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ পাশ থেকে এক জন ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর কানে আসে চিত্রার। এতক্ষণ আর স্টেশনে থেকে কি হবে, তুফান মেল তো শুনছি আজ তিন ঘণ্টার মত লেট।

ফিরে তাকাল চিত্রা।

এক জন অল্পবয়সী ও একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক কথা বলতে কাউন্টারের কাছ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বোধ হয় গেটের দিকেই চলে গেল। চিত্রার দু'কান জুড়ে বিচিত্র একটি শব্দ ঝংকার যেন গুনগুনিয়ে চলেছে : তুফান মেল তুফান মেল।

তুফান মেল নামটা প্রথম যেদিন চিত্রা শোনে কেমন যেন অদ্ভুত লেগেছিল নামটা তার। বালিকা তখন সে। বাবার সঙ্গে দিল্লী যাবে সেবারে। এক মাস ধরে যাবার তোড়জোর চলেছে। তার পর এক দিন টিকিট কাটা হল। ছোট ভাই মন্টু শুধিয়েছিল, কোন ট্রেনে আমরা যাব বাবা, বাবা বলেছিলেন তুফান মেলে।

গাড়িটার নাম বুঝি তুফান মেল, বাবা ? চিত্রা শুধিয়েছিল।

হ্যাঁ—তুফানের মত ছোটে কিনা ?

তার পর পরের দিন তুফান মেলে উঠে ওদের দু'ভাই বোনের কি আনন্দ। সত্যি ঝড়ের মত যেন ছুটছিল তুফান মেলটা।

দিল্লীর স্মৃতিটা সেবারে অনেক দিন ধরে চিত্রার মনের মধ্যে সকরুণ ব্যথায় জাগরুক ছিল। দিল্লীতেই মন্টু মারা যায় হঠাৎ চার দিনের মধ্যে কঠিন ম্যানেন-জাইটিস রোগে। চিত্রার একমাত্র ভাই মন্টু।

মন্টু বলত, বাবা বলেছে ফেরবার সময়ও আমরা তুফান মেলে যাব দিদি।

একটা শ্রীরামপুরের টিকিট দিন না।

কালো লেডিজ হ্যাণ্ড ব্যাগটা থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে কাউণ্টারের ফোকর দিয়ে এগিয়ে দেয় চিত্রা। টিকিট ও চেঞ্জ নিয়ে এগিয়ে চলল চিত্রা প্ল্যাটফরমের দিকে।

শ্রীরামপুর পর্যন্ত কিন্তু গেল না চিত্রা। লিলুয়াতেই নেমে পড়ল ট্রেন থেকে।

অগ্রহায়ণের শেষ। একটু একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। আকাশ-নীল রংয়ের একটা শাড়ি পড়েছিল চিত্রা। সাদা ব্লাউজ চিকনের কাজ করা নিজেরই হাতে। তার উপরে পাতলা গেরুয়া রংয়ের শাল।

কিছুক্ষণ প্ল্যাটফরমের উপরে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বেড়াল চিত্রা। স্টল থেকে এক কাপ চা খেল। পিপাসা পেয়েছিল অনেকক্ষণ থেকে। এক জন মধ্যবয়সী টি. টি. ই. পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকেই শুধায় চিত্রা, তুফান মেলটা কখন আসবে জানেন ?

তুফান মেল ?

টি. টি. ই. তাকাল চিত্রার প্রশ্নে ওর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, তুফান মেল।

তুফান তো এখানে থামে না।

তা জানি।

ও, লেট রান করছে আজ তুফান।

চিত্রা আর কোন কথা বলল না। এগিয়ে গেল। টি. টি. ই. ভদ্রলোকও অন্য দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। লম্বা প্ল্যাটফরমটার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কয়েকবার হাঁটল চিত্রা। ইতিমধ্যে দুদিক থেকে দুটো লোকাল ট্রেন এলো থামল, আবার চলে গেল দুদিকে। প্ল্যাটফরমের এক ধারে বাঁশের

বেড়া দিয়ে মরশুমী ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে, নানা রংয়ের বিচিত্র ফুল ধরেছে। সূর্যের আলোয় ঝক ঝক করছে আকাশটা।

পা দুটো ক্লান্তিতে যেন অবশ হয়ে আসছে চিত্রার। প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে যে বেঞ্চটা পাতা ছিল সেই বেঞ্চটার উপর গিয়ে বসল চিত্রা। রেলের লাইনটার দিকে চিত্রার চোখের দৃষ্টি বার বার আকৃষ্ট হয়। জোড়া ইস্পাতের লাইন দুটো সমান ব্যবধানে পাশাপাশি চলে গিয়েছে। ঐ লাইন দুটোর উপর দিয়ে আসছে নিশ্চয় তুফান মেলটা।

পাশে এক ভদ্রলোক এসে বসলেন, মধ্যবয়সী, গায়ে মুগার চাদর জড়ানো, পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো জোড়া ধুলো-ধুসরিত।

আচ্ছা তুফান মেল কখন আসবে বলতে পারেন?

চিত্রার প্রশ্নে ভদ্রলোক ওর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। তার পর মৃদু কণ্ঠে বললেন, তুফান মেল তো এখানে ধরে না—

ধরে না?

না। কোথায় যাবে মা তুমি?

আমি! না—কোথাও যাব না।

কথাটা বলতে বলতে চিত্রা যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় যে দিক থেকে তুফান মেলটা আসবে সেই দিকে তাকায়।

কত দূর তুফান মেলটা! আসতে এত দেরি করছে কেন? আকাশটা কি নীল! সূর্যের আলো আজ কি উজ্জ্বল! সূর্যের উত্তরায়ণ শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে দক্ষিণায়নের।

ঐ তুফান মেল আসছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ কথাটা বলতেই সেই দিকে তাকাল চিত্রা।

বহু দূরে কালো মেঘের ইশারার মত দেখা দিয়েছে তখন সত্যিই তুফান মেলটা। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন অকস্মাৎ চিত্রার একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য যেন থর থর করে কেঁপে উঠল চিত্রার সর্বাঙ্গ। রিম ঝিম রিম ঝিম কানের মধ্যে এসে প্রবেশ করছে যেন ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট কার আহ্বান।

ঝির ঝির ঝির ঝির—ঝিম্ ঝম্ ঝিম্ ঝিম্—ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্···ঝক্-ঝক্ ঝক্-ঝক্···ঝক্-ঝক্-ঝক্-ঝক্—উঁ—আঁ—আঁ—আঁ—

কর্ণপটাহ যেন বিদারণ করে দিয়ে গেল ট্রেনের হুইসেলের শব্দটা। বিদ্যুৎ-বেগে উঠে দাঁড়ায় চিত্রা।

তুফান মেল।

তুফান মেল।

তুফান মেল চলে গেল। এবং ট্রেনটা চলে যাবার পর লাইনের উপরে শুধু ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত একটা বীভৎস মাংসপিণ্ড দেখা গেল।

প্ল্যাটফরমের বেঞ্চিটার উপর পড়েছিল সেই গেরুয়া রংয়ের শালটা, কালো হ্যাণ্ড ব্যাগটা আর বেঞ্চের সামনে চিত্রার দামী স্যাণ্ডেল জোড়া। জি. আর. পি. এল। স্টেশন মাষ্টার এলেন—হ্যাণ্ড ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেল একটা দশ টাকার নোট, তিনটে টাকা, কিছু খুচরো পয়সা ও শ্রীরামপুরের একটা টিকিট। এবং ব্যাগের মধ্যে একটা চিঠি পাওয়া গেল, দু'বছর পূর্বে লেখা রঞ্জিতের চিত্রাকে।

॥ ১০ ॥

পরের দিনটা ছিল কি একটা সরকারী ছুটির দিন।

মিতালী সারা সকালটা কোথাও বের হয় নি, কিন্তু ইচ্ছা ছিল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর রামধন মিত্র লেনে এক বার যাবে। গত কাল অফিসেই খবর পেয়েছে কাকীমার আর একটি মেয়ে হয়েছে গত পরশু।

যদিও বাড়িতেই ধাত্রী প্রসব করিয়েছিল কিন্তু প্রসবের ঘণ্টা দুই বাদে একলামসিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় শশিভূষণ তাঁর স্ত্রীকে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন। খবরটা অবিশ্যি শশিভূষণই ফোন মারফত মিতালীকে তার অফিসে জানান। খবরটা পাওয়ার পর মিতালী ভেবেছিল কালই ছুটির পর অফিস থেকেই হাসপাতালে গিয়ে এক বার দেখে আসবে। কিন্তু কতগুলো জরুরী ফাইল শেষ করে গত কাল অফিস থেকে বেরুতে বেরুতেই সাড়ে ছটা বেজে গেল। একটানা অতক্ষণ কাজ করে মাথাটা যেন কেমন দপ দপ করছিল। তাই রামধন মিত্রের লেনে আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি মিতালীর। সোজা সে হোস্টেলেই ফিরে এসেছিল। কিন্তু আজ এক বার না গেলে ভাল দেখায় না। বেলা এগারটা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া সেরে মিতালী বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, পাশের ঘরের মন্দিরা চ্যাটার্জী এসে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

মিতালী শুনেছ?

চিরুনিটা দিয়ে মাথার চুলগুলো ঠিক করে নিচ্ছিল, মিতালী মন্দিরার কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকাল, কি না তো? কি হয়েছে?

চিত্রা রায় ট্রেনের তলায় পড়ে সুইসাইড করেছে।

সে কি!

হ্যাঁ—দেখ না নীচে গিয়ে। চারু সিংহীর ঘরে ইন্সপেক্টর এসে সুধীরা চ্যাটার্জীকে জেরা করছে।

সুধীরাকে কেন?

বাঃ, সেই তো তার রুম-মেট। তা ছাড়া গত কাল সুধীরা যখন ডিউটিতে বের হয়, তখন নাকি তার হাতে একটা গয়না-ভর্তি এটাচি কেস দিয়ে বলেছিল চিত্রা, সেটা তাদেরই অফিসের কে এক রঞ্জিৎবাবু না কে আছেন, তার বিয়েতে তার স্ত্রীকে যৌতুক দিয়ে আসতে—

হ্যাঁ, কাল শুনেছিলাম রঞ্জিৎবাবুর বিয়ে ছিল।

চিত্রা রায়ের আকস্মিক আত্মহত্যার ব্যাপারটা যেন সমস্ত হোস্টেলময় একটা সাড়া তুলে দিয়ে গেল। বিশেষ করে মিতালীর মনটাকে যেন প্রবল ভাবে একটা নাড়া দেয়। মাত্র কিছু দিন পূর্বে কৃষ্ণা মৈত্র আত্মহত্যা করেছে। তার পর আবার আত্মহত্যা করল চিত্রা রায়।

কিন্তু এই যে মেয়ে দুটো আত্মহত্যা করল এর জন্য দায়ী কে! কৃষ্ণেন্দু, রঞ্জিৎ না আজকের দিনের সমাজব্যবস্থা না আজকের দিনের অর্থনৈতিক সমস্যারই সুদূরপ্রসারী ফল এটা? অসহ্য একটা আক্রোশে মিতালীর সমস্ত অন্তরটা যেন পুড়তে থাকে কিন্তু কার প্রতি যে আক্রোশ আর কিসের আক্রোশ ব্যাপারটা সে নিজেও সঠিক যেন বুঝতে পারে না। মিতালী মনে মনে স্থির করে পরের দিনই অফিসে গিয়ে সে রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা করবে। জিজ্ঞাসা করবে তাকে সে, একটা মেয়েকে নিয়ে এমনি করে খেলা করলে কেন সে! কি প্রয়োজন ছিল তার!

কিন্তু মিতালী জানত না আগের রাত্রে রঞ্জিতের বিবাহবাসরে সুধীরার আকস্মিক আবির্ভাব রঞ্জিতের এত সাধের সুখের ঘরে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে এসেছিল।

সুধীরার গোবরডাঙায় রঞ্জিতের বিবাহবাসরে গিয়ে পৌঁছতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল আগের দিন। সুধীরা যখন গিয়ে পৌঁছেছিল তারই মিনিট দশেক আগে বিবাহ হয়ে গিয়েছে, বর বধূ বাসরে এসে বসেছে। রঞ্জিতের একান্ত জেদাজেদিতে একেবারে যাকে বলে নমো নমো করেই বিবাহ শেষ করা হয়েছিল।

রঞ্জিতের সঙ্গে যে চার জন মাত্র বন্ধু গিয়েছিল তারা আটটার ট্রেনেই খেয়ে-দেয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়েছিল। কন্যাপক্ষ থেকেও বিশেষ কাউকে বলা হয় নি।

মণিমোহনের ইচ্ছা ছিল না আদপেই উমার বিবাহটা অনাড়ম্বর ভাবে নমো নমো করে সারতে, কিন্তু মেয়ে জামাই যখন চায় না এবং জগদ্ধাত্রীও বার বার করে যখন কোন রকম আড়ম্বর করতে মণিমোহনকে নিষেধই করলেন, তখন আর তিনি ও সবের মধ্যে যান নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু প্রতিবেশীদের এড়ানো যায় নি। তারা এসেছিল। মণিমোহনের অন্যান্য দুই মেয়েও আসতে পারে নি। এত তাড়াতাড়ি তারা আসবার ব্যবস্থা করতে পারে নি। ছেলে আর পুত্রবধূ এসেছিল। রোহিণীমোহন ও পুত্রবধূ নির্মলা।

নিমন্ত্রিতদের শেষ ব্যাচ তখন খেতে বসেছে। সুধীরা এসে রঞ্জিতের খোঁজ করল। রোহিণীর সঙ্গেই দেখা হয়েছিল প্রথমে সুধীরার।

কাকে চান আপনি?

রঞ্জিৎবাবুকে চাই।

কি নাম বলব? একটু যেন কেমন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতেই বার কতক সুধীরার আপাদমস্তক চেয়ে চেয়ে দেখে রোহিণী।

নাম বললেও তো তিনি আমাকে চিনতে পারবেন না কারণ তিনি আমাকে এর আগে কখনও দেখেন নি। বলুন গিয়ে কলকাতা থেকে এক জন ভদ্রমহিলা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে দেখা করতে চান।

প্রয়োজনের কথাটা কি আমাকে আপনি বলতে পারেন না?

কেন পারব না। কিন্তু রঞ্জিৎবাবুর সঙ্গে কি সম্পর্ক আগে না জানলে—মৃদু হেসে কথাটা বলে সুধীরা।

আমার ছোট বোন উমার সঙ্গে আজ তার বিয়ে হয়েছে।

ওঃ নমস্কার। তা হলে আর তাঁকে খবর দেবার প্রয়োজন হবে না। বলতে বলতে গায়ের আলোয়ানের তলা থেকে চিত্রার দেওয়া এটাচি কেসটা ও চিঠিটা বের করে রোহিণীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে সুধীরা বলে, এগুলো রঞ্জিৎবাবুকে পৌঁছে দেবেন, তা হলেই হবে।

কি আছে এতে?

সম্ভবতঃ গয়না। এই যে চাবিটা নিন—

গয়না?

হ্যাঁ।

কে এসব পাঠিয়েছে ?

যিনি পাঠিয়েছেন তিনি বলে দিয়েছেন ঐ চিঠির মধ্যেই সব কিছু লেখা আছে। আচ্ছা চলি—নমস্কার—

সে কি এখুনি যাবেন।

হ্যাঁ—শেষ ট্রেনটা আমাকে ধরতে হবে।

না। না—তা কি হয়। বিয়ে-বাড়িতে এসেছেন, কিছু না মুখে দিয়ে চলে যাবেন—না, না—তা হয় না, হতে পারে না—

ক্ষমা করবেন। উপায় নেই—যেমন করে হোক এ ট্রেনটা আমাকে ধরতেই হবে। আচ্ছা চলি—নমস্কার।

সুধীরা আর মুহূর্ত মাত্র দাঁড়ায় না। যেমন এসেছিল তেমনি যেন বের হয়ে গেল ঝড়ের মতই। রোহিণী এটাচি কেসটা ও চিঠিটা নিয়ে বাসর-ঘরের দিকে অগ্রসর হল।

উমা যে ঘরে থাকত সেই ঘরেই বাসরের ব্যবস্থা হয়েছিল। একটু আগে জগদ্ধাত্রী মেয়ে-জামাইকে কিছু খাইয়ে এঁটো বাসনপত্র তুলে নিয়ে গিয়েছেন। উমা আর রঞ্জিৎ এক জন খাটের উপরে, অন্য জন চেয়ারের উপর বসেছিল।

রঞ্জিৎ একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বলছিল উমাকে, যাক শেষ পর্যন্ত তোমাকে তা হলে আমি পেলাম উমা।

উমা মৃদু সলজ্জ হাসি হাসে।

হাসছ কি, সত্যিই আমার যা ভয় হয়েছিল।

ভয় ?

হ্যাঁ, ভয়।

কেন ?

বাবা, তোমার যা মেজাজ। বিগড়োতে আর কতক্ষণ। কিন্তু একটা কথার জবাব দেবে উমা ?

কি ?

এ বিয়েতে তুমি খুশী হয়েছ তো ?

তোমার কি মনে হয় ?

না, না—ও ভাবে এড়িয়ে গেলে চলবে না। তোমাকে বলতে হবে। বল উমা খুশী হয়েছ কি না ?

মৃদু হেসে উমা বলে, জানি না।

সত্যি, ভারী আশ্চর্য লাগছে উমা।

কেন?

নয়! মাত্র ছ মাস। ছ মাস আগে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় পর্যন্ত ছিল না, তুমি আমাকে দেখ নি, আমিও তোমাকে দেখি নি—

একটা কথার সত্যি জবাব দেবে? হঠাৎ উমা প্রশ্ন করে।

কি?

হঠাৎ এ ভাবে তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন?

কেন করলাম?

হ্যাঁ, তুমি তো আমার সম্পর্কে কিছুই জান না।

ও, এই কথা। তা তুমিও তো জান না।

ঠিক ঐ সময় দরজার বাইরে রোহিণীর গলা শোনা গেল, রঞ্জিৎ—

উমা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, দাদা—

আসুন দাদা—রঞ্জিৎ আহ্বান জানায়।

রোহিণী ঘরে এসে ঢুকল, হাতে তার এটাচি কেস চাবি ও চিঠিটা।

এইগুলো এক জন ভদ্রমহিলা এসে এই মাত্র তোমাকে দিয়ে গেলেন।

কে সে ভদ্রমহিলা! রঞ্জিৎ যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করে।

তা তো জানি না।

কি নাম তাঁর?

তাও জানি না। বললেন, নাম বললেও নাকি তুমি তাকে চিনতে পারবে না।

তাই নাকি!

হ্যাঁ, বললেন চিঠিতেই নাকি সব লেখা আছে।

কোথায় তিনি?

চলে গিয়েছেন।

রোহিণী আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কার চিঠি?

চিঠিটা খাম থেকে বার করে সামনে মেলে ধরেছিল রঞ্জিৎ।

একেবারে পাশ ঘেষে এসে দাঁড়িয়ে উমা রঞ্জিৎকে প্রশ্নটা করে।

রঞ্জিৎ উমার প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। সে তখন চিঠিটা পড়ছিল। কিন্তু চিঠির ছটো লাইন পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রঞ্জিতের বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠেছিল।

সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়তে থাকে এবং উমাও যে তার পাশে দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়ছে সে খেয়ালটুকু পর্যন্ত তখন রঞ্জিতের যেন ছিল না। চিঠিটা পড়তে পড়তে রঞ্জিৎ যেন একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ উমার প্রশ্নে চমকে রঞ্জিৎ ফিরে তাকায় উমার মুখের দিকে।

কে ঐ চিত্রা?

চিত্রা?

হ্যাঁ, যে চিঠি লিখেছে?

কেমন যেনন বোবা বিহ্বলতায় রঞ্জিৎ উমার মুখের দিকে তাকায়।

কে চিত্রা?

চিত্রা—

ঐ নামটুকু উচ্চারণ করেই আর শব্দ বের হয় না রঞ্জিতের মুখ থেকে।

দেখি চিঠিটা!

উমা রঞ্জিতের শিথিল অবশ হাতের মুষ্টি থেকে চিঠিটা টেনে নিয়ে আবার এক বার আগাগোড়া পড়ে। কিছুই অস্পষ্ট নয়। সবই স্পষ্ট। এবং চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে পাশেই টেবিলের উপর যে এটাচি কেসটা ছিল সেটা তুলে নিয়ে চাবি দিয়ে খুলে ফেলল উমা।

ঘরের উজ্জ্বল আলোয় গয়নাগুলো মুহূর্তের জন্য উমার দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ সেই গহনাগুলোর দিকে চেয়ে থেকে পুনরায় এটাচি কেসটায় চাবি দিয়ে চাবি ও চিঠিটা রঞ্জিতের হাতে এগিয়ে দেয় উমা।

ঘরের মধ্যে যেন একটা মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা। রোহিণী চলে যাবার পর ঘরের দরজাটা ভেজানোই ছিল। এক সময় উমা এগিয়ে গিয়ে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল, তার পর এগিয়ে এসে একেবারে রঞ্জিতের মুখোমুখি দাঁড়াল।

কই বললে না তো চিত্রা কে?

আমাদের অফিসের এক জন সহকর্মিণী। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে কোন মতে কথাগুলো যেন উচ্চারণ করল রঞ্জিৎ।

ছি ছি—

একটা কঠিন ঘৃণা যেন উমার কণ্ঠোচ্চারিত ঐ 'ছি ছি' দুটি মাত্র শব্দের ভিতর দিয়ে ঝরে পড়ল।

উমা, শোন—

এমন কাজ তুমি করলে কেন?

উমা—

নিজের সর্বনাশ তুমি কতখানি করেছ জানি না কিন্তু আমার যে সর্বনাশ তুমি করলে—

উমা শোন—আমার কিছু বলবার আছে।

থাক। ওসব-আর আমি শুনতে চাই না। কিন্তু আর না—আমার যা হয়েছে তা হোক। এ বাড়ির কেউ কোন কথা জানে আমি তা চাই না। বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে উমা ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল।

মুহূর্তে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঘরটা ভরে গেল। রঞ্জিৎ যেন পাথরের মতই চেয়ারটার উপর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

অবশেষে ভোর হল এক সময়। বাকী রাতটুকু দু'জনার মধ্যে আর একটি কথাও হয় নি। অস্পষ্ট ভোরের আলো দেখা দিতেই উমা ঘর থেকে বের হয়ে গেল। রঞ্জিৎ কিন্তু তখনও তেমনি ভাবেই চেয়ারটার উপর বসে।

ঐ দিনই সন্ধ্যা নাগাদ রঞ্জিৎ উমাকে নিয়ে তার লেক অঞ্চলের সাজানো নতুন ফ্ল্যাট বাড়িতে এসে উঠল।

গত রাত্রের সেই তার পর থেকে উমা রঞ্জিতের সঙ্গে একটি কথাও বলে নি। রঞ্জিৎও বলে নি। উমার কঠিন মুখের প্রতি যখনই নজর পড়েছে কি একটা আশংকায় যেন রঞ্জিতের বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছে।

তার নিযুক্ত ঝি সারদা কিন্তু খুব করিতকর্মা। সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই সে আগে থেকে করে রেখেছিল। রাত আটটার মধ্যেই সে খাওয়া-দাওয়া সব চুকিয়ে দেয়। সে রাত্রিটা কাল রাত্রি। তাই আলাদা ঘরে দু'জনার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আহারের টেবিলে উমা নাম মাত্র বসল। কিছুই সে মুখে দিল না বলতে গেলে।

সারদা অনুযোগ জানায়, কিছুই যে খেলে না বৌমা।

সারদার প্রশ্নে উমা সে দিকে তাকায়ও না, সাড়াও দেয় না। টেবিল থেকে উঠে চলে গেল। এবং নিজের ঘরে প্রবেশ করে একেবারে খিল তুলে দিল ঘরের। পাশের ঘরে রঞ্জিতের সে রাতটাও বিনিদ্রই অতিবাহিত হয়। উমা সেই যে মৌনব্রত নিয়েছে, তার পর থেকে আর একটি কথা পর্যন্ত বলছে না। অথচ উমার সঙ্গে রঞ্জিতের যা হোক একটা বোঝাপড়া হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু কেমন করে যে সেটা সম্ভব হবে তাই ভাবছিল রঞ্জিৎ।

ওমা যে চিত্রা নয় সেটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছিল রঞ্জিৎ উমার সঙ্গে সামান্ত পরিচয়েই। নতুন করেই যেন আবার চিত্রার কথা মনে পড়ে রঞ্জিতের। এ প্রহসনটা করার চিত্রার কি প্রয়োজন ছিল। কালই গিয়ে সে চিত্রার সঙ্গে দেখা করবে। তার গয়নাগুলো তার মুখের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলবে, এসব ন্যাকামি কেন করতে গিয়েছিলে ? লজ্জা করল না তোমার।

কিন্তু চিত্রা যদি পাল্টা প্রশ্ন করে তাকে, তুমিই বা আমাকে নিয়ে এত দিন খেলা করেছিলে কেন ? কেন ভালবাসার অভিনয় করেছিলে ?

কি জবাব দেবে রঞ্জিৎ তখন তার।

কিন্তু কোন প্রশ্নই আর কাউকে করতে হল না। পরের দিন সংবাদপত্রে চিত্রার ট্রেনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যার সংবাদটা পড়ে যেন রঞ্জিৎ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। সংবাদপত্রটা হাতে করে রঞ্জিৎ স্তব্ধ অনড় হয়ে বসে রইল চেয়ারে।

॥ ১১ ॥

মিতালী, মনোতোষ ও মনোতোষের মেয়ে অনীতা পুলিস মর্গের অদূরে দাঁড়িয়েছিল।

পুলিস মনোতোষকে সংবাদ দেয় নি। মতোতোষই সংবাদপত্র মারফত চিত্রার আত্মহত্যার সংবাদটা পড়ে সোজা গিয়ে দেখা করেছিল পুলিসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। আর মিতালী গিয়েছিল মনোতোষের ঠিকানাটা সংগ্রহ করে তার সঙ্গে দেখা করতে আগরপাড়ায়। সেখানে গিয়ে মনোতোষের কোন সংবাদ না পেয়ে এসেছিল মর্গে পুলিসের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে। মিতালী মর্গে এসেছিল, একান্তই যদি মনোতোষের কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে তো হতভাগিনী চিত্রার মৃতদেহটার যাতে একটা সৎকারের ব্যবস্থা করা যায় তারই জন্য। অফিস থেকে আগেই ছুটি নিয়েছিল মিতালী।

মর্গের সামনে এসে দেখা হয়ে গেল মিতালীর মনোতোষের সঙ্গে। মনোতোষকে মিতালী চিনত না। কিন্তু কেমন বিহ্বল একটা মানুষ ও তার সঙ্গে একটি মেয়েকে মর্গের অদূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেমন সন্দেহ হওয়াতেই এগিয়ে গিয়ে আলাপ করে মনোতোষের সঙ্গে। যে স্বামীর সঙ্গে এক দিন চিত্রার ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল, তাঁকে চোখে কোন দিন না দেখলেও তাঁর নামটা শুনেছিল মিতালী। মনোতোষ ভট্টাচার্য। এবং এও জানত তাদের একটি মেয়ে আছে।

একেবারে সোজাসুজিই প্রশ্ন করেছিল মিতালী, আপনার নামই কি মনোতোষ ভট্টাচার্য ?

চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার এক ধারে মেয়েকে নিয়ে মনোতোষ। মিতালীর প্রশ্নে একটু যেন চমকে উঠেই বলে, হ্যাঁ—আপনি। আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না ?

না। আপনি আমাকে চিনবেন না। আপনি তো আমাকে দেখেন নি কখনও! আমার নাম মিতালী চক্রবর্তী। চিত্রাদির সঙ্গে এক অফিসে আমি কাজ করতাম।

ওঃ।

আপনার ওখানে আমি সকালে গিয়েছিলাম।

কেন ?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মিতালী অন্য প্রশ্ন করে, খবর নিয়েছিলেন মৃতদেহ কখন পাওয়া যাবে ?

হ্যাঁ, ওরা বললে বেলা দুটো নাগাদ।

আমি ভাবছিলাম হিন্দু সৎকার সমিতিকে একটা খবর দেব।

না, না—আমি তো আছি। হিন্দু সৎকার সমিতির সাহায্য নিতে হবে কেন ?

কিন্তু—

আমার তিন জন বন্ধুকে আমি খবর দিয়েছি। তারা সব ব্যবস্থা করে ঠিক সময়েই এসে পড়বে।

দুটো নয় বেলা প্রায় আড়াইটার সময় মর্গ থেকে চিত্রার বস্ত্রাবৃত মৃতদেহটা পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে মনোতোষের বন্ধুরা খাট ও আনুষঙ্গিক সব কিছু নিয়ে এসে গিয়েছিল। প্রচুর ফুল আনিয়েছিল মনোতোষ। লাল পাড় শাড়ি, আলতা সিঁদুর ও ফুল সব কিছু দিয়ে মিতালীই সাজিয়ে দিল চিত্রাকে।

শ্মশানে পৌঁছতে পৌঁছতে ওদের বেলা চারটে বেজে গেল। সেখানে সব কিছু ব্যবস্থা করে মৃতদেহ চিতায় তুলে দিতে দিতে আরও ঘন্টাখানেক চলে গেল। অনীতাই মার মুখাগ্নি করল। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোয় চারিদিক তখন প্রায় ঝাপসা হয়ে এসেছে। গঙ্গার একেবারে কোল ঘেঁষে মনোতোষ বসে ছিল। অনীতা দাঁড়িয়েছিল চিতার কাছাকাছি মনোতোষের বন্ধুদের সঙ্গে। মিতালী এসে [illegible] পাশে বসল।

মিতালী সত্যিই যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল চিত্রার স্বামী মনোতোষের ব্যবহারে। যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে আজ ছ'বৎসরের বেশী চলে এসেছিল এবং সেই ছ'বৎসর যথেচ্ছাচারিতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে, সেই স্ত্রীর শেষ কাজ মনোতোষ কেমন করে করতে পারছে। মনোতোষ মানুষ না দেবতা!

আচ্ছা মিতালী দেবী—

মনোতোষের কণ্ঠস্বরে চমকে তার মুখের দিকে তাকায় মিতালী। বলে, কিছু বলছিলেন?

ও আত্মহত্যা করল কেন এভাবে বলতে পারেন? ও যা চেয়েছিল তা তো ওকে আমি দিয়েছিলাম। ওকে তো নিষ্কৃতিই আমি দিয়েছিলাম।

আপনি বোধ হয় জানেন না মনোতোষবাবু, রঞ্জিৎবাবু গত পরশু বিয়ে করেছেন।

রঞ্জিৎ বিয়ে করেছে!

হ্যাঁ।

এমনই যে ঘটবে তা আমি জানতাম মিতালী দেবী। এমনই হয়। রঞ্জিতের নেশা একদিন কেটে যাবে, রঞ্জিৎ দূরে সরে যাবে এ আমি জানতাম।

সন্ধ্যার ঝাপসা আলোয় মনোতোষের মুখখানা ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না, তবু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে মিতালী।

গঙ্গার ওধারে সারি সারি বাতি জ্বলে উঠেছে। একটা স্টীম লঞ্চ সিটি দিয়ে সাড়া জাগিয়ে ঢেউ তুলে চলে গেল গঙ্গার বুকে।

আচ্ছা মনোতোষবাবু!

বলুন?

আপনাদের ডিভোর্স হয়েছিল কি নিয়ে?

বলতে লজ্জাও হয় দুঃখও হয়। সত্যি সে এক হাস্যকর ব্যাপার। ওর অভিযোগ পৌরুষ নাকি আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—

সে কি!

হ্যাঁ। বাপের একমাত্র ছেলে। প্রথম যৌবনে প্রাচুর্য আমাকে সত্যিই এক দিন বিপথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি, নিজের ভুল বুঝতে পেরে যথাসময়েই তার উপযুক্ত চিকিৎসা করেছিলাম। এবং তার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ নীরোগ। কোন রোগ বা অক্ষমতাই দেহে আমার নেই—

তবে ?

অনীতার জন্মের দুই বছর পরে আমি গয়াতে বাবার কাজ করতে গিয়েছিলাম। সেই সময় এক আশ্চর্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁর কাছে আমি মন্ত্র নিই। তাঁর আমার প্রতি নির্দেশ ছিল, সংসারে আমি থাকতে পারি তবে ব্রহ্মচারীর মত জীবন যাপন করতে হবে। স্ত্রীর সঙ্গে দেহের কোন সম্পর্ক থাকবে না। সেও এক কারণ, তা ছাড়া অনেকের মুখে শুনেছিলাম ঐ যৌন ব্যাধি এক বার দেহের রক্তে প্রবেশ করলে নাকি সম্পূর্ণ নিরাময় কোন দিনও হয় না। তাই উপর্যুপরি বহুবার রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নিজে সম্পূর্ণ নির্দোষ জেনেও, সেই ভয়েই স্ত্রীর সঙ্গে দেহগত সমস্ত সম্পর্ক আমি ত্যাগ করেছিলাম।

চিত্রাদিকে সে কথা জানান নি ?

না। জীবনে আমি ঐখানেই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা বড় ভুল করেছিলাম মিতালী দেবী। আর তার ফলে চিত্রা আমাকে ভুল বোঝার দরুনই তার মনের মধ্যে আমার প্রতি একটা কঠিন ঘৃণা জমে উঠতে লাগল। তার পর এক দিন সেই ঘৃণা থেকেই সে আমার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল। দূরে চলে গেল সে। একটু থেমে আবার মনোতোষ বলতে লাগল, যে দিন রাত্রে সত্যি সত্যিই সে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, সে রাত্রে অবিশ্যি আমারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। তার চরিত্রের কুৎসিত অবনতি আমাকে উন্মাদ করে তুলেছিল, কিন্তু পরে যখনই সুস্থ মস্তিষ্কে ব্যাপারটা ভেবেছি, নিজেকেই নিজে দোষারোপ করেছি। আর মনে মনে কামনা করেছি, চিত্রা যেন রঞ্জিৎকে নিয়ে সুখী হয়। আমি তাকে সুখী করতে পারি নি, রঞ্জিৎ যেন তাকে সুখী করতে পারে। আর সেই কারণেই সেদিন কোর্টে দাঁড়িয়ে নিজের উপরেই সমস্ত দোষ টেনে নিয়ে বিবাহ বন্ধন থেকে তাকে আমি মুক্তি দিয়ে এসেছিলাম। আমার সঙ্গে ডিভোর্স না হওয়া পর্যন্ত তো সে রঞ্জিৎকে বিয়ে করতে পারবে না। কিন্তু ডিভোর্সের পরেও যখন এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল অথচ রঞ্জিৎ ওকে বিয়ে করল না, তখনই বুঝেছিলাম রঞ্জিৎ ওকে কোন দিনই বিয়ে করবে না। রঞ্জিৎ ওকে কেবল ভোগই করতে চেয়েছিল, তাই ওকে ঘরের বাইরে নিয়ে গিয়েছে। বিয়ে তাকে সে করবে না।

দুই

সে রাত্রে মিতালীর মশান থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল।

মনোতোষ আর অনীতা মনোতোষের বন্ধুর বাড়ি ভবানীপুরে চলে গেল আর সে ফিরে এল হোস্টেলে।

পরের দিন মিতালী অফিসে যেতেই দেখল রঞ্জিৎ তার টেবিলে বসে কাজ করছে। চিত্রার মৃত্যু-সংবাদটা ইতিমধ্যেই অফিসে সকলে জেনে ফেলেছিল। এবং রঞ্জিতের সঙ্গে চিত্রার সম্পর্কটা যখন অফিসে কারোরই অজানা ছিল না, সে ক্ষেত্রে রঞ্জিৎকে অফিসে দেখে মিতালী যেন একটু বিস্মিতই হয়। লোকটার চক্ষুলজ্জা বলেও কি কোন কিছু নেই! এত তাড়াতাড়ি এসে সে অফিসে জয়েন করল কি করে? মিতালীর কিন্তু রঞ্জিতের দিকে তাকাতেও ঘৃণা হচ্ছিল।

মিতালী নিজের টেবিলে বসে ফাইল একটা টেনে নিয়ে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুতেই যেন পারে না। বার বারই কেবল ঘুরে ফিরে চিত্রা আর মনোতোষের মুখ মনে পড়ে। গত সন্ধ্যায় শ্মশানে বসে মনোতোষের কথাগুলো মনে পড়তে থাকে মিতালীর। প্রবীরের ব্যবহারে ইদানীং সমস্ত পুরুষ জাতটার উপরেই যে সুকঠিন ঘৃণা মিতালীর মনের মধ্যে জমে উঠেছিল, সেই ঘৃণারই পাশাপাশি মনোতোষের কথাগুলো যেন অন্য এক সুর জাগিয়ে তুলছে।

পুরুষের ভালবাসার প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা হারিয়ে মিতালীর যে মনটা কঠিন হয়ে উঠেছিল, সেই মনের মধ্যেই মনোতোষের গত সন্ধ্যার কথাগুলো যেন নতুন এক রঙ ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সব পুরুষই প্রবীর নয়, রঞ্জিৎ নয়—মনোতোষের মত পুরুষও আছে।

বেয়ারা এসে সামনে দাঁড়াল।

কি রে রামদীন?

নতুন ছোট সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।

কথাটা ঠিক যেন কানে যায়নি এমনি ভাবেই মিতালী বললে, ঠিক আছে তুই যা—

রামদীন চলে গেল।

উঠতে গিয়ে কিন্তু হঠাৎ মিতালীর মনে হল, নতুন ছোট সাহেব আবার কে তবে কি মিঃ মুখার্জী নেই। পরশুও তো দেখেছে মিতালী মিঃ মুখার্জীকে অফিসে। তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছে। ছুটি নিয়েছে তাকে বলে। এর মধ্যে আবার নতুন ছোট সাহেব কে এল!

এক দিন তো মাত্র সে অফিসে আসে নি।

মিতালী চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে চলল ছোট সাহেবের কামরার দিকে

মে আই কাম ইন!

ইয়েস!

অনুমতি নিয়ে ভিতরে পা দিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়াল মিতালী।

ছোট সাহেবের চেয়ারে বসে প্রবীর হাজরা। স্যুটটাই পরা প্রবীর হাজরা রিভলভিং চেয়ারটায় বসে সামনে একটা টেবিলের উপরে রক্ষিত ফাইলের পাতায় লাল পেনসিল দিয়ে কি সব দাগ দিচ্ছিল মিতালী ঘরে প্রবেশ করা সত্ত্বেও সে চোখ তুলে তাকাল না, যেমন ফাইলে দৃষ্টি ছিল পূর্ববৎ তেমনি ফাইলের উপরেই দৃষ্টি রেখে কেবল বললে, বসুন মিস চক্রবর্তী।

ততক্ষণে মিতালী নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। উল্টোদিকে অর্থাৎ প্রবীরের ঠিক মুখোমুখি যে চেয়ারটা ছিল সেটাই টেনে নিয়ে বসল মিতালী।

আপনার শর্টহ্যাণ্ড জানা আছে, মিস চক্রবর্তী?

ফাইলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই প্রশ্নটা করে প্রবীর হাজরা।

না।

তা হলে তো মিঃ মুখার্জী যে পোস্টের জন্য আপনাকে রেকমেণ্ড করে গিয়েছেন সেটা আপনাকে দিতে পারছি না। কারণ ঐ পোস্টে যেতে হলে ক্যাণ্ডিডেটের শর্টহ্যাণ্ডটাও জানা দরকার।

আমি কোন দিনই শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং জানি না। বরাবর একাউন্টসেই কাজ করে এসেছি।

আপনাকে আমি দু' মাস সময় দিতে পারি। এর মধ্যে আপনি যদি আপনার এফিসিয়েনসি প্রুভ করতে পারেন, ইওর কেস উইল বি কনসিডারড নো ডাউট। আদারওয়াইজ—

আদারওয়াইজ?

ওয়েল। আপনি বুঝতেই পারছেন মিস চক্রবর্তী। এটা অফিস। বলতে বলতে এতক্ষণে মুখ তুলল ফাইল থেকে প্রবীর এবং বললে, প্রত্যেক অফিসেরই একটা আইন আছে, কানুন আছে—

স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল মিতালী প্রবীরের মুখের দিকে।

হঠাৎ পর মুহূর্তেই প্রবীর বললে, আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন এখন মিস চক্রবর্তী।

মিতালী ছোট সাহেব অর্থাৎ ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার প্রবীর হাজরার

অফিস-কামরা থেকে বের হয়ে এল। ব্যাপারটার আসল অর্থটা এতক্ষণে মিতালীর কাছে আলোর মতই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রবীর হাজরা যে তার অফিসে আজ তারই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে এসেছে, তার এক কলমের খোঁচায় যেমন তার উন্নতি হতে পারে তেমনি অবনতিও হতে পারে, সেই কথাটাই যেন চোখে আঙুল দিয়ে মিতালী চক্রবর্তীকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই একটু আগে ঐ কামরায় আজ তার ডাক পড়েছিল।

প্রবীর হাজরা—আজকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, যেন তার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিল, মিতালী চক্রবর্তী, তুমি আজ তারই অধীনস্থ কর্মচারী, সামান্য এক জন অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র। তিক্ততায় আর অপমানের জ্বালায় মিতালীর মাথা আর কান দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছিল। ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার প্রবীর হাজরার কামরা থেকে বের হয়ে মিতালী নিজের টেবিলে এসে বসল বটে কিন্তু কাজের মধ্যে কিছুতেই যেন মন আনতে পারে না। ঘুরে ফিরে কেবল প্রবীর হাজরার কথাগুলোই কানের মধ্যে ঝম ঝম করে বাজতে থাকে।

স্পষ্ট বুঝতে পারছে মিতালী, প্রবীর হাজরা সে রাত্রের শোধ তুলে নেবে। তারই ইঙ্গিত আজ সে দিল মিতালীকে, অর্থাৎ এবার থেকে প্রতি মুহূর্তে প্রবীর হাজরার মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হবে। তবে কি সে কাজে ইস্তফা দেবে! নচেৎ তাকে প্রবীর হাজরার পায়ের তলায় আত্মসম্মান লুটিয়ে দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে। শুধু কি ক্ষুন্নিবৃত্তি! আজকের দিনে তার মত এক অতিসাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার অর্থ যে কি তা কি সে জানে না। চাকরিটা থাকলে তবু জীবনটা এক রকম করে কেটে যাবে। কিন্তু চাকরি না থাকলে অনিশ্চিৎ ভয়াবহ এক ভবিষ্যৎ।

তা ছাড়া তাদের মত অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এক মেয়ের আত্মসম্মানের অহংকারই বা কেন? মিতালী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। এবং সোজা বাথরুমে গিয়ে কল খুলে মাথায় কানে ও ঘাড়ে বেশ করে ঠাণ্ডা জল দিল। মাথার মধ্যে যে আগুনটা জ্বলছিল সেটা যেন অনেকটা ঠাণ্ডা হয়। রুমালে মুখ মুছে মিতালী আবার এসে চেয়ারে বসে ফাইলটা টেনে নিল।

॥ ১২ ॥

রঞ্জিৎ তার মন থেকে চিত্রাকে যত সহজে মুছে ফেলবে ভেবেছিল তত সহজে কিন্তু মুছে ফেলতে পারে না। নিজের বিবাহের ব্যাপারটা রঞ্জিৎ সত্যি কথা বলতে কি চিত্রার ভয়েই অত্যন্ত গোপন রেখেছিল। ভয় ছিল তার—চিত্রা কোন ক্রমে ব্যাপারটা এক বার জানতে পারলে সহজে তাকে নিষ্কৃতি দেবে না। এবং চিত্রা যদি সত্যি সত্যিই তাকে সেই ভাবে এসে চেপে ধরত, জবাব দেবার মত যুক্তি সত্যিই কিছু ছিল না রঞ্জিতের।

কিন্তু অকস্মাৎ বিবাহের ঠিক পূর্বেই সেদিন সন্ধ্যার পরে চিত্রা যখন তার লেক অঞ্চলের নতুন ফ্ল্যাটে এসে জানিয়ে দিয়ে গেল এবং বুঝিয়ে দিয়ে গেল তার কাছ থেকে নিজের বিবাহের ব্যাপারটা সে যত গোপন করারই চেষ্টা করুক না কেন চিত্রা সব কিছু জেনে ফেলেছে, রঞ্জিৎ প্রথমটায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চিত্রা কেবলমাত্র যখন সেইটুকু জানিয়েই চলে গেল, কোন রকম বাদ-প্রতিবাদ ঝগড়া-ঝাঁটি এমন কি মান-অভিমান পর্যন্ত প্রকাশ করল না, মনের মধ্যে রঞ্জিৎ একটা ধাক্কা খেয়েছিল বৈকি। তবু শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেও মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অদৃশ্য কাঁটা খচ খচ করছিল। এবং সেই অদৃশ্য কাঁটাটাকে কিছুতেই মন থেকে যেন রঞ্জিৎ তুলে ফেলতে পারছিল না। সেই অদৃশ্য কাঁটাটাই সহসা বাসর-রাত্রে চিত্রার প্রেরিত গয়নাগুলো ও চিঠিটা পাওয়ার পর যেন মনের মাঝখানটিতে একেবারে বসে গেল।

যে প্রশ্নটা সেদিন তার মনের মধ্যে জমাটভাবে দেখা দিয়েছিল, সেটা হচ্ছে কেবলমাত্র উমার কাছেই নয়, চিত্রার কাছেও তার এবারে সত্যিকারের জবাবদিহি একটা করতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা কেবলমাত্র জটিলই নয়, নোংরাও হয়ে গেল। এবং কি জবাবদিহি কাকে দেবে যখন ভেবে ভেবে রঞ্জিৎ কোন কূলকিনারা পাচ্ছে না, ঠিক ঐ সময় চিত্রার আত্মহত্যার সংবাদটা সে সংবাদপত্রে পড়ে যেন একেবারে বোবা হয়ে গেল। চিত্রা—চিত্রা শেষ পর্যন্ত ট্রেনের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করল!

সংবাদপত্রটা হাতে করে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে রঞ্জিৎ? সারদা চা

এনে সামনে নামিয়ে রেখে গেল। এক সময় চা ঠাণ্ডাও হয়ে গেল, কিন্তু রঞ্জিৎ যেমন বসেছিল তেমনই বসে রইল। আজ মনে হল রঞ্জিতের, সত্যিই সে চিত্রার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এবং যে প্রতারণার কথাটা হয়তো এক দিন সকলেই ভুলে যেত, এমন কি চিত্রাও ভুলে যেতে পারত, চিত্রার আত্মহত্যার পর তার আর বুঝি কোন সম্ভাবনাই রইল না।

আজ সকলেই তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলবে, চিত্রার আত্মহত্যার জন্য সে-ই দায়ী। কারণ তাদের দু'জনার সম্পর্কের কথাটা তো কারুরই আর জানতে বাকী ছিল না। চিত্রার বান্ধবীরা তো বটেই, তারও বন্ধুরা জানত এক দিন সে চিত্রাকেই বিবাহ করবে। আজ আর চিত্রার কোন দোষ কেউ দেখতে পাবে না। সব কিছুর জন্য তাকেই দায়ী করবে। কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায় রঞ্জিতের। বেশীক্ষণ ঐভাবে বসে থাকতে পারে না। এক সময় চেয়ার থেকে উঠে ঘরে ঢুকে জামা গায়ে দিয়ে জুতো পায়ে রঞ্জিৎ বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অনির্দিষ্টভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল, তার পর এক সময় হাঁটতে হাঁটতে অফিসে গিয়ে হাজির হল। অফিসে ঢুকে সোজা গিয়ে নিজের টেবিলের সামনে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। আরও দশ দিন ছুটি ছিল রঞ্জিতের। ছুটির আর তার প্রয়োজন নেই এই মর্মে একটা জয়েনিং রিপোর্ট লিখল।

বেলা পৌনে দশটা নাগাদ জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সিং অফিসে এসে রঞ্জিতের জয়েনিং রিপোর্টটা পড়ে তখনই তাকে ডেকে পাঠালেন। মিঃ সিংও ঐ দিনকার সংবাদপত্রে চিত্রার সংবাদটা পড়েছিলেন। যদিও সংবাদটা তিনি পুলিস মারফত গত কালই পেয়েছিলেন। মিঃ সিং অবিশ্যি চিত্রা ও রঞ্জিতের ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটা জানতেন না। রঞ্জিৎ ঘরে এসে প্রবেশ করতেই মিঃ সিং শুধালেন, তোমার তো ছুটি এখনও ফুরোয় নি। এত তাড়াতাড়ি জয়েন করলে যে। কি ব্যাপার, বিয়ের জন্য ছুটি নিয়েছিলে, বিয়ে কর নি?

করেছি স্যার।

তবে এত তাড়াতাড়ি জয়েন করলে কেন?

পরে এক মাসের ছুটি নেবো স্যার, তাই—

ভাল কথা—মিস রায়ের ব্যাপার শুনেছ?

রঞ্জিৎ মাথা নীচু করে মৃদু ভাবে ঘাড় নাড়ে।

হাউ স্যাড! শি ওয়াজ এ নাইস গার্ল। হঠাৎ যে কেন ঐ ভাবে সুইসাইড করতে গেল।

রঞ্জিৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার জায়গায় আমি বোসকে দিয়েছিলাম। বোস এসেছে?

না। এখনও আসে নি।

বেশ। সে এলে তাকে নিয়োগীর জায়গায় কাজ করতে বলো, আজ আর কাল। পরশু অন্য ব্যবস্থা করব, নিয়োগী পরশু এসে জয়েন করবে। আচ্ছা তুমি যেতে পার।

রঞ্জিৎ উইশ্ জানিয়ে বেরিয়ে এল।

একে একে সব কর্মীরা অফিসে ঢুকতে লাগল। রঞ্জিৎ টের পায়, সকলেই ঘন ঘন তার দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু কেউ তার কাছে এগিয়ে আসে না বা তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টাও করে না। এই রকমই যে কিছু একটা হবে সে তো জানা কথাই, তবু রঞ্জিৎ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকে।

মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল রঞ্জিতের—এত তাড়াতাড়ি হুট করে অফিসে এসে সে জয়েন করতেই বা গেল কেন! সদ্য আজ সংবাদটা প্রকাশিত হয়েছে খবরের কাগজে। সদ্য ক্ষত স্থান থেকে এখনও রক্ত ঝরছে সবার।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়, রঞ্জিৎ কোন কাজ করতে পারে না। সামান্য ব্যাপারেও ভুল হতে থাকে কেবলই। অবশেষে রঞ্জিৎ এক সময় উঠেই পড়ল। এবং অফিসের বাইরে এসে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে শুরু করল ফুটপাথ ধরে।

গলাটা শুকিয়ে যেন একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সেই সকাল থেকে এক ফোঁটা জলও পেটে পড়ে নি। তবু ক্ষুধার কথা মনে হয় না এক বারও রঞ্জিতের। অনির্দিষ্টভাবে ফুটপাথ ধরে রঞ্জিৎ হেঁটেই চলে। ক্রমে বেলা গড়িয়ে যায়। চারিদিক সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে আসে। রাস্তার দু'পাশে ও দোকানে দোকানে আলোগুলো জ্বলে ওঠে। রঞ্জিৎ হাঁটছে তো হাঁটছেই।

রাত বোধ করি তখন এগারটা। রঞ্জিৎ বাড়িতে ফিরে এল। সারদা অপেক্ষা করে করে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল ঘরের মধ্যে একাকী জানালার কাছে দাঁড়িয়েছিল উমা। রঞ্জিৎ কলিং বেল টিপতেই উমা এসে দরজা খুলে দিল। এক বার মাত্র র[illegible]তের মুখের দিকে তাকাল উমা কিন্তু কোন কথা বলল না।

রঞ্জিৎ পাশ কাটিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করল। সামনের ছোট ব্যালকনিতে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে সারদা ঘুমোচ্ছিল। উমা গিয়ে সারদাকে ঠেলে তুলে দিল, সারদা, বাবু এসেছেন।

সারদা ধড়মড় করে উঠে বসে।

বাবুকে জিজ্ঞাসা কর স্নানের গরম জল দেবে কিনা।

ইজিচেয়ারটার উপরে ক্লান্ত দেহভার এলিয়ে চোখ বুজে পড়েছিল রঞ্জিৎ।

সারদা এসে ঘরে ঢুকে ডাকল, বাবু!

রঞ্জিৎ কোন সাড়া দেয় না।

সারদা আবার ডাকে, বাবু!

কি?

স্নান করবেন কি? গরম জল দেব?

গরম জল আছে?

আছে।

তবে দাও।

অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে রঞ্জিতের শরীরের গ্লানি যেন দূরীভূত হয়। মাথার মধ্যে যে দপ দপ করছিল সেটাও কমে। স্নান শেষে জামা গায়ে দিয়ে রঞ্জিৎ ঘরে এসে ঢুকতেই সারদা শুধায়, খাবার দেব?

তোমার বৌদি খেয়েছেন?

না।

তবে দু'জনার খাবারই দাও।

সারদা ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ নজরে পড়ে রঞ্জিতের—ঘরের কোণে দুটো টুকরিতে ফুল রয়েছে।

মনে পড়ে যায় ফুলের দোকানে সে আগে থাকতেই টাকা দিয়ে অর্ডার দিয়ে গিয়েছিল ফুলশয্যার ফুল ঐ দিনই সকালে দিয়ে যেতে। হাতের চিরুনিটা যেন রঞ্জিতের সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়। মনে পড়ে আজ তাদের ফুলশয্যা। জীবনের মধুরাত আজ তাদের। কত আশা, কত কল্পনাই না এই একটা মাস সে উমার সঙ্গে বিবাহ ঠিক হওয়া অবধি তার মনের মধ্যে রঙিন স্বপ্নের জাল বুনেছে। ঘুরে ঘুরে এটা ওটা কিনে এনে দিনের পর দিন এই ঘরটা সাজিয়েছিল রঞ্জিৎ।

হাতের চিরুনি হাতেই থাকে রঞ্জিতের, মাথা আর আঁচড়ানো হয় না। সারদা এসে ঘরে ঢুকল, বাবু, টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।

সারদার ডাকে চমকে ওঠে রঞ্জিৎ, অ্যাঁ—

খাবার দেওয়া হয়েছে টেবিলে।

আসছি।

মুখোমুখি দু'জনে খেতে বসল টেবিলে। সারা দিন পেটে কিছু পড়ে নি তবু এতটুকু ক্ষুধাবোধ ছিল না যেন রঞ্জিতের। কেমন যেন একটা বমি বমি ভাব। এটা-ওটা নাড়া-চাড়া করতে করতে হঠাৎ এক সময় রঞ্জিতের লক্ষ্য পড়ে উমাও কিছু খাচ্ছে না। তার যাবতীয় আহার্য প্লেটে তেমনিই পড়ে আছে। সারদা দু'জনকেই অনুযোগ জানায়, কিছুই তো খাচ্ছ না গো তোমরা কেউ! কি হল! খাও—

তবুও দু'জনেই আহার্য বস্তুগুলো নাড়া-চাড়াই করে। খায় না। মুখে কিছুই তোলে না।

রান্না কি ভাল হয় নি? সারদা শুধায়।

না, না—রান্না তোমার খুব ভাল হয়েছে সারদা। রঞ্জিৎ বলে।

তবে?

ক্ষিধে নেই—বলেই উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে রঞ্জিৎ। এবং বাথরুমের দিকে চলে গেল।

হাতমুখ ধুয়ে ঘরে এসে দেখে রঞ্জিৎ—ইতিমধ্যে তার ঘরেই দু'জনার শয্যা-রচনা করে রেখে গিয়েছে সারদা। এক বার শয্যার দিকে তাকিয়ে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রঞ্জিৎ।

আরও আধঘণ্টা পরে উমা যখন ঘরে এসে ঢুকল, রঞ্জিৎ তখন চতুর্থ সিগ্রেটে অগ্নিসংযোগ করেছে। উমার পদশব্দেই ফিরে তাকিয়েছিল রঞ্জিৎ। উমা ঘরে প্রবেশ করে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

উমার শান্ত অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে উমার দিকে চোখ তুলে নিঃশব্দে তাকায় রঞ্জিৎ।

গত দুই রাত ও আজকের সারাটা দিন ভেবেছি আমি। উমা আবার বলে, শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম—

কী?

বলছিলাম—যা ঘটে গিয়েছে তার পর তোমার কথা আমি জানি না, কিন্তু আমার পক্ষে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করাটা—

স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়।

তা ছাড়া আর আজ আমাদের একত্রে ঘর করতে হলে কি বলতে পারি বল? তাই বলছিলাম, লোকও না হাসিয়ে এবং দশ জনের চোখে পরস্পরকে আমরা ছোট না করে ঠিক যতটুকু সম্পর্ক রাখা যেতে পারে ততটুকুই ঠিক আমি রাখতে চাই।

কিন্তু উমা—

বাধা দিয়ে উমা বলে, জানি তুমি কি বলবে। তুমি হয়তো বলবে যা হয়ে গিয়েছে—কিন্তু সে তো তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না সেই হয়ে যাওয়াটাই এক জন স্ত্রীলোকের পক্ষে কতখানি। তার পর একটু থেমে আবার বলে উমা, দেখ, তোমার সম্পর্কে কোন প্রশ্নই আমি করতে চাই না। করবার ইচ্ছাও নেই আর। শুধু এর পর কি ভাবে আমরা চলতে পারি সেইটুকু জানালাম আমি।

তুমি কি তা হলে আমার এ বাড়িতেও থাকবে না।

থাকব বৈকি।

থাকবে? সত্যি বলছ থাকবে?

হ্যাঁ, থাকব তবে এক শর্তে।

কি?

যত দিন আমি একটা চাকরি-বাকরি না জুটিয়ে নিতে পারি তোমার এখানে থাকব এবং খাবও এখানে কিন্তু—

কিন্তু?

চাকরি একটা যদি যোগাড় করে নিতে পারি এবং যেদিন থেকে চাকরি পাব সেই দিন থেকেই তুমি আমার এখানে থাকা ও খাওয়ার জন্য টাকা নেবে এইটুকু প্রতিশ্রুতি আমাকে তোমায় দিতে হবে।

তুমি! তুমি পড়া ছেড়ে দেবে উমা?

হ্যাঁ।

কিন্তু তুমি তো বলেছিলে বিয়ের পরও তুমি পড়বে। বি. এ. এম. এ. পরীক্ষা দেবে।

বলেছিলাম কারণ সেদিন তাই ইচ্ছা ছিল আমার।

তবে?

কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছাই কি পূরণ হয়?

কিন্তু উমা, তুমি কি অন্তত বি. এ. পরীক্ষাটা পর্যন্ত—

না। অত সময় আমার কোথায়! শুধু সময়ই বা বলি কেন, ঐ বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেবার মত—

বিলাসিতা!

তা ছাড়া আর আমার মত এক জন মেয়ের কি হতে পারে বল? না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে আজ কোন একটা উপার্জনের পথ খুঁজে নিতেই হবে।

অতঃপর কি বলবে কোন কথাই যেন খুঁজে পায় না রঞ্জিৎ কিছুক্ষণ। চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকে।

হঠাৎ এক সময় রঞ্জিতের নজরে পড়ে—দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজাটার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে উমা।

রঞ্জিৎ ডাকে, উমা।

উমা ঘুরে দাঁড়াল।

একটা কথা উমা। আমি আমার নিজের অপরাধের সাফাই গাইছি না আর গাইবও না। কারণ আমি জানি অপরাধ অপরাধই—রঙিন ঢাকনা দিয়ে সত্যিকারের অপরাধের চেহারাটাকে আড়াল করা বা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রাক্‌বিবাহ জীবনে যৌবনের নেশায় যদি কোন মেয়ে বা ছেলের কোন দিন কোন পদস্খলন ঘটেই, সেটাই কি তাদের জীবনের একমাত্র সত্য হয়ে তাদের ভবিষ্যতের সমস্ত পথ ও সম্ভাবনাকে ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে অস্বীকার করবে।

কি বলতে চাও তুমি?

বলতে চাই এইটুকুই সেই পদস্খলনটাকে কি কোন মতেই ক্ষমা করা যায় না?

ক্ষমা!

হ্যাঁ, অপরাধ যদি আমি করেই থাকি একটা তার কি কোন ক্ষমাই হতে পারে না?

যায় কি না বা হতে পারে কি না জানি না। তবে যে মেয়েটি আজ তোমারই জন্য ট্রেনের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করল, আমার ভোলা সম্ভব নয় যে আমিও তারই মত এক জন মেয়ে। তোমার কথা তুমিই জান-কিন্তু আমি ক্ষমা চেয়ে নেবো আজ কার কাছে বলতে পার? না, এ তুমি বুঝবে না। তুমি তো মেয়ে নও। তুমি যে পুরুষ। বুঝতে তো পারবে না তুমি আত্মহত্যা করে সে আজ কেমন করে আমার ও তোমার সম্পর্কের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়ে গিয়েছে চিরদিনের মত।

তা হলে এই তোমার শেষ সিদ্ধান্ত ?

সিদ্ধান্ত এত বড় কথাটা উচ্চারণ করতে কি পারি। তবে আজ থেকে ঐ চেষ্টাই আমার একমাত্র চেষ্টা হবে।

কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না উমা। ঘরের দরজা খুলে পাশের ঘরে চলে গেল।

রঞ্জিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনল, ওদিককার খিলটা মধ্যবর্তী দরজায় তুলে দিল উমা।

রঞ্জিং যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ১৩ ॥

অফিস থেকে বের হয়ে মিতালীর মনে হল কাকা সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও তার কাকীমাকে দেখতে হাসপাতালে বা রামধন মিত্র লেনে কোথাও যাওয়া হয় নি আজ পর্যন্ত। তিন দিন হল শশিভূষণ তাকে কাকীমার অসুস্থতার সংবাদ দিয়েছেন কিন্তু আজ পর্যন্ত সে তাদের কোন খোঁজখবর নেয় নি। মার্কেট থেকে কিছু ফল কিনে সোজা মিতালী গেল হাসপাতালে।

কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছতে পৌঁছতেই ভিজিটিংয়ের নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ায় মিতালী ভিতরে প্রবেশের আর অনুমতি পেল না। অগত্যা তখন এমার্জেন্সি থেকে অনেক বলে কয়ে কাকীমার সংবাদটা নিয়ে জানল কাকীমা ভালই আছেন এবং আগামী কালই নাকি তাঁকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করা হবে। সংবাদটা পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয় মিতালী। ফলগুলো কাকীমার বেডে পৌঁছে দেবার অনুরোধ জানিয়ে সেগুলো এক জন দাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এল মিতালী।

পরের দিন রামধন মিত্র লেনে যাবে স্থির করে বালিগঞ্জ অভিমুখী একটা বাসে উঠে পড়ে মিতালী। মনটাও ভাল ছিল না, তা ছাড়া শরীরটাও ক্লান্ত লাগছিল বড়।

পরের দিন মনে মনে স্থির করা সত্ত্বেও কিন্তু রামধন মিত্র লেনে যাওয়া হয়ে ওঠে না মিতালীর। অফিস থেকে বেরুবে এমন সময় মনোতোষ বাবু এসে হাজির। খালি পা, এক মাথা রুক্ষ চুল, মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ধুতির উপরে গায়ে কোন জামা নেই, মাত্র একখানা গরদের চাদর জড়ানো। সমস্ত

চেহারায় ও বেশে যেন সর্বহারার এক বিষণ্ণতা। চোখ দুটো বসে গিয়েছে, যেন কত রাত ঘুমোন নি।

চমকে উঠেছিল মিতালী ঐ বেশে ও চেহারায় মনোতোষবাবুকে দেখে।

কি হয়েছে মনোতোষবাবু!

কই, কিছু হয় নি তো! ম্লান হেসে মনোতোষ জবাব দেয়।

এরকম চেহারা—

ও কিছু না—অশৌচ পালন করছি তো।

অশৌচ! কথাটা বলে যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গে তাকায় মিতালী মনোতোষের দিকে।

তা করতে হবে বৈকি। আমি ছাড়া কে অশৌচ পালন করবে?

কেন! আপনার মেয়ে—অনীতা—

করতে চেয়েছিল অবিশ্যি অনু। কিন্তু করতে দিই নি আমি।

করতে দেন নি?

না। গর্ভে ধরলেও সে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কটাও তো শেষ পর্যন্ত রাখে নি। আপনি হয়তো বলবেন সম্পর্ক তো সে আমার সঙ্গেও ছিন্ন করেছিল। করেছিল সে সত্যিই আইনের জোরে কিন্তু আমার মন তো তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নি। অগ্নি নারায়ণ শালগ্রামশিলা সাক্ষী রেখে যে তাকে আমি এক দিন স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছিলাম, আইনের জোরে কি সে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না তাই কিছু সম্ভব। সে যে আমার সহধর্মিণী ছিল। তাই আমাকেই তাঁর মৃত্যুতে অশৌচ পালন করতে হচ্ছে আর আমাকেই তার শেষ পারলৌকিক কাজটাও করতে হবে।

কথাগুলো বলতে বলতে মনোতোষের গলাটা যেন ধরে আসে। এবং নিজেকে বোধ হয় একটু সামলে নিয়েই বলেন, কাল তার শ্রাদ্ধ—

শ্রাদ্ধ?

হ্যাঁ। আপনি শ্মশান-বন্ধু! আপনাকে কিন্তু এক বার যেতে হবে।

বেশ। যাব।

আসবেন। আর—আপনি অন্তত তার আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করবেন। অনেক দুঃখ পেয়েছে সে—এবারে যেন সুখী হয়।

শেষ কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে অপরাহ্নের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায় মিতালী মনোতোষের চোখের কোল দুটো ছল ছল করছে।

মনটা এত বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল যে সে আর কোথাও যেতে পারে নি। সোজা ফিরে এসেছিল হোস্টেলে।

চিত্রাদির কথা ভেবে সত্যিই দুঃখ হয়েছিল। এত বড় ভালবাসাকে চিনতে পারল না চিত্রাদি।

পরের দিন মিতালী ভেবেছিল রামধন মিত্র লেনে এক বার ঘুরে টালায় মনোতোষের গৃহ হয়ে একেবারে হোস্টেলে ফিরবে। তাই একটু বেলাবেলিই অফিস থেকে বের হয়ে সোজা গিয়ে মিতালী হাজির হয় রামধন মিত্র লেনে কাকার বাসায়।

কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই মিতালী যেন থমকে দাঁড়ায়। সমস্ত বাড়িটা যেন অদ্ভুত রকমের স্তব্ধ। নীচে রান্নাঘরের সামনে টেঁপী ছেনী ও বুলা বসেছিল। তাদের মুখে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। অন্যান্য দিনের মত মিতালীকে দেখে তারা কোন রকম সংবর্ধনাও জানাল না। এক বার মাত্র মিতালীর মুখের দিকে তাকিয়ে যে যার দৃষ্টি নামিয়ে নিল। অজানিত একটা আশংকায় মিতালীর বুকের ভিতরটা যেন কেমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে। নিজের অজ্ঞাতেই মিতালী দাঁড়িয়ে যায়। তবু জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে টেঁপী। তোরা যে এখানে এ ভাবে বসে?

মণি—

মণি! কি হয়েছে মণির?

মণি বিয়ে করেছে।

বিয়ে করেছে! তার মানে?

এ পাড়ায় যে অরুণ সরকার ছিল, সেই যে যাকে সবাই হাবুল বলে ডাকে, কালীঘাটে গিয়ে মালাবদল করে সেই হাবুলকে আজ মণি বিয়ে করেছে।

হাবুল!

হ্যাঁ—ঐ যে মোড়ের মাথায় মহালক্ষ্মী জুয়েলারী স্টোর্স—হরিধন সরকার। তার ছেলে হাবুলকে বিয়ে করেছে। টেঁপী ধীরে ধীরে বলে আবার।

কে বললে?

একটু আগে ওরা এসেছিল যে মা বাবাকে প্রণাম করতে, ছেনী বললে।

তার পর?

বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন ওদের বাড়ি থেকে। টেঁপী জবাব দেয়।

সংবাদটা শুনে মিতালী সত্যিই যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

মনে পড়ে তার হাবুল ছেলেটিকে।

মোড়ের মাথাতেই মহালক্ষ্মী জুয়েলারী স্টোর্স। এ পাড়াতেই ওদের বাড়ি। বহুবার দেখেছে মিতালী হাবুল অর্থাৎ হরিধনের ছেলে ঐ অরুণ সরকারকে। কালো রোগা চেহারা। চুলে লম্বা মার্কা টেরি। ঘরের অবস্থা ভাল, বেশভূষা অত্যন্ত ছিমছাম। বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশী হবে না। লেখাপড়া ক্লাস এইটের বেশী নয়। কিন্তু তা হলে কি হবে, হাবুলের কথাবার্তা ব্যবহার চালচলনের মধ্যে একটা পরিচ্ছন্ন সংযত রুচি বরাবরই প্রকাশ পেয়েছে। এবং অন্য একটি গুণ হাবুলের যা সেটা হচ্ছে আধুনিক ও ভজন গানের এক জন নাম করা শিল্পী নাকি সে। তা হলেও মণি অর্থাৎ মণিমালা মাত্র ক্লাস টেনে এবারে পড়ছে, বয়সও পনের থেকে ষোলর মধ্যে, সে কি করে কাউকে না জানিয়ে কালী মন্দিরে গিয়ে মালা বদল করে হাবুলকে বিয়ে করল। এতখানি সাহস সে কোথায় পেল! এমনিতে তো মণি বাইরে শান্তশিষ্ট, কারও সঙ্গে বড় একটা কথাই বলে না।

সেই মণি। সত্যি, সেই কারণেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল যেন মিতালী সংবাদটা শুনে। কাকাবাবুর সঙ্গে এ সময়টা অন্তত একবার দেখা করা দরকার মিতালী মনে মনে ভাবে। পায়ে পায়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল মিতালী। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই শশিভূষণের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল মিতালীর। ঘরের মেঝেতে আবছা অন্ধকারে মাদুরের উপর বসেছিলেন শশিভূষণ আর তারই অল্প দূরে মলিন একটা শয্যায় শুয়ে কাকীমা। কাকীমা বোধ হয় কাঁদছেন।

মিতালীই ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল। শশিভূষণ কোন সম্ভাষণ বা আহ্বান কিছুই জানালেন না মিতালীকে। কিন্তু কথা বললেন সরস্বতী অর্থাৎ কাকীমা, মিতু শুনেছিস বোধ হয় মণি কি কেলেঙ্কারিটাই করেছে!

মিতালী বোধ করি জবাবটা দিতে যাচ্ছিল কিন্তু তার কাকার গলা শুনে থেমে কাকার মুখের দিকে তাকায়।

কেন, কেলেঙ্কারিটা সে কি করেছে শুনি! যে মতে যে প্রথাতেই হোক, বিয়ে তো করেছে।

ব্যঙ্গোক্তি করে ওঠেন সরস্বতী, তাই নাকি! তবে তাড়িয়ে দিলে কেন?

লজ্জায়, বুঝলে বড় বৌ লজ্জায়। তার বাপ হয়ে এত বড় একটা সংবাদের কিছুই জানলাম না আগে আর সেও জানানো আমাকে প্রয়োজন বোধ করে নি,

এ যে বাপ হয়ে মেয়ের কাছে কত বড় অক্ষমতা আর লজ্জার কথা তুমি বুঝবে না। বুঝলে প্রশ্ন করতে না কেন তাড়িয়ে দিয়েছি।

থাক। তোমাদের আজকালকার ওসব কাব্য আমি বুঝি না। বামুনের মেয়ে হয়ে কোন এক অজাতের ছেলের সঙ্গে বের হয়ে গেল—বলছি তোর কাকাকে—মিতালীর দিকে তাকিয়ে এবারে বলেন সরস্বতী, বলছি তোর কাকাকে থানায় গিয়ে একটা ডাইরী করে আসতে—নাবালিকা মেয়েটাকে আমাদের—

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে যেন খিঁচিয়ে ওঠেন শশিভূষণ, পাড়ার একটা ছেলে তোমার বয়সের মেয়েকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছে এই তো? কিন্তু আমি তা পারব না। আমার দ্বারা তা হবে না বুঝলে? বাপ হয়ে থানায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যে বলব বয়সের মেয়েকে আমার পাড়ার ছেলে বের করে নিয়ে গিয়েছে আর পরের দিন সমস্ত জগৎ সেই সংবাদ বসে বসে পড়বে—সে আমি কিছুতেই পারব না। তা ছাড়া থানায় গিয়ে ডাইরী করতে যে বলছ, কথাটা বলতে লজ্জা করছে না তোমার। পারতে বিয়ে দিতে মেয়ের?

তবে আর কি? যাক এবারে বাকী মেয়েগুলোও একে একে এ ওর হাত ধরে ঘর থেকে বের হয়ে—

সে আর তোমাকে বলতে হবে না। চোখ খুলে দেওয়ার জন্য তাদের আজকের দিনে অনেক ব্যবস্থাই আছে।

মিতালী কাকা-কাকীমার কথার মধ্যে একটিও কথা বলে না।

নিঃশব্দে বসে বসে ওদের কথাগুলো শোনে।

কিন্তু এও সে বুঝতে পারে অক্ষম বাপের কি মর্মান্তিক লজ্জা শশিভূষণের প্রত্যেকটি কথায় প্রকাশ পায়। কত বড় ব্যথায় এক অক্ষম বাপের বুকখানা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারে।

মিতালী এক সময় ধীরে ধীরে উঠে নীচে নেমে আসে। আজ হয়তো বাড়িতে হাঁড়িও চড়বে না। নীচে এসে টেঁপীকে তাগাদা দেয়, তোরা সব এমনি করে বসে আছিস কেন, রান্না-বান্না করতে হবে না। উনুনেও তো আগুন পড়ে নি দেখছি। ওঠ—উনুনে আগুন দে।

টেঁপীকে উঠিয়ে দিল মিতালী।

টেঁপীর সঙ্গে হাত লাগিয়ে মিতালী রান্নার যোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে বটেকিন্তু মনের মধ্যে মণিমালার ব্যাপারটাই আনাগোনা করছিল তখন। কোন অনুষ্ঠান বা নিয়মকানুনের ধার ধারে নি মণিমালা, মন্দিরে গিয়ে দেবতাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরের সঙ্গে মালা বদল করে হাবুলকে বিয়ে করেছে। হাবুলের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। সে ছেলে। কিন্তু মেয়ে হয়ে বিশেষ করে পনের ষোল বছরের একটি মেয়ে হয়ে এবং শশিভূষণের মত বাপের মেয়ে এত বড় সাহস সে কোথা থেকে পেল! মুখচোরা শান্ত নির্বিরোধী মেয়েটির মধ্যে এত বড় সাহস যে ছিল কোন দিনই তো ইতিপূর্বে বুঝতে পারে নি মিতালী।

জাতের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল না হয়, কারণ ব্রাহ্মণ হয়েও শশিভূষণের মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের কোন সংস্কারই ছিল না, আর আজও নেই। কিন্তু শুধু তো জাতের কথাই নয়, মাত্র দেবতাকে সাক্ষী রেখে মালা বদল করে বিবাহ করবার মনের জোর তো ওর বয়সী এক মেয়ের পক্ষে সামান্য ব্যাপার নয়। তার নিজেরই কি সে সাহস বা মনের জোর আছে! সাহস আর মনের জোরেরই পরিচয় দেয় নি মণিমালা, অকুণ্ঠিত চিত্তে মাথা উঁচু করে বাবা-মাকে প্রণাম জানাতে পর্যন্ত এসেছিল। ব্যাপারটা যত ভাবে ততই যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না মিতালীর।

মিতালী ডাকে, টেঁপী—

কি বড়দি?

একটা সত্যি কথা বল তো টেঁপী। কাকা-কাকীমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম কিন্তু তুইও কি এ ব্যাপারের কোন রকম পূর্বাভাস ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিস নি?

আমি জানতাম বড়দি।

জানতিস?

হ্যাঁ। ওদের ভালোবাসা অনেক দিন থেকে আমি জানতাম।

অনেক দিন থেকে মানে? ওদের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই বা হল কবে?

সে তো অনেক দিন।

অনেক দিন?

হ্যাঁ, অনেক দিন থেকেই তো হাবুলদার কাছে মণি গান শিখতে যেত। কেন মাও তো জানত, মণি হাবুলদার কাছে গান শিখতে যায়।

কাকীমা জানত।

জানত বৈকি। মা এখন নাকে কাঁদলে কি হবে। মা-ই তো আস্কারা দিয়েছে।

ওঃ তা বিয়ের কথাটা—

সে আবার বলবে কি! বাবা-মা কি বললে রাজী হত নাকি। আমাকে অবশ্যি বলেছিল যে আজ ওরা বিয়ে করবে।

অতঃপর মিতালী কিছুক্ষণ কোন কথাই আর বলতে পারে না। খোসা ছাড়িয়ে আলু কুটে থালায় রাখতে থাকে।

একটু পরে আবার বলে; টেঁপী—

কি?

হাবুলের বাবা হরিধন বাবু জানেন?

না।

জানেন না।

না। হাবুলদা বলেছে এখন বলবে না।

তবে?

টালায় একটা বাড়ির একতলায় দুখানা ঘর হাবুলদা ভাড়া নিয়েছে। সেখানেই গিয়ে ওরা উঠবে আপাতত—

তারপর?

তারপর আবার কি! হরিধন বাবুর তো ঐ একমাত্র ছেলে। ছেলে পছন্দ করে বিয়ে করেছে, আজ না হয় কাল মেনে নেবেই।

কিন্তু যদি না মেনে নেয়?

হাবুলদার মা তো জানে। সে বলেছে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ অতঃপর মিতালী কি যেন ভাবে। তার পর বলে, হাবুলদের নতুন বাসার ঠিকানা তুই জানিস টেঁপী?

জানি। আমার কাছে লেখা আছে।

সেই রাত্রেই রাত সাড়ে আটটা নাগাদ রামধন মিত্র লেনের বাড়ি থেকে বের হয়ে টেঁপীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা ঠিকানা অনুযায়ী হাবুলদের নতুন বাড়িতে গিয়ে হাজির হল মিতালী।

কড়া নাড়াতেই ভিতর থেকে মণির কণ্ঠস্বরে সাড়া এল, কে ?

দরজাটা খোল। মিতালী বলে।

মণিমালা এসে দরজা খুলে সামনে মিতালীকে দেখে যেন থমকে যায়। কয়েকটা মুহূর্ত তার কণ্ঠ দিয়ে কোন স্বর পর্যন্ত বের হয় না। কেমন যেন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে বোবা বোবা দৃষ্টিতে সামনে মিতালীর দিকে। মিতালীও চেয়ে চেয়ে দেখছিল মণিমালাকে। মণিমালা যেন এক নতুন রূপে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এমনিতে সব বোনেদের মধ্যে মণিমালার রংটাই একটু বেশী কালো। কিন্তু কালো হলে কি হবে, বোনেদের মধ্যে সব চাইতে সুন্দর মুখখানি মণিমালারই। যেমন সুন্দর কপালটি, মাথা ভর্তি তেমনি চুল, সুন্দর দুটি চোখ, বাঁশীর মত নাক। পরিধানে সাদা সিল্কের শাড়ি। কপালে ও সিঁথিতে ডগ ডগ করছে সদ্য বিবাহের সিন্দুরচিহ্ন। হাতে শাঁখা ও নতুন চুড়ি, নিশ্চয়ই হাবুল দিয়াছে, কারণ এত দিন সম্পূর্ণ নিরাভরণা ছিল মণিমালা।

কি দেখছিস রে অমন হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে? চিনতে পারছিস না? হাসতে হাসতে বলে মিতালী।

বড়দি—

কথাটা বলে তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে মণিমালা মিতালীর পায়ের ধুলো নিতে যেতেই দু'হাত বাড়িয়ে গভীর স্নেহে মণিমালাকে বুকের একেবারে মাঝখানটিতে টেনে নেয় মিতালী, ওরে থাক—থাক—আমি যে তোদের আশীর্বাদ করতে এসেছি—

মণিমালার ডাগর চোখ দুটো জলে ভরে যায়।

মিতালীর বুকে মাথা গুঁজে বলে, সত্যি, সত্যি বলছ বড়দি ?

ডান হাতে মণিমালার চিবুকটা তুলে ধরে তার অশ্রুসজল দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে স্মিত মুখে বলে মিতালী, সত্যি না তো কি মিথ্যে! কিন্তু তোর উপরে আমি খুব রাগ করছি মণি।

কেন বড়দি ?

কেন বড়দি মানে! আমাকে বুঝি খবরটা দেওয়া প্রয়োজনও মনে করিস নি! কি ভেবেছিলি বুঝি আমাকে জানালে আমি বিয়ে ভেঙে দেব, তাই না ?

না, না—তা কেন ? বলে সলজ্জ ভাবে মণিমালা মাথা নীচু করে।

তবে কি ?

কিন্তু তুমি খবর পেলে কি করে বড়দি ?

বাসায় গিয়েছিলাম যে।

মণিমালার মুখের আনন্দোজ্জ্বল ভাবটা মুহূর্তে যেন আবার আশংকায় কালো হয়ে ওঠে। মৃদু শংকিত কণ্ঠে শুধায়, বাবা কি বললে বড়দি ?

কোন দুঃখ করিস না মণি, আশীর্বাদ পাওয়ার যখন তোর সময় আসবে নিশ্চয়ই কাকার আশীর্বাদ তোরা পাবি। কিন্তু হ্যারে তুই একা, তোর বর হাবুলকে দেখছি না।

এই কিছুক্ষণ হল হোটেল থেকে খাবার আনতে গিয়েছে।

হোটেল থেকে ?

হ্যাঁ, কত বললাম যা হয় রেঁধে ব্যবস্থা হবেখন তা কিছুতেই শুনল না আমার কথা। কোথায় কোন বড় হোটেল থেকে বিলিতী খানা আর কি সব ফুল-টুল আনতে গিয়েছে।

ফুল। ফুল দিয়ে কি হবে রে ?

সলজ্জ মণিমালা মাথা নীচু করে।

ওমা। আজ তোদের মাত্র বিয়ে হয়েছে, কাল কালরাত্রি তার পর তো ফুলসজ্জা। উহু, এসব নিয়ম-কানুন মানতে হবে বৈকি।

নিয়ম-কানুন ?

নিশ্চয়ই। বিয়ে অমনি করলেই হল নাকি। নিয়ম-কানুন আছে না। হিন্দু ঘরের বিয়ে। তারপর একটু থেমে বলে, ঠিক আছে চল, তোদের ঘর-দোর দেখি।

একতলার দুখানা মাঝারী আকারের ঘর। জিনিসপত্র তখনও বিশেষ কিছুই কেনা-কাটা হয় নি। একটা চৌকি, এক প্রস্থ বিছানা, একটা বড় সাইজের চামড়ার সুটকেস, কিছু বাসনপত্র, একটা বালতি, একটা তোলা উনুন, শিল-নোড়া, ডালডা ও সরিষার তেলের একটা টিন, বঁটি, টুকিটাকি সব সংসার পাতবার মত জিনিস।

সব দেখতে দেখতে মিতালী মন্তব্য করে, বাঃ হাবুলের দেখছি তো সংসারের সব জ্ঞান আছে। সংসার পাতবার সব কিছুই ইতিমধ্যে কেনা হয়ে গিয়েছে—

ছাই। এসব ও করেছে নাকি। আমিই তো ক দিন ধরে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কিনিয়েছি। মণিমালা বলে।

ও দুষ্টু মেয়ে। তুমি তবে অনেক দিন থেকেই তলে তলে সব গোছাচ্ছিলে ?

বলতে বলতে মণিমালার গলাটা টিপে দেয় মিতালী, এর মধ্যে একেবারে পাকা বুড়ী গিন্নী হয়ে গিয়েছ দেখছি।

বড়দি, চা করব খাবে?

চা! তোরা তো উনুনেই আগুন দিস নি আজ দেখছি। তা চা করবি কিসে?

ইলেকট্রিক স্টোভ একটা কেনা হয়েছে না। তুমি বসো, এখুনি চা তৈরী করে দিচ্ছি? চা, চিনি, টিনের দুধ সব আছে ঘরে।

তাই নাকি। তবে বসা।

মণিমালা তাড়াতাড়ি ইলেকট্রিক স্টোভে নতুন কেনা এলুমিনিয়ামের কেতলিতে করে চায়ের জল চড়িয়ে দেয়।

চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে মণিমালাকে মিতালী।

সত্যি মণিমালাকে আজ যেন নতুন এক রূপে, নতুন এক সম্ভাবনায় দেখছে। আনন্দে খুশিতে ঝলমল দেখছে মণিমালাকে মিতালী। কুমারী মেয়ে মণিমালা নয়। বধূ ঘরনী মণিমালা। চঞ্চলা বালিকা মণিমালা নয়, নারী মণিমালা। রাতারাতি যেন একটি মেয়ে বধূত্বে, নারীত্বে রূপান্তরিতা হয়েছে।

এরই নাম কি বিবাহ! স্ত্রীলোকের জীবনের পরম ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি! এই দিনটির জন্যই কি মেয়েরা সেই পুতুল খেলার দিনটি থেকে স্বপ্ন দেখে? এরই প্রস্তুতির জন্য কি আর এক নারীর গর্ভ থেকে তারা ভূমিষ্ঠ হয়। কেমন যেন নেশা ধরে মিতালীর চোখে। মণিমালার দিকে চেয়ে চেয়ে তৃষ্ণা যেন তার মেটে না।

বেশ চটপটে মণিমালা। তিন কাপ চা করে এক কাপ টী'পটে রেখে বাকী দু'কাপ এক কাপ মিতালীকে দিয়ে এক কাপ নিজে নেয়।

মিতালী বলে, কেতলিতে চা রইল যে?

ও এলে খাবে। দিনে রাত্রে কেবল চা আর চা। কত কাপ যে চা খায়।

অদ্ভুত একটা মমতা যেন মণিমালার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে।

মণি—

কি বড়দি?

একটা কথা তোকে বলব ভাই। কিন্তু তারও আগে আর একটা কথা আমার জানা দরকার।

কি ?

তুই যেমন তাকে ভালবেসেছিস সেও—মানে হাবুলও তোকে তেমনি ভালবাসে তো ?

মাথা নীচু করে মণিমালা।

যাক বাঁচলাম। বুঝলাম তোর ভয় নেই, তুই নিশ্চিন্ত। কিন্তু ভাই সমাজে মাথা উঁচু করে থাকতে হলে কেবল তো মালা বদল করলেই চলবে না ভাই।

বড়দি—

হ্যাঁ, দুনিয়াটা বড় নোংরা, বড় সংকীর্ণ রে। ভালবাসারও এখানে যেমন সকলে দাম দেয় না, তেমনি বিশ্বাসেরও দাম দেয় না। তাই বলছিলাম—

কি ?

হিন্দু আনুষ্ঠানিক মতে না হলেও অন্তত বিয়ের ব্যাপারটা তোদের রেজিস্ট্রী করে সমাজকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে হবে।

রেজিস্ট্রী ?

হ্যাঁ। হাবুল এলে তাকে বলবি। এবং দেরি নয়, কালই যেন সে ব্যাপারটা শেষ করে নেয় হাবুল। কেমন, মনে থাকবে তো আমার কথাটা ?

বলব তাকে।

বলব শুধু নয়। ভবিষ্যতের জন্য—অর্থাৎ তোদের সন্তানদের জন্য এটা তোদের আজ সর্বপ্রথম কর্তব্য মনে রাখিস।

বেশ।

হ্যাঁ। নিজে তো বলবিই। আমার কথাও বলিস। এবারে ভাই আমি উঠব—

তুমি এখুনি চলে যাবে বড়দি ?

হ্যাঁ ভাই, এই ধারেই একটু কাজ আছে। সেই কাজটুকু সেরে ফিরতে হবে। তা ছাড়া রাতও সওয়া নটা বাজল। তুই একটা কাগজ আন দেখি।

কাগজ দিয়ে কি হবে বড়দি ?

আমার হোস্টেলের ঠিকানা আর অফিসের ফোন নাম্বারটা রেখে যাব। রেজিস্ট্রীটা হয়ে গেলেই হাবুল যেন আমাকে জানায়, কেমন ?

আচ্ছা। মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয় মণিমালা।

যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় মিতালী।

চল, দরজাটা বন্ধ করে দিবি।

হু' জনে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

রাস্তায় পা বাড়াবার আগে মিতালী আবার মণিমালার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, আর একটা কথা মনে রাখিস, পৃথিবীতে সবার ঘরের দরজা তোর কাছে বন্ধ হলেও আমার ঘরের দরজা চিরদিনই তোর জন্য খোলা থাকবে। আচ্ছা আজ আসি। কেমন।

মিতালী রাস্তায় নেমে যায়। মনোতোষের ওখানে এক বার ঘুরে যেতেই হবে। আজ চিত্রার শ্রাদ্ধ। মনোতোষকে সে কথা দিয়েছে। ইন্দ্র বিশ্বাস রোড কাছেই জানে মিতালী। এগিয়ে চলল সেই দিকে।

সে রাত্রে মনোতোষের বন্ধুর বাড়িটা খুঁজে পেতে মিতালীর তেমন কোন কষ্ট হয় নি। বাড়িটা একেবারে ট্রাম রাস্তার ধারেই। রাত যদিও সাড়ে নটা বেজে গিয়েছিল, মনোতোষ কিন্তু তখনও মিতালীর জন্য অপেক্ষা করছিল। কারণ মিতালীর সঙ্গে সামান্য পরিচয়েই মনোতোষ বুঝতে পেরেছিল, রাত যতই হোক মিতালী যখন কথা দিয়েছে আসবেই।

কোন অনুষ্ঠান নয়। বিশেষ কোন ব্যবস্থাও নয়। পরলোকগত আত্মার মুক্তি ও তৃপ্তির জন্য যেটুকু অবশ্যকরণীয়, তা-ই করেছিল মনোতোষ চিত্রার জন্য। এবং যা কিছু করেছিল নিজেই। অনীতাকে কিছুই করতে দেয় নি। তবে অনীতা কিছুতেই শোনে নি, রাত্রে মিতালীকে নিয়ে চার শ্মশান-বন্ধুকে বলা হয়েছিল, তাদের জন্য, রান্না করছিল অনীতাই।

বাইরের ঘরে একাকী মনোতোষ বসেছিল। মিতালী ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ত্রুটি স্বীকার করে, কতকগুলো কাজে আটকা পড়ায় দেরি হয়ে গেল মনোতোষবাবু—

তাতে কি হয়েছে, আসুন—

মিতালীর খিদে একেবারেই ছিল না এবং খাবার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু মনোতোষ মনে দুঃখ পাবে, তাই সে পাতে বসল। অনীতাই পরিবেশন করে।

আজ অনীতাকে ভাল করে যেন প্রথম দেখল মিতালী। মেয়ে যেন মায়ের অবিকল ছবিটি। অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়েটি। এবং উদ্ভিন্ন-যৌবনা সুন্দরী অনীতাকে দেখে বুঝতে পারে মিতালী প্রথম যৌবনে চিত্রা, এই মেয়েটির মা, কত সুন্দরী ছিল। কিন্তু অনীতার সমস্ত সৌন্দর্য যেন বিষাদের একটা করুণ ছায়ায় ঢাকা পড়ছে। এমন স্বামী এমন মেয়ে পেয়েও কেন যে চিত্রা স্বামীর যত্ন করতে পারল না। তুচ্ছ হতেও তুচ্ছতম কারণে কেন যে সে অমনি করে এদেরও দুঃখ

দিল এবং নিজেও সুখী হতে পারল না এবং শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ এক অপমৃত্যুকে বরণ করে নিল, সত্যিই যেন মিতালী ভেবে পায় না।

খাওয়া-দাওয়ার পর মনোতোষ বললে, কত কষ্ট দিলাম আপনাকে মিতালী দেবী!

না, না—ওকথা বলছেন কেন। কষ্ট কি!

রাত অনেক হয়ে গেল—

লাস্ট বাস এখনও পাব।

তা অবিশ্যি পাবেন। তবে বাইরেও আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

কলকাতা শহরের ঠাণ্ডা তো কিছুই না।

কথা বলতে বলতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় মিতালী।

অনীতা সামনেই দাঁড়িয়েছিল।

অনীতার দিকে চেয়ে বলে, আজ তবে আসি অনীতা কেমন?

আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। মৃদু কণ্ঠে অনীতা বলে।

নিশ্চয়ই। কি বল তো?

আপনি যদি একটু ভেতরে আসেন—

অনীতার সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে মিতালী।

কি বল তো?

বাবাকে কিন্তু জানাবেন না। কোন মতেই তিনি যেন না জানতে পারেন।

তুমি যখন বলছ তাই হবে।

আপনি তো মার সঙ্গে এক হোস্টেলেই ছিলেন।

কেমন কৌতূহল বোধ করে মিতালী অনীতার ঐ কথায়। বলে, হ্যাঁ—

আচ্ছা, মার—মানে মার কোন ফটো আছে সেখানে?

ফটো!

হ্যাঁ। মার ফটো। আমাদের বাড়িতে একটাও নেই। বাবা সব পুড়িয়ে ফেলেছে। যদি একটা ফটো থাকে মার—

দেখব খুঁজে। কিন্তু তোমার বাবাকে লুকিয়ে—

বাবা জানবে কেমন করে। আমার বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দেব।

বেশ। তাই হবে। যদি পাই—

আমার কলেজের ঠিকানায় আমাকে তা হলে একটা চিঠি দেবেন, আমি গিয়ে আপনার কাছ থেকে নিয়ে আসব।

বেশ।

হঠাৎ ঐ সময় আবার অনীতা বলে, বাবা মুখেই তার নাম করে না কথনও। আমাকেও করতে দেয় না কিন্তু মুখে না করলে কি হবে মা আজও বাবার সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে আমি জানি। গম্ভীর মানুষ, কোন কথা তো বলে না কিন্তু কত রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখেছি, একা একা উঠানে পায়চারি করছে।

আচ্ছা, আমি আজ চলি অনীতা, কেমন!

আসুন।

মনোতোষ পাশের ঘরে মিতালীর ফেরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। মিতালী ভেবেছিল হয়তো মনোতোষ জিজ্ঞাসা করবে অনীতা কেন তাকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে সব কিছুই জিজ্ঞাসা করল না মনোতোষ।

কেবল বলল, চলুন—আর দেরি করবেন না। অনেক রাত হল।

হ্যাঁ, চলুন।

দু'জনে রাস্তায় বের হয়ে পড়ে।

বাস স্ট্যাণ্ড বেশী দূরে নয়, কাছেই।

সত্যিই বাইরে সেদিন একটু ঠাণ্ডা পড়েছিল। অফিস থেকে বের হয়ে তাড়াতাড়িতে মিতালী গরম কিছুই গায়ে দিয়ে আসে নি।

বেশ শীত শীত করছিল তাই।

চলতে চলতেই এক সময় মিতালী প্রশ্ন করে, আপনি কবে আগরপাড়ায় ফিরে যাচ্ছেন মনোতোষ বাবু!

কাল বিকেলের দিকেই যাব। মেয়েটার পরীক্ষা কাছে এসে গিয়েছে—কদিন ক্ষতি হল ওর।

স্ট্যাণ্ডে ওরা যখন এসে পৌঁছাল, লাস্ট বাসটা তখনও ছাড়তে মিনিট দশেক দেরি। অত রাত্রে বিশেষ কোন যাত্রী ছিল না বাসে। মিতালীকে নিয়ে মাত্র জনা পাঁচেক যাত্রী। মিতালী বাসে উঠে বসলেও মনোতোষ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ছিল।

মিতালী বলে, আপনি আর দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন, এবারে ফিরে যান।

হ্যাঁ যাই।

মনোতোষ যেন কেমন একটু ইতস্তত করল, তার পর বললে, তা হলে চলি মিতালী দেবী। আর হয়তো আমাদের পরস্পরের দেখা হবে না কখনও, তবে চিরদিন আপনার কথা মনে থাকবে। আচ্ছা, চলি—নমস্কার।

বেলা হয়ে গিয়েছিল। স্নানের ঘরে আবার এ সময়টা মেয়েদের যেন রীতিমত একটা ভিড় লেগে যায়। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কে জানে? তোয়ালে ও সাবানটা নিয়ে মিতালী স্নানের ঘরের দিকে যায়।

উপর্যুপরি কতকগুলো ঘটনায় মিতালীর মনটা সত্যিই বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আগের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মিঃ মুখার্জী থাকলে হয়তো মিতালী কটা দিনের জন্য একটা ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে ছুটি নিত। কিন্তু প্রবীর হাজরার কথা মনে হতেই মিতালীর মনটা সংকুচিত হয়ে আসে। প্রবীর হাজরার কাছে সামান্যতম অনুগ্রহ চাইতেও সে পারবে না। তা ছাড়া গত কালই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল মিতালী, প্রবীর হাজরার সংস্পর্শে যত কম আসা যায় এবার থেকে তারই চেষ্টা করবে সে।

কিন্তু তবু সেদিন তাড়াতাড়ি করে এবং না খেয়েও অফিসে ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছতে পারল না মিতালী। অফিসে গিয়ে পৌঁছতে তার সেদিন প্রায় এগারটা বেজে গেল। কিছুটা অবিশ্যি বাস বিভ্রাটও হয়েছিল। পর পর চারটে বাসে কিছুতেই সে জায়গা করে উঠতে পারে নি। এবং অফিসে গিয়ে পৌঁছতেই রামদীন এসে বললে, ইতিপূর্বে সওয়া দশটা থেকে চার বার সে মিতালীর নাকি খোঁজ করে গিয়েছে। ছোট সাহেব তার খোঁজ করছেন।

ভ্রু দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে মিতালীর। ছোট সাহেব অর্থাৎ প্রবীর হাজরা তার খোঁজ করেছেন রামদীনের মুখে সংবাদটা শুনে।

মিতালী বলে, তুমি যাও, আমি আসছি।

অ্যাটেনডেন্স খাতায় নাম সই করতে গিয়ে মিতালী দেখল, যে টেবিলে খাতাটা থাকে সাধারণত, সে টেবিলে খাতাটা নেই।

পাশেই লেজার বাবু—গণপতি সান্যাল বসেন। অফিসের সকলের খুড়ো। সবাই তাকে খুড়ো বলেই ডাকে। অফিসের সব চাইতে পুরাতন কর্মচারী। বয়সও হয়েছে। বোধ হয় বছর খানেকের মধ্যেই রিটায়ার করবেন। নাদুস-নুদুস দেহ, বিরাট ভুঁড়ি। সর্বদাই পান আর সুগন্ধী জর্দা চিবোচ্ছেন। অফিসে যাদের জর্দার নেশা আছে তারা তো গণপতির কাছ থেকে জর্দা চেয়েনেয়ই, যাদের নেশা নেই তারাও মধ্যে মধ্যে গন্ধটার জন্য দু-একটা দানা চেয়ে নিয়ে পানের সঙ্গে মুখে দেয়। সদা হাসিখুশী রসিক মানুষটি। রসিয়ে ছাড়া বড় একটা কথাই বলেন না। মেয়ে কর্মচারীদের দিদিমণি আর পুরুষদের সব ভায়া বলে ডাকেন।

খাতাটা টেবিলে না দেখে মিতালী গণপতিকেই শুধায়, খাতাটা কোথায় গেল খুড়ো ?

গোলালো মুখটা তুলে কুতকুতে চোখে তাকালেন গণপতি, খাতা তো আজকাল আর দশটা পনেরর পর ওখানে থাকে না দিদিমণি।

থাকে না ?

না হুকুমনামা জারী হয়ে গিয়েছে যে !

কিসের হুকুমনামা ?

দশটা পনেরয় পাংচুয়ালি ঠিক ছোট সাহেব ঘরে খাতা যেতে হবে।

তাই নাকি !

হুঁ। স্ট্রিকট্ অর্ডার। নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু। বাবা এই চব্বিশ বছরের চাকরি জীবনে কত দেখলাম। কত ছোট সাহেব এল গেল। কত স্ট্রিকট্ অর্ডারই তামিল করলাম। বলতে বলতে পানের ডিবে খুলে আরও গোটা দুই পান মুখবিবরে প্রবেশ করিয়ে খানিকটা জর্দা তুলে নিলেন গণপতি।

মিতালী আর দাঁড়াল না।

ছোট সাহেব প্রবীর হাজরার কামরার দিকে এগিয়ে যায়।

॥ ১৫ ॥

ভিতরে আসতে পারি ?

সুইংডোরের ওপাশ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করে মিতালী।

কাম ইন !

সুইংডোর ঠেলে কামরার মধ্যে প্রবেশ করল মিতালী।

যথারীতি আগের দিনের মতই টেবিলের উপরে সামনে খোলা ফাইলটায় চোখ রেখে প্রবীর হাজরা কথা বলে, মিস চক্রবর্তী, আমি আজ ক দিন থেকেই নোটিশ করছিলাম ইউ আর অলওয়েজ লেট ইন ইওর অ্যাটেনডেন্স।

আজ একটু দেরি হয়ে গিয়েছে—

বললাম তো আজ নয়—আপনি প্রায় প্রত্যহই লেট্-কামার। অ্যাটেনডেন্সএ পাংচুয়াল হবার চেষ্টা করবেন ভবিষ্যতে। আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

অপমানের জ্বালায় কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছিল মিতালীর। কিন্তু কোন কথা বলতে পারে না। মাথা নীচু করে বের হয়ে আসবার জন্য পা বাড়াতেই প্রবীর

হাজরা আবার ডাকল, তিন নম্বর ফাইলে আমি যে নোটস দিয়েছিলাম পড়ে সেই মত সব ঠিক করে রেখেছেন তো?

না। এখনও করে উঠতে পারি নি।

কেন?

সময়—

সময় পান নি? কিন্তু আমি কি বলি নি ইট ওয়াজ ভেরি আর্জেন্ট।

মিতালী চুপ করে থাকে।

কি জবাব দিচ্ছেন না যে?

মিতালী তবু সাড়া দেয় না।

ঠিক আছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি ফাইলটা কম্‌প্লিট চাই।

কিন্তু—

আই থিংক ইউ গট্ মাই অর্ডার মিস চক্রবর্তী।

মিতালী অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে আসে। মিতালী আজ স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিল, প্রবীর হাজরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েই আসরে নেমেছে। এত সহজে তাকে নিষ্কৃতি দেবে না। ফিরে এসে মিতালী চেয়ারে বসে যতই ভাবে বা ভাববার চেষ্টা করে ব্যাপারটা, কূল-কিনারা কিছু পায় না।

বুঝতে পারছে সে স্পষ্টই প্রবীর হাজরা হিংস্র নখর বিস্তার করেছে। কিন্তু ঠিক তার মনোগত বাসনাটা কি তা বুঝতে পারে না মিতালী। প্রবীর হাজরাকে মিতালী ভাল করেই চেনে। কোন রকম কাঁচা কাজ বা হাস্যকর কিছু সে করবে না। অথচ যা করবে মোক্ষম ভাবেই তা করবে। কিন্তু এভাবে প্রবীর হাজরার সঙ্গে এক অফিসে কাজ করা তো তার পক্ষে মুশকিল। মনের ঐ দুশ্চিন্তার মধ্যেই নির্দিষ্ট ফাইলটা টেনে নেয় মিতালী। এবং ফাইলের মার্জিনে প্রবীরের নোট অনুযায়ী সংশোধন করতে শুরু করে। কিন্তু বিক্ষিপ্ত মন কিছুতেই যেন সংশোধনের কাজটা সুষ্ঠুভাবে করে উঠতে পারে না।

নিজের উপর নিজের কেমন যেন একটা বিরক্তি এসে যায় মিতালীর। এলোমেলো চিন্তা মনের মধ্যে এসে ভিড় করতে থাকে। হঠাৎ ঐ সময় একটা কথা মনে হওয়ায় একটা সাদা কাগজ টেনে নিয়ে একেবারে খোদ জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ছুটির দরখাস্ত লিখতে শুরু করে। তার শরীর খুব খারাপ। ডাক্তার নির্দেশ দিয়েছেন তাকে এক মাসের বিশ্রাম নিতে, অতএব তাকে এক মাসের ছুটি দিলে বাধিত হবে।

ছুটির দরখাস্তটা লিখে এক মুহূর্তও আর দেরী করে না মিতালী। দরখাস্তটা হাতে করে সোজা গিয়ে একেবারে জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সিং-এর কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বেয়ারাকে বলল সে বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বড় সাহেব ডেকে পাঠাতেই ঘরে ঢুকে মিতালী ছুটির দরখাস্তটা কৃপাল সিংয়ের টেবিলের উপরে রাখল।

কি এটা?

আমি এক মাসের ছুটি চাই—

ছুটি! কিন্তু সে জন্য আমার কাছে এসেছ কেন, মিস চক্রবর্তী? মিঃ হাজরার কাছে যাও। তার পর যেন কি ভেবে আবার বলেন, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও—

মিতালী ঘর থেকে বের হয়ে এল।

ঐ দিনই বেলা চারটে নাগাদ মিতালীর ছুটির দরখাস্ত ফিরে এল; ছুটি তার মঞ্জুর হয়েছে তবে এক মাসের জন্য নয়, মাত্র পনের দিনের জন্য। এবং মঞ্জুর করেছে প্রবীর হাজরাই। ইতিমধ্যে ফাইলটাও কোন মতে সংশোধন করা হয়ে গিয়েছিল। দরখাস্তটা হাণ্ড ব্যাগে ঢুকিয়ে ফাইলটা প্রবীর হাজরার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল মিতালী এবং যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে এমন সময় আবার রামদীন এসে সামনে দাঁড়াল।

কি?

আপনাকে ছোট সাহেব এক বার ডাকছেন।

কথাটা শুনেই—হঠাৎ ছোট সাহেব নামটা কানে যেতেই যেন দপ করে জ্বলে ওঠে মিতালী। এবং রীতিমত একটা কড়া জবাবই তার গলা দিয়ে বের হয়ে আসছিল কিন্তু নিজেকে সামলে নিল মিতালী। বললে কেবল, আসছি যাও।

রামদীন চলে গেল।

মিতালী ক্ষণকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে প্রবীর হাজরার কামরার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু মাঝপথ বরাবর গিয়ে হঠাৎ আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে দিয়েই বাঁ হাতি ঠিক নীচে যাবার সিঁড়িটা নেমে গিয়েছে। অনেকেই সেই সিঁড়ি দিয়ে তখন নামছে। মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল মিতালী। এবং তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

*

অন্যান্য দিন ট্রামে বা বাসেই হোস্টেলে ফেরে মিতালী, আজ কিন্তু একটা ট্যাক্সি থামিয়ে তাতেই উঠে বসল। বাঙ্গালী ড্রাইভার প্রশ্ন করে, কোন দিকে যাব ?

বালিগঞ্জ চলুন। জবাব দেয় মিতালী।

ট্যাক্সিচালক থিদিরপুর রাস্তা ধরছিল, কিন্তু মিতালী বললে, না, না—স্ট্যাণ্ড রোড ধরে চলুন—তার পর রেড রোড—

গাড়ি নির্দেশ মতই ছুটল।

সে রাত্রে মিতালী চলে যাবার মিনিট পনের কুড়ি বাদেই ফিরে এল হাবুল ট্যাক্সিতে করে খাবার ফুল ইত্যাদি নিয়ে। প্রচুর ফুল এনেছিল হাবুল। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ টাকার ফুল। দুটো ঝাঁকা একেবারে ভর্তি। সদর দরজাটা বন্ধ করে হাবুল মণিমালার দিকে তাকিয়ে স্মিতহাস্যে বললে, এসো, দু'জনে মিলে আগে ফুল দিয়ে ঘরটা সাজিয়ে ফেলি।

মণিমালার দিক থেকে কিন্তু কোন সাড়া আসে না।

সে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকে। বড়দি, মিতালীর কথাগুলো তখনও তার মনের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করছিল।

মিতালীর সেই কথা—কিন্তু ভাই সমাজে মাথা উঁচু করে থাকতে হলে তো কেবল মালা বদল করলেই চলবে না। দুনিয়াটা বড় নোংরা, বড় সংকীর্ণ রে। ভালবাসারও এখানে যেমন সকলে দাম দেয় না তেমনি বিশ্বাসেরও দাম দেয় না। হিন্দু আনুষ্ঠানিক মতে না হলেও অন্তত বিয়ের ব্যাপারটা তোদের রেজিস্ট্রী করে নিতেই হবে।

হাবুল তাড়া দেয়, কি হল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন। এসো তাড়াতাড়ি করে ফেলি। রাত অনেক হয়েছে।

ক্ষীণ কণ্ঠে এবারে কোন মতে বলে মণি, কি হবে সাজিয়ে ?

কি হবে সাজিয়ে মানে !

কথাটা বলে অবাক, বিস্ময়েই যেন তাকায় হাবুল মণিমালার মুখের দিকে। তার পর বলে, প্রথম মিলন-রাত আমাদের জীবনে—ফুলশয্যার রাত—সাজাব না ঘর !

আজ তো সবে বিয়ে হল। কাল কালরাত্রি, তার পর তো ফুল-শয্যা।

মণিমালার কথায় এবং বিশেষ করে তার কণ্ঠস্বরে হঠাৎ যেন অতর্কিতেই

একটা ধাক্কা খায় হাবুল। কয়েকটা মুহূর্ত তার মুখ থেকে কোন কথাই যেন বের হয় না। চেয়ে থাকে মণিমালার মুখের দিকে।

বড়দি এসেছিল। মণিমালা এবারে বলে।

বড়দি! মানে মিতালী?

হ্যাঁ।

কখন?

কিছুক্ষণ আগে। সে কতকগুলো কথা বলে গিয়েছে।

কি কথা!

আমাদের বিয়েটা রেজিস্ট্রী করে আইনসিদ্ধ করে নিতে হবে।

রেজিস্ট্রী!

হ্যাঁ।

তা বেশ তো। তা নয় করা যাবে।

করা যাবে নয়। কাল পরশুর মধ্যেই—

তাই না হয় হবে। এসো—বলে এগিয়ে এসে হাবুল মণিমালার হাতটা ধরবার চেষ্টা করতেই মণিমালা সরে দাঁড়ায়।

বলে, না—

মণি!

না। আগে রেজিস্ট্রী করে বিয়েটা আমাদের হোক, তার পর—

দেবতাকে সাক্ষী রেখে মালা বদল করে যে আমরা বিয়ে করলাম সেটা বুঝি তা হলে কিছুই না।

কিছুই না তা তো আমি বলি নি।

তবে?

সেই জোরেই তো তোমার হাত ধরে আমি ঘর থেকে আজ চলে এসেছি। কিন্তু বড়দিও তো মিথ্যা বলে নি। তা ছাড়া সে বিয়ে তুমি আমি মানলেও তো আইন মানবে না।

আহা। বলছি তো তাই যখন তোমার ইচ্ছা, তাও হবে। কিন্তু সে তো এই রাত্রেই হবে না। সকাল হোক তার পর তো।

হ্যাঁ বড়দি বলে গিয়েছে আর এক দিনও দেরি না করে রেজিস্ট্রী করে বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে।

তাই, তাই—হবে—এখন এস তো ঘরটা সাজাই। আচ্ছা এক পাগলের

কোথায় ?

কি কাজ আছে বেরিয়েছে ? অমন করে বসেছ কেন বড়দি ? ভাল করে খাটের উপর উঠে বসো না। এক কাপ চা করে আনি—

না রে না। ব্যস্ত হোস নে, বোস'তো তুই।

বলে হাত বাড়িয়ে মণিকে পাশে টেনে জড়িয়ে বসে মিতালী।

তার পর মণি, কেমন আছিস ?

খুব ভাল।

খুব ভাল লাগছে বুঝি সংসার ?

খুব ভাল, জান বড়দি !

কি ?

না থাক।

ওরে আমার কাছে আবার লজ্জা কি, বল !

ও যে এত ভাল বিয়ের আগেও বুঝতে পারি নি।

তাই নাকি ?

হু। খুব ভাল।

বেশ বেশ—তোরা সুখী হ ভাই। তার পর, রেজিস্ট্রী করিয়ে নিয়েছিস তো ?

হুঁ, করে। বিয়ের কাগজটা পর্যন্ত আমার কাছে রয়েছে।

বিয়ের কাগজ ?

কেমন যেন বিস্ময়ে মিতালী মণিমালার মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ—বিয়ের কাগজটা। দেখবে ?

কই দেখি !

ছুটে গিয়ে তখনই চাবি দিয়ে স্যুটকেস খুলে একটা কাগজ এনে মিতালীর হাতে দিল মণিমালা। বিস্ময়ে অভিভূত নির্বাক মিতালী মণিমালার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল। এবং মেলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে যেন স্তম্ভিত হয়ে যায় মিতালী।

একটা ফুলস্কেপ সাইজের কাগজ, তার উপরে মণিমালা ও অরুণ সরকারের নাম লেখা। এবং তার নীচে প্রায় পূর্ণ পৃষ্ঠা জুড়ে আবোল-তাবোল অর্থহীন সব ইংরাজীতে টাইপ করা। নীচে আবার দুজনের লাল কালিতে নাম সই করা।

বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মিতালী হাতের কাগজটার দিকে। একটি শব্দও তার মুখ দিয়ে বের হয় না।

মণিমালা কিন্তু তখনও পরমোৎসাহে বলে চলেছে, দেখলে, ভাগ্যে তুমি বলে গিয়েছিলে। পরের দিনই সন্ধ্যাবেলা গিয়ে—অফিস তখন বন্ধ, তবু রেজিস্টার সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তার বিয়ের খাতায় দু'জনার নাম সই করিয়ে রেজিস্ট্রীর কাগজ দুই জনে সই করেছি। দেখ না—ও নাম শুধু লিখেছিল প্রথমে অরুণ সরকার, কিন্তু আমি জোর করে পাশে হাবুল নামটাও সই করিয়ে নিয়েছি। কি বল বড়দি, ভাল করি নি ?

মিতালী যেন পাথর।

বড়দি!

এতক্ষণে মিতালীর মুখের দিকে মণিমালার ভাল করে দৃষ্টি পড়তে যেন থমকে যায়।

কি হয়েছে বড়দি ? কোন ভুল আছে কি কোথায়ও ?

মণি! হাবুল তোর সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

প্রতারণা!

হ্যাঁ, জঘন্য প্রতারণা! সে এক নম্বরের একটা ঠক্—জোচ্চোর।

বড়দি! আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে মণিমালা।

হ্যাঁ, যদি তুই অন্ধ বিশ্বাসে আর ভালবাসায় তার যা কিছু সব সত্যি বলে না ধরে নিয়ে ব্যাপারটা এক বারও তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতিস, এই কাগজটার মানে বের করবার চেষ্টা করতিস তো বুঝতে তোর বাকী থাকত না আজ কিছুই। কোথায় তোকে সে নিয়ে গিয়েছিল জানি না, তবে সে রেজিস্ট্রী অফিসও নয় আর রেজিস্ট্রী করে তোকে আজ পর্যন্ত সে বিয়েও করে নি।

তুমি—তুমি ঠিক বলছ বড়দি ?

হ্যাঁরে, হ্যাঁ—

কিছুক্ষণ অতঃপর মণিমালা যেন পাথরের মতই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর তার দু'চোখের কোল ছাপিয়ে দর দর করে অশ্রু নেমে আসে এবং ভাঙা গলায় বলে, আমি তাকে অবিশ্বাস করতে পারি নি বড়দি, আমি তাকে অবিশ্বাস করতে পারি নি—

জানি। আমি কি তা জানি না রে! কাঁদিস নে—চুপ কর।

না কাঁদব না আর। কাঁদব কেন!

কথা বলে বটে মণিমালা কিন্তু তার চোখের জল থামে না। দু'চোখের কোল ছাপিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় তার চিবুক ও গণ্ড প্লাবিত করতে থাকে।

কখন সে ফিরবে?

সন্ধ্যা নাগাদ ফেরে।

ভয় নেই তোর, আমি যখন ব্যাপারটা জানতে পেরেছি একটা ব্যবস্থা হবেই। আর ব্যবস্থা করা তখনই আমার পক্ষে সম্ভব হবে যদি তুই আমার কথা মত চলিস মণি।

আর কি ব্যবস্থা তুমি করবে বড়দি! আমার যা সর্বনাশ হবার তা তো হয়েই গিয়েছে—এখন হয় গলায় দড়ি দেওয়া বা গঙ্গার জলে—

মণি! চিৎকার করে ওঠে মিতালী, থাম, ওকথা বলা তো দূরের কথা, উচ্চারণ করাও পাপ। কেন, কেন—তুই আত্মহত্যা করতে যাবি। তোর জীবনটা কি এতই তুচ্ছ? শক্ত হতে হবে তোকে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, যে মণিমালা ভালবেসে তার সঙ্গে ঘর ছেড়ে আসে সে মণিমালাকে পেতে হলে তার যোগ্য মর্যাদা দিয়েই পেতে হবে আর সে মর্যাদা তাকে দিতেই হবে।

কিন্তু বড়দি—

না। মেয়েরা আমাদের দেশে প্রতিপদে ওদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিই বলেই ওরাও পেয়ে বসে। ওদের এই অন্যায় জুলুম আর অত্যাচার অবাধে আমাদের উপর দিয়ে এত দিন চালিয়ে গিয়েছে, আজও যাচ্ছে, কিন্তু তা হতে আর দেব না।

মিতালীর বুঝি মনে পড়ছিল মাত্র মাস দেড়েক আগেকার কথা। তার রুম-মেট কৃষ্ণা মৈত্রের কথা। আজকের মণিমালার মতই কৃষ্ণা মৈত্রও ঠকেছিল। এবং ঠকেছিল অরুণ সরকারের মতই আর এক পুরুষের কাছে। এবং মিতালী তাকে সেদিন বোঝাবার চেষ্টা করেও বোঝাতে পারে নি। অন্যায়কে মাথা পেতে নিয়ে বাথরুমের মধ্যে পরনের শাড়ীটায় ফাঁস লাগিয়ে প্রাণ দিয়েছিল। শুধু কি কৃষ্ণা মৈত্রই! তার মত আরও কত মেয়ে যে ঐ ভাবে প্রাণ দিয়েছে এবং আজও দিচ্ছে। সেদিন কৃষ্ণা মৈত্রকে সে বাঁচাতে পারে নি কিন্তু মণিমালাকে আজ সে বাঁচাবেই। মণিমালাকে সে কিছুতেই পরাজয় মেনে নিতে দেবে না।

অন্যান্য দিন হাবুল সন্ধ্যা নাগাদ ফেরে কিন্তু সেদিন বেলা চারটে নাগাদই বাইরে তার গলার স্বর পাওয়া গেল। কড়া-নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

মণি, দরজা খোল—

যা তুই পাশের ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে বসে থাক ! যতক্ষণ না আমি ডাকব এ ঘরে আসবি না। যা—

মণিমালাকে এক প্রকার ঠেলেই মিতালী পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিল। তার পর নিজে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

মিতালী হাবুলের অপরিচিত নয়, বহু বার পাড়ায় দেখেছে তাকে। যদিও কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে নি। মিতালীকে দরজা খুলে দিতে দেখে হাবুলের বুকের ভিতরটা যেন ধক করে ওঠে। মিতালী আবার কি করতে এল !

এসো হাবুল দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? সস্নেহে আহ্বান জানায় মিতালী হাবুলকে।

মিতালী সস্নেহে আহ্বানেও কিন্তু হাবুলের ভয় দূর হয় না। সে যেন একটু শ্লথ পদেই ঘরে প্রবেশ করে। মিতালীই আবার দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

তার পর কেমন আছ হাবুল ?

ভাল। কোন মতে ঢোক গিলে যেন কথাটা উচ্চারণ করে হাবুল।

সম্পর্কে তুমি আমার ভগ্নিপতি হয়েছ, আপনার জন। আমি এক দিন এসেছিলাম তাও বোধ হয় শুনেছ মণির কাছে ?

অতি কষ্টে যেন হাসবার চেষ্টা করে হাবুল বলে, হ্যাঁ, শুনেছিলাম—ওই দেখুন, আপনি আমার গুরুজন সম্পর্কে, আপনাকে একটা প্রণাম করা উচিত—বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে যেতেই মিতালী বাধা দিয়ে বলে, থাক ভাই থাক। তোমরা সুখী হও।

এতক্ষণে মিতালীর কথাবার্তায় অনেকটা ভয় যেন কেটে গিয়েছিল হাবুলের, সে এবারে একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করেই বলে, মণিকে দেখছি না, সে কোথায় ?

মণি ! মণি আছে ও ঘরে, বসো না তোমার সঙ্গে একটু গল্প করি।

চা খেয়েছেন, মণি অ মণি—

ব্যস্ত হতে হবে না, তুমি বসো তো।

দাঁড়ান না, মণিকে চায়ের কথাটা বলে আসছি—

না। তুমি বসো।

অগত্যা হাবুলকে ফিরে বসতেই হল।

হাবুল তোমার কাছে কিন্তু ভাই এটা আমি আশা করি নি—

চমকে হাবুল মিতালীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কি আশা করেন নি ?

মিতালীর হাতের মুঠোর মধ্যেই এতক্ষণ সেই ভাঁজ করা কাগজটা ছিল, হাবুলের নজরে আসে নি। সেই কাগজটা খুলে হাবুলের চোখের সামনে মেলে ধরে মিতালী বলে, এই যে—

ভূত দেখার মতই যেন চমকে ওঠে হাবুল। বাক্যস্ফূর্তি আর হয় না তার বুঝি।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে হাবুল মিতালীর হাতে ধরা কাগজটার দিকে।

সে যে তোমাকে ভালবেসে, তোমার কথার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এতদিনকার ঘর বাড়ি আপনার জন সব ছেড়ে তোমার হাত ধরে তোমার পাশে এসে দাঁড়াল, এই কি সেই ভালবাসা, সেই বিশ্বাসের ন্যায্য মূল্য তুমি দিলে!

হাবুল তখন রীতিমত ঘামতে শুরু করেছে।

কি বলবে, কি জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারছে না।

এ শুধু এক জনকে ঠকানোই নয় হাবুল, এই প্রতারণার, এই মিথ্যার ভিতর দিয়ে তুমি তোমার নিজের কত বড় সর্বনাশ করেছ তাও হয়তো বুঝতে পার নি। যে বিশ্বাস আর ভালবাসাকে তুমি আজ ঠকিয়েছ তুমি জান না আজও হয়তো সেই ভালবাসা আর সেই বিশ্বাস তোমার জীবনের কত বড় সম্পদ ছিল।

শান্ত ধীর সংযত কণ্ঠে তিলমাত্র উত্তেজনাও কোথাও নেই, কথাগুলো বলে যায় মিতালী। এবং হাবুলও বুঝতে পারে রীতিমত শক্ত পাল্লায় সে পড়েছে। এ মণিমালা নয়, এ মিতালী। এখানে অত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। কিন্তু ততক্ষণে আকস্মিক পরিস্থিতিটা অনেকটা ভিতরে ভিতরে সামলে নিয়েছিল হাবুল। নার্ভ, মনের জোর হারালে যে ঐ সময় চলবে না হাবুল সেটা অন্তত বুঝতে পেরেছিল।

দেখুন মিতালী দেবী, কোন কিছু আর গোপন করব না, সত্যি কথাটাই তা হলে বলি।

সত্যি কথা!

হ্যাঁ। ওকে আমি ভালবাসি। আর বিয়ে ওকে আমি করব বলেই নিয়ে এসেছি এবং বিয়ে করবও আপনি ঠিক জানবেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। মা অবিশ্যি আমার সাইডে আছে কিন্তু বাবা কথাটা শোনা অবধি একেবারে বেঁকে বসেছে। আনকালচার্ড অশিক্ষিত সেকেলে লোক তো! তাই—

তাই কি?

হুট করে এখন কিছু করে ফেললে হয়তো আমাকে অষ্টরম্ভা দেখাবে। ওইরকম বাপের অসাধ্য কিছুই নেই।

সত্যিই মিতালী চমৎকৃত হয়ে যায় হাবুলের কথাবার্তা শুনে। দুঃখও হয় কথাটা ভেবে, শেষ পর্যন্ত মণিমালা কার হাত ধরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

এ মানুষটা শুধু অশিক্ষিতই নয় একেবারে অপদার্থও যে।

তবু মিতালী বলে, এ সব কথা তো তুমি আগেই জানতে হাবুল।

তা আর জানতাম না। জানতাম বৈকি।

মণিকে কি এ সব কথাগুলো বলেছিলে?

পাগল হয়েছেন আপনি! এ সব সিরিয়াস ব্যাপার ও কি বুঝত—তা ছাড়া ওকে এসব কথা বলেই বা কি লাভ হত বলুন?

অন্য কি লাভ হত জানি না হাবুল, তবে এইটুকু লাভ হত, ও হয়তো তোমার হাত ধরে সেদিন বাইরে বের হয়ে আসবার আগে দু'বার চিন্তা করতে পারত। কিন্তু যাক সে কথা। তুমি এখন কি বলতে চাও তাই বল।

বলব আর কি! বিয়ে ওকে আমি করবই। আর রেজিস্ট্রী করেই করব তবে—

তবে কি?

বাবার অ্যাফেয়ারটা না চুকিয়ে করতে পারছি না। আপনিই বলুন না, বাবার ঐ দোকান বাড়ি ব্যাঙ্কের টাকা সব ছাড়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

না তা হবে না হয়তো।

নিশ্চয়ই হবে না। আর রেজিস্ট্রী করে বিয়ে করাটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আজ না হয় কাল হবেই। কিন্তু আপনার বোনটি তো সে সব কথায় কান দিতে চাইল না, শুনতেই চাইল না, তাই কি আর করা যায় ঐ একটা—

ফাঁকি দিয়ে বোকা মেয়েটাকে ভোলালে। ওর ভালবাসা আর বিশ্বাসকে ফাঁকি দিলে। শোন, বুঝতে আমি পারছি বৈকি হাবুল, কিন্তু এ চলবে না।

চলবে না। কি চলবে না?

এই ভাবে মিথ্যা ধাপ্পা দেওয়া। শোন, মণিকে আজই আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি—

নিয়ে যাচ্ছেন মানে?

নিয়ে যাচ্ছি। এর মধ্যে আবার মানের কি আছে।

কিন্তু—

শোন, মণিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। সত্যিই যদি মণিকে তুমি স্ত্রী হিসাবে

চাও তো কালই হোস্টেলে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি তোমাদের নাম রেজিস্ট্রী করে যা করবার করে দেব। এবং রেজিস্ট্রী মতে বিয়ে হয়ে যাবার পর যেখানে খুশি তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারো।

বেশ তো। সে জন্য আপনার ওখানে যাওয়ার কি প্রয়োজন। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি কালই আমি সব ব্যবস্থা করব।

আজ আর তা হয় না হাবুল।

কেন!

কারণ যে বিশ্বাসের মূল্য তুমি এক বার দিয়েছ তার পর আর ও কথা উঠতেই পারে না। শুধু তাই নয়, আরও কিছু তোমাকে আমার বলবার আছে।

কি?

কালকের সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব, তার পর থানায় গিয়ে রিপোর্ট করব।

রিপোর্ট!

রিপোর্টই নয় শুধু, ডায়েরী লেখাব—আমাদের নাবালিকাকে মেয়ে তুমি অসদুদ্দেশে বাড়ি থেকে বের করে এনেছ।

বেশ, তবে আপনি কি একটু বেশী বাড়াবাড়ি করছেন না মিতালী দেবী?

কি বললে? বাড়াবাড়ি করছি!

হ্যাঁ। ও স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে সেটা বোধ হয় আপনি জানেন না। জানলে—

সেটা আদালতেই না হয় প্রমাণ হবে! এক প্রকার হাবুলকে থামিয়ে দিয়েই কথাটা বলে মিতালী এবং বলার সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ডাকে, মণি, বেরিয়ে আয়।

কিন্তু ওকে যদি আমি না যেতে দিই মিতালী দেবী।

ঘুরে দাঁড়ায় সঙ্গে সঙ্গে মিতালী, কি বললে!

ওকে যদি না যেতে দিই—

মিতালী 'মণি' বলে ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই মণিমালা ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে এসেছিল।

যেতে দেবে না?

না। কারণ ও আমার স্ত্রী!

স্ত্রী!

হ্যাঁ, আমার স্ত্রীকে যেতে দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন।

আগে আইন ওকে তোমার স্ত্রী বলে মেনে নিক, তার পর ও কথাগুলো বলো, বলে সোজা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মণিমালার একটা হাত শক্ত মুঠিতে ধরে আহ্বান জানায় মিতালী, চল মণি—

মণি দাঁড়াও—

মণিমালা হাবুলের ডাকে দাঁড়াল।

যাচ্ছ যাও, কিন্তু যাবার আগে একটা কথা শুনে যাও, এর পর আমার কিন্তু আর তোমার উপর দায়িত্বই রইল না।

মণিমালা ভেঙে পড়ছিল হাবুলের কথায়, কিন্তু মিতালী মণিমালার হাতটা শক্ত করে পূর্ববৎ চেপে ধরে হাবুলের কথাটার জবাব দিল, তোমাকে ও ভাল করেই চেনবার সুযোগ পেয়েছে হাবুল। দায়িত্বের যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ তার পর আর—

থামুন আপনি! ওকে বলতে দিন। ওকে জবাব দিতে দিন আমার কথার।

হ্যাঁ, যদি সত্যি ভালবেসে থাক তুমি আমাকে, এবারে সত্যিকারের বিয়ে করেই আমাকে নিয়ে আসবে। নচেৎ বুঝব সবই তোমার মিথ্যা!

মণি—

না, না—কোন কথাই তোমার আর আমি শুনতে চাই না। তুমি মিথ্যে কথা বলেছ, তুমি মিথ্যুক।

মিতালী আবার বলে, আয় মণি।

মণিমালার হাতটা টেনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মিতালী।

হাবুল বোধ করি এতটা ভাবতে পারে নি। মণি যে সত্যি সত্যিই মিতালীর সঙ্গে চলে যাবে শেষ পর্যন্ত—ভাবতে পারে নি। কিন্তু সত্যি সত্যিই মণিমালা যখন মিতালীর হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, হাবুল প্রথমটা কি করবে, এখন কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারে না। খোলা দরজাটা খোলাই থাকে, হাবুল একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ে।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। ঘরের মধ্যেও সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠতে থাকে। মণিমালা তা হলে সত্যি সত্যিই চলে গেল। এক সময় চেয়ার থেকে উঠে হাবুল পাশের ঘরে এসে ঢোকে। যেখানকার যেমনটি ঠিক তেমনি পড়ে আছে, এমন কি মণিমালার এ কদিনের ব্যবহৃত শাড়িগুলো পর্যন্ত তেমনি

পড়ে আছে। কোন কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যায় নি মণিমালা। কেবল যে শাড়িটা পরে দশ দিন পূর্বে মণিমালা বাড়ি থেকে তার সঙ্গে বের হয়ে এসেছিল, যাবার সময় সেই শাড়িটাই পরে চলে গিয়েছে।

শূন্য ঘর যেন গিলতে আসে হাবুলকে। তার দশ দিনের সুখের নীড় মণিমালা ভেঙে দিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়, রাত বাড়তে থাকে, ওদের শূন্য শয্যার উপর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে হাবুল। কিন্তু যত সময় গড়িয়ে যেতে থাকে, একটা তীব্র নেশা যেন ভিতরে ভিতরে হাবুলকে মোচড় দিতে থাকে।

সুরার নেশার চাইতেও তীব্র একটা নেশা, যে নেশা, মাত্র এই দশ দিনে মণিমালা হাবুলের রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল। বিচিত্র এক নেশা, যে নেশা তাকে একেবারে বুঁদ করে রেখেছিল এই ক দিন।

॥ ১৭ ॥

মণিমালাকে সঙ্গে করে মিতালী একেবারে তার হোস্টেলেই এসে উঠল। চারু সিংহীর কাছ থেকে অবিশ্যি অনুমতি চেয়ে নিতে হল।

চারু সিংহীর কাছে বানিয়ে মিথ্যে কথাই বলতে হল। বললে, আপন খুড়তুতো বোন, বিহারের এক অজ পল্লীতে থাকে, চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসেছে, দিন দশ-পনেরর মধ্যেই চলে যাবে।

চারু সিংহী ভদ্রমহিলা নেহাত খারাপ নন।

বললেন, রাখতে পার আমার আপত্তি নেই, তবে তোমার ঘরে থাকবে কি করে? তোমার তো গত কাল থেকে নতুন রুম-মেট এসেছে—

হ্যাঁ, ঊর্মিলা! ঊর্মিলাকে আমি বলেছি, তার আপত্তি নেই। দশটা দিনের ব্যাপার তো, আমার বিছানাতেই শোবে—হয়ে যাবে এক রকম।

বেশ। তোমাদের আপত্তি না থাকলে থাকুক। তবে বুঝতেই তো পারছ বে-আইনী ব্যাপার। শত্রুরও আমাদের অভাব নেই—

সে আমি ম্যানেজ করে নেব চারুদি।

বেশ।

নতুন রুম-মেট ঊর্মিলা সেনকে অবিশ্যি তখনও কিছু জানায় নি মিতালী। তবে সে যে আপত্তি করবে না জানত মিতালী। গত কাল মাত্র ঊর্মিলা সেন এসেছে, তার নতুন রুম-মেট। মেয়েটির সঙ্গে সামান্য পরিচয়েই বুঝেছিল মিতালী

উর্মিলার সঙ্গে তার কখনও মতের অমিল হবে না। বয়স উর্মিলার তার মতই হবে। চেহারাটা কিছু মাংসল অর্থাৎ স্থূল, ভারিক্কী গোছের। রঙটা গায়ের কালোও নয় ফর্সাও নয়, মাজা মাজা। বরাবর ঢাকাতেই ছিল।

বি. এ. পাশ করে সেখানেই একটা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করছিল। বাপ ঐখানেই ওকালতি করতেন। চার বোন দুই ভাই। তিন বোন উর্মিলার, তার চাইতে বয়সে বড়, ছোট বেলাতেই তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। দুটি ভাই—একটি বছর দশেকের এবং আর একটির বয়স বছর চব্বিশ। বড়টি জব্বলপুরে কি কাজ করে। বাপ মা আগেই মারা গিয়েছিল। ছোট ভাইটাকে নিয়েই সংসার ছিল উর্মিলার। দেশ-বিভাগের পর আর বেশীদিন ঢাকায় থাকা সম্ভব হল না বলে ছোট ভাইটিকে নিয়ে কোনমতে কলকাতায় চলে আসে। কলকাতা এসে বছর দুই প্রায় বেকার ছিল। সেই সময় যাদবপুরের কলোনীতে দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের আশ্রয়ে ছোট ভাইটিকে নিয়ে ছিল।

তার পর অনেক কষ্টে সরকারী চাকরি পেয়েছে একটা। এত দিন যাদবপুরেই ছিল ভাইটিকে নিয়ে। হোস্টেলে স্থান পেয়ে হোস্টেলে উঠে এসেছে এবং ছোট ভাইটিকে শান্তিনিকেতনে দিয়েছে। বিয়ে-থা করবার আর ইচ্ছা নেই। এখন একমাত্র লক্ষ্য ভাইটিকে মানুষ করা। কারণ বড় ভাই সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে, ছোট ভাইয়ের আর কোন ঝক্কিই নাকি সে নিতে পারবে না।

উর্মিলা ঘরেই ছিল সে সময়। মণিমালার কথা বলতেই উর্মিলা সানন্দে রাজী হয়ে গেল, বাঃ কেন থাকবে না। নিশ্চয়ই থাকবে।

মণিমালা কিন্তু সারাটা পথ কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। কাঁদতে কাঁদতে বেচারীর চোখ ফুলে গিয়েছিল। মিতালী সারাটা রাস্তা ট্যাক্সিতে বোঝাতে বোঝাতে এসেছে মণিমালাকে। বলেছে, কাঁদছিস কেন বোকার মত? শক্ত কর মনকে!

মণিমালা বলেছে, কাজটা বোধ হয় ভাল হল না বড়দি।

বোকামি করিস না মণি! বিয়ে না হলে ওর কাছে থাকার মানেটা জানিস? লোকে বলত তুই হাবুলের রক্ষিতা—

রক্ষিতা!

তা ছাড়া আর কি! সহজ কথায় তাই। শক্ত কর মনকে। ও যদি সত্যিই তোকে ভালবেসে থাকে নিশ্চয়ই আসবে দেখিস তোকে যোগ্য মর্যাদা দিয়ে নিয়ে যেতে।

কিন্তু যদি না আসে বড়দি ?

না আসে যদি নিতে !

অবিশ্যি সে কথাটা ভাবছেই না মিতালী। ভাবতে গেলে সে নিজেই জানে না তা হলে কি হবে।

বাড়ি থেকে অন্য নিঃসম্পর্ক এক পুরুষের সঙ্গে যে বয়স্থা কুমারী মেয়ে বের হয়ে এসেছে আজ সেই পুরুষ যদি তাকে অস্বীকারই করে, তা হলে যে ঐ মেয়ের কি ভবিষ্যৎ, মিতালী যেন সত্যিই ভাবতে পারে না। ভেবে কোন মীমাংসাতেই যেন পৌছাতে পারে না।

যতই মানুষের আজ রুচি বদলাক, প্রগতির পথে যতই আজ তারা অগ্রসর হয়ে থাকুক, যতই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়ে থাকুক, যতই শিক্ষার মান এদেশে বেড়ে থাকুক, আদিম সেই প্রশ্ন আজও প্রশ্নই রয়ে গিয়েছে। জবাব তার পাওয়া যায় নি। তাই বার বার মণিমালাকে শক্ত হতে বললেও এবং বার বার তাকে সাহস দিলেও মিতালী নিজের কাছেই কি একটা মীমাংসা যেন হাতড়ে হাতড়ে ফিরছিল। নিয়ে তো এল মণিমালাকে জোর করে, সাহস দিয়ে হাবুলের কাছ থেকে ছিনিয়ে, তার পর ? কি ব্যবস্থা করবে সে মণিমালার ? যে সম্মানের আশ্বাস দিয়ে তাকে নিয়ে এল, সে সম্মান সে কেমন করে দেবে মণিমালাকে !

মণিমালাকে কিছুতেই খাওয়াতে পারে নি মিতালী। শেষ পর্যন্ত না খেয়েই মণিমালা শুয়ে পড়েছে। উর্মিলাও ঘুমিয়েছে।

একাকী রাত জেগে বসে চিঠি লিখছিল মিতালী করণ সিংকে। দুখানা চিঠি এসেছে ইতিমধ্যে করণ সিংয়ের, কিন্তু মানসিক অস্থিরতার জন্য একখানারও জবাব দেওয়া হয় নি। তাই জবাব দিতে বসেছিল মিতালী করণ সিংয়ের চিঠির।

মিতালী লিখছিল ঃ

তোমার কথা আমি মেনে নিতে পারলাম না করণ। তুমি যে লিখেছ উন্নতির পথে আমরা এগিয়ে চলেছি—নতুন এক জাতিগঠনের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি, কথাটা তোমার আমি মানতে পারলাম না।

আমি তো দেখছি ক্রমশঃ ক্ষয়ের পথেই আমরা এগিয়ে চলেছি। যে দিকে তাকাই আজ, কেবল অত্যন্ত স্থূল প্রয়োজন আর সেই প্রয়োজন চাহিদা মেটানো। মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় যে সম্পদ হৃদয়বস্তু, তাই তো আজ আমরা হারিয়ে বসে

আছি। প্রয়োজনের তাগিদে এক-একটি মেশিনে, যন্ত্রে যেন পরিণত হয়েছি আমরা। ভুলে গিয়েছি আজ আমরা প্রত্যেকে যেন ঐ স্থূল প্রয়োজনটাই জীবনের শেষ কথা নয়। আর ভুলে গিয়েছি বলেই যন্ত্রের মতই আজ আমরা চলি, যন্ত্রের মতই কথা বলি, সারাটা দিন যন্ত্রের মতই খাটি তার পর এক সময় গৃহে ফিরে যন্ত্রের মতই স্থূল খানিকটা দৈহিক আরামে তৃপ্ত হবার চেষ্টা করি।

না আছে কোন গতি, না আছে কোন যতি, না আছে কোন অনুভূতি, ছন্দ বা শিহরণ। জীবনসঙ্গিনী বা সহধর্মিণী আমরা চাই না, স্বামী বা ভর্তাও চাই না। চাই একটা স্থূল নারীদেহ বা পুরুষ দেহ, যে দেহ চিরন্তন সেই নরনারীর আদিম রিপুকে দেবে খানিকটা জান্তব যৌনবিকারের পর একটা কুৎসিত ক্লান্তি। তৃপ্তি নয়। আনন্দ নয়।

আমাদের ঘর নেই, নির্জন কোন শান্ত পরিবেশ নেই যেখানে দু' দণ্ড অন্তত মুখোমুখি বসে, পরম বিশ্বাসে, পরম আশ্বাসে পরস্পরের হৃদয়ের সংবাদ পাব, নোব। ঘর হয়েছে আজ আমাদের রেস্তোরাঁর কোন কিউবিকৃল, লেক, ময়দান বা গঙ্গার ধারে, অন্ধকার সিনেমা হলের দুটো পাশাপাশি সীট অথবা চলন্ত ট্যাক্সির পিছনের সীটটা। কারণ কি জান এর ?

সেই আজকের প্রয়োজনেরই বহিপ্রকাশ ঐটা। অর্থাৎ প্রয়োজনটা যেমন স্থূল, ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ, তেমনি তার প্রকাশটাও স্থূল, ক্ষুদ্র এবং সংকীর্ণ। ভাবছ কেন এসব কথা লিখছি ! চিত্রার ও কৃষ্ণার সংবাদ তো তোমাকে আগেই দিয়েছি, আজ দিচ্ছি আর এক জনের। মণিমালা, আমারই বোনের।

মণিমালা পর্ব লিখে শেষে লেখে মিতালী, হাবুল যদি সত্যিই না আসে তবে মণিমালার আজ কি হবে বলতে পার ?

এই যে ক দিন ধরে এক জনের সঙ্গে তার দেহটা নিয়ে ছেলেখেলা করে এল, এর পর এ দেহটার মর্যাদা দেবে এমন কোন পুরুষ আছে আজ আমাদের সমাজে তুমি দেখাতে পার ! তবে বুঝব তোমরা এগিয়ে চলেছ। কিন্তু আজ আর নয়। রাত অনেক হল। এবারে ইতি—

শেষ পর্যন্ত সত্যিই কিন্তু তিন দিন কেটে গেল, হাবুল এল না।

মিতালীর মত মণিমালারও মনের গোপনে একটা আশা ছিল—হাবুল আসবে। সেও মনে মনে আশা করেছিল বৈকি। অন্তত গত দশ দিনে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিল হাবুল তাকে নিয়ে, তাতে করে মণিমালা ভেবেছিল

হাবুল আসবে নিশ্চয়ই। হাবুল তাকে সত্যিই ভালবেসেছে। কিন্তু সময় যতই অতিক্রান্ত হয়ে যেতে থাকে, সেই আশাটা যেন ঝিমিয়ে আসতে থাকে মণিমালার। সংশয় এসে মনকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। তবে কি হাবুলের এতদিনকার যা কিছু ভালবাসা সবই মিথ্যা! মিতালীর সংশয়টাই কি তা হলে সত্যি! সত্যিই কি তা হলে হাবুল তার দেহটাই চেয়েছিল, তাকে চায় নি। আর সেই কারণেই এত বড় ফাঁকির মধ্যে দিয়ে তাকে ভোগ করেছে।

সব যেন মণিমালার সামনে অন্ধকার হয়ে যায়। বাপ মা তো তাকে ত্যাগ করেছেই, হাবুলও যদি তাকে ত্যাগ করে তো কোথায়, কোন্ মাটিতে পা দিয়ে সে দাঁড়াবে! হাবুল তার সঙ্গে এত বড় প্রতারণা করল শেষ পর্যন্ত! অসহায়ের মত চোখের জল ফেলতে থাকে মণিমালা।

মিতালী বলে, আবার কাঁদছিস তুই মণি?

কান্না ছাড়া আজ আমার কি আছে বড়দি! কাঁদতে কাঁদতে বলে মণিমালা, সে আর আসবে না।

নাই আসুক। বরং ভগবানকে ধন্যবাদ দে যে এত সহজে এত বড় ভুলের পথ থেকে তুই ফিরে আসতে পেরেছিস।

কিন্তু ফিরে এসেই বা কি হল বড়দি!

কেন, কি হয়েছে তোর? আবার নতুন করে বাঁচবি। আমি তোকে বাঁচিয়ে তুলব। তুই আবার মন দিয়ে পড়াশুনা শুরু কর। সব ব্যবস্থা আমি করে দেব।

তাই—তাই দাও বড়দি। এভাবে আর আমার যেন সময় কাটছে না। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে মণিমালা।

কথার কথাই মিতালী বলেছিল মণিমালাকে। কিন্তু এখন মনে হয়, মণিমালাকে আবার সুস্থ করে তুলতে হলে, বাঁচিয়ে তুলতে হলে এখন ঐটাই বুঝি একমাত্র পথ। আর তো কোন পথই তার চোখে পড়ছে না।

পরের দিন থেকেই মণিমালা পড়তে পারে এমন একটা বোর্ডিং স্কুলের সন্ধান করতে লাগল মিতালী। কিন্তু মনের মত স্কুল ও বোর্ডিং তেমন পায় না, যেখানে নিশ্চিন্তে মণিমালাকে রাখতে পারে। আজকালকার বোর্ডিং স্কুল তো মিতালীর জানতে বাকী নেই। বাইরে থেকে যত শাসন আর কানুন, ভিতরে একেবারে ফক্কা গেরো। এদিকে ছুটিও ফুরিয়ে আসছে ক্রমশঃ মিতালীর। ছুটির মধ্যেই মণিমালার যা হোক একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে মুশকিলে পড়তে হবে তাকে।

মণিমালার ব্যাপারটাই এখন তার সব চাইতে বড় দুশ্চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রায় সাত দিন হয়ে গেল মিতালী মণিমালাকে নিয়ে এসেছে নিজের কাছে। আজকাল আর মণিমালা সর্বক্ষণ আগের মত কান্নাকাটি করে না বটে, তবে কেমন যেন গম্ভীর, স্তব্ধ হায় গিয়েছে মণিমালা।

মিতালী বলে, কি এত ভাবিস বল তো তুই সর্বক্ষণ?

কই কিছুই ভাবি না তো বড়দি।

তবে অমন মুখ গোমড়া করে সর্বক্ষণ বসে থাকিস কেন? কি হয়েছে তোর। হাবুল এমন কি অমূল্য সম্পদ ছিল তোর জীবনে যে হাবুলকে হারিয়ে তোর মনে হচ্ছে সর্বস্ব গেল?

হঠাৎ প্রত্যুত্তরে বিচিত্র একটা কথা আজ মণিমালার মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে, সর্বস্ব গেছে বৈকি বড়দি, তবে হাবুল নয়—পুরুষ জাতটার উপরে এত দিনের যে বিশ্বাসটা আমার ছিল, সেই বিশ্বাসটাকেই হারিয়েছি।

মণিমালার মত মেয়ের মুখ থেকে ঐ ধরনের একটা কথা শুনে রীতিমত বিস্ময়েই তাকায় যেন মিতালী ওর মুখের দিকে। সত্যিকারের দুঃখ বুঝি মানুষের চোখের দৃষ্টি এমনি করেই রাতারাতি খুলে দেয়।

মণিমালার কথা তখনও শেষ হয় নি। সে বলে, তোমার দিকে তাকিয়ে আমার জ্ঞান হওয়া উচিত ছিল বড়দি। তা হলে আজ এমনি করে নিজেকে বুঝি ছোট করতে হত না। তার পর একটু থেমে বলে, সেই ভাল বড়দি, তুমি আবার আমার লেখাপড়ারই ব্যবস্থা করে দাও। ঘর বাঁধবার শখ আমার মিটে গিয়েছে।

মিতালী প্রত্যুত্তরে কোন কথাই বলতে পারে না। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল মণিমালার ঐ সামান্য কয়েকটি কথায়ই, ঘর বাঁধবার কত বড় আশা নিয়ে সে হাবুলের হাত ধরে ঘরের বাইরে পা বাড়িয়েছিল, আর সে আশা তার ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ায় কতখানি আঘাত তার বুকে লেগেছে। বুঝতে পেরেছিল সে কত বড় বেদনায় মণিমালা ঐ কথাগুলো বলছে।

॥ ১৮ ॥

সাত দিন ক্রমাগত সারাটা কলকাতা শহর ঘুরে ঘুরে চষে ফেলে অবশেষে বেলেঘাটার একটা স্কুল বোর্ডিংয়ে মণিমালার ব্যবস্থা করে দিল মিতালী।

কপালের ও সিঁথির সিন্দুর মুছে ফেলে এবং নিজের হাতে শাঁখা লোহা খুলে ফেলে নতুন করে আবার কুমারী সেজে জগৎমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি

হল মণিমালা। হেডমিস্ট্রেস লাবণ্যদি মিতালীর এক বান্ধবীর সম্পর্কে মাসী হয়। তারই সুপারিশে ক্লাস টেনে ভর্তি করে বোর্ডিংয়ে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

লাবণ্যদি এমনিতে বাইরে একটু রুক্ষ প্রকৃতির হলেও মনটা তাঁর স্নেহপ্রবণ ছিল। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে নিজের চেষ্টায় এম. এ. ও বি. টি. পাশ করে জগৎমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ে পাঁচ-সাত বছরে সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর পর্যায় থেকে হেডমিস্ট্রেসের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলেন। মণিমালাকে বোর্ডিংয়ে রেখে আসবার সময় বিশেষ করে লাবণ্যদিকে একটু বলে এসেছিল মিতালী। বলে এসেছিল, একমাত্র সে ছাড়া যেন দ্বিতীয় কারও সঙ্গে তাকে দেখা করবার কোন রকম সুযোগ পর্যন্ত না দেওয়া হয়।

মণিমালাকে স্কুল বোর্ডিংয়ে ভর্তি করতে গিয়ে মিতালীর বেশ কিছু খরচ হয়ে গেল। এক কাপড়ে চলে এসেছিল মেয়েটা তার সঙ্গে, জামা কাপড় থেকে শুরু করে অনেক কিছুই কিনে দিতে হল। ফলে কিছু ধারও হয়ে গেল মিতালীর। দু-চার মাস টানাটানি করে চলতে হবে। তা হোক, তবু তো মণিমালার একটা ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত হল। যে আতান্তরে পড়েছিল, কোন রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছিল না যেন মিতালী।

আর কোন রাস্তা খুঁজে না পেয়ে নিজের কাছেই যেন নিজে অপরাধী বোধ করছিল। মনে হচ্ছিল, কেন মিথ্যে সে মণিমালাদের ব্যাপারে মাথা গলাতে গিয়েছিল। মণিমালাকে যদি সে কোন বাঁচবার পথ নাই বাতলালে পারে তো কেন সে তাকে হাবুলের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে গিয়েছিল। আর যত মিতালী ব্যাপারটা ভাবছিল, ততই যেন একটা অমার্জনীয় অক্ষমতার আক্রোশে নিজে সে দগ্ধ ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল। মণিমালার দিকে মুখ তুলে তাকাতেও যেন পারছিল না সে।

কিন্তু আজ সে নিশ্চিন্ত। মণিমালাকে বোর্ডিয়ে রেখে হোস্টেলে ফেরবার পথে চলন্ত বাসে সেই কথাটাই ভাবছিল মিতালী। এ ক দিন রামধন মিত্র লেনের বাসাতে একবারও সে যেতে পারে নি। সেদিন মণিমালার ব্যাপারটা শুনে আসবার পর অন্তত এক বার তার সেখানে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মণিমালার দুশ্চিন্তায় সে তাও যেতে পারে নি। সে কর্তব্যটুকুও পালন করতে পারে নি। আজ মনে হল মিতালীর—কাল সে একবার যেতে পারে।

তবে গেলেও মণিমালার কোন কথা এখনও বলা হবে না। ব্যাপারটা গোপনই থাক আপাততঃ।

হোস্টেলে পৌঁছতেই ঊর্মিলার সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল মিতালীর, এবং সে বললে, পৌঁছে দিয়ে এলে মণিমালাকে ?

হ্যাঁ।

যাক বেচারী সত্যিই আতান্তরে পড়েছিল। তার পরই হঠাৎ বল্লে, সত্যি মিতালী, এ দেশে যে কেন মানুষ মেয়ে হয়ে জন্মায় !

তুমি কি বলতে চাও ঊর্মিলা, মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই অপরাধ ?

তা ছাড়া কি ! ধর আজ মণিমালা যদি ছেলে হত তবে তো—

তবে হয়তো তার ঐ সামান্য ব্যাপারে এতখানি চিন্তার কিছু থাকত না এই তো বলবে ? কিন্তু আমি বলব তা নয়। মেয়ে হয়ে জন্মানোটা অপরাধ নয়—

তবে ?

অপরাধ হচ্ছে নিজের আত্মমর্যাদাকে ভাল করে না জেনে, না বুঝে অন্যের হাতে বিলিয়ে দেওয়া। সর্বব্যাপারে আজ মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবি জানাচ্ছে অথচ আসল জায়গাতেই তারা যদি সেই দাস্যবৃত্তি আর পরমুখাপেক্ষিতাকে প্রশ্রয় দেয় তার জন্য ছেলেদের দায়ী করলে চলবে কেন ভাই ! তা ছাড়া—মিতালীর কথা শেষ হয় না। সে আরও কিছু বলত, কিন্তু বাধা পেল। হোস্টেলের চাকর শ্যাম এসে বললে, দিদিমণি আপনার একজন ভিজিটার সেই কখন থেকে এসে বসে আছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলে—

ঐ দেখ, সত্যিই তো, ঊর্মিলা বলে, আমিও ভুলে গিয়েছিলাম ভাই। একজন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে সেই কখন থেকে ভিজিটার্স রুমে বসে আছেন।

ভদ্রলোক ! কে ?

তা তো জানি না।

মিতালী আর কোন প্রশ্ন করে না, তবে একটু বিস্মিত হয়েই ভিজিটার্স রুমের দিকে পা বাড়াল এবং ভিজিটার্স রুমে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভিজিটার্স রুমে বসে আছে হাবুল।

মণিমালা চলে আসার পর থেকে দশটা দিন ও রাত হাবুল নিজের মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছে।

প্রথমটায় হাবুলের মণিমালার উপরে হয়েছিল প্রচণ্ড রাগ। কি ভেবেছে মণিমালা। সে চলে গেলে হাবুল তার শোকে কেঁদে ভাসাবে নাকি। কেন,

সরকারের কি মেয়ের অভাব? নেহাত ভাল লেগে গিয়েছিল মণিমালাকে, তাই তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। নইলে কি ছিল মণিমালার মধ্যে। কেরানী বাপের ঘরে এক গাদা বোন, না পাচ্ছিল ভাল করে খেতে না ভাল করে পরতে। রাণীর মত এনে রেখেছিল, তা সইবে কেন!

কি না বিয়ে করতে হবে। কেন, কোন দুঃখে?

চলে গেছে যাক। দেখুক এখন কোথায় ঠাঁই পায়। যে মেয়েকে একবার হাবুল বাড়ি থেকে বের করে এনেছে সে যে আর ঘরে ঠাঁই পাবে না তা হাবুল জানে। যাক গে, মরুক গে।

কিন্তু দুটো দিনও গেল না। মণিমালার উপরে রাগটা একটু একটু করে ঝিমিয়ে আসতে লাগল। মণিমালাকে ঘিরে দশটা দিনের অসংখ্য সুখের স্মৃতি তার মনকে যেন উতলা করতে লাগল। ঘুরে ফিরে কেবল মণিমালাকেই মনে পড়তে লাগল। বিশেষ করে রাত্রে একক শয্যায়। যে নেশা তার রক্তের মধ্যে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল মণিমালা মাত্র দশটি রাত্রের নিবিড় সাহচর্যে, সেই নেশার আগুন যেন হাবুলকে প্রতি রাত্রে প্রহরের পর প্রহর পোড়াতে লাগল, দগ্ধ করতে লাগল, ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগল।

এ জগতে এমন এক-এক জন নারী আছে যার আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে পুরুষ পায় এক বিচিত্র স্বাদ। বিচিত্র এক পুলকানুভূতি! সেই বিচিত্র স্বাদ ও পুলকানুভূতি যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিল না হাবুল। আর তাতে করেই সেই প্রচণ্ড রাগটা ক্রমশঃ ঝিমিয়ে গিয়ে তার মনের মধ্যে দেখা দেয় বিচিত্র একটা অভিমান। এতটা বাড়াবাড়ি করার কি এমন দরকার ছিল মণিমালার! না হয় সে তাকে ফাঁকিই দিয়েছিল। অন্যায় সে না হয় করেছিলই। ভাল করে বুঝিয়ে বললে কি তার অন্যায়টা সে ধরতে পারত না! অন্যায়টাকে মিটিয়ে নিতে পারত না! মানুষের কি ভুল হয় না!

অবিশ্যি মিথ্যা নয়। সত্যিই সে বিয়ের মত অত বড় একটা ঝুঁকি হুট করে নিতে চায় নি। কিন্তু তাই বলে সত্যিই কি সে মণিমালাকে তার বিবাহিতা স্ত্রী নয় বলে কোন দিন তাকে ত্যাগ করত! বিয়ে না করলেও বরাবর তাকে স্ত্রী সমাদরেই রাখত। স্ত্রীর মর্যাদাই দিত। আর ভেবেছিল হাবুল, শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়েই ফিরে আসতে হবে মণিমালাকে তারই কাছে। কিন্তু দশ দিন চলে গেল, তবু যখন মণিমালা ফিরে এল না, হাবুল আর স্থির থাকতে পারে না। দুর্নিবার একটা আকর্ষণ কেবলই যেন মণিমালার দিকে তাকে টানতে থাকে।

উদভ্রান্তের মত এদিক ওদিক হাবুল ঘুরে বেড়ায়। দিবা রাত্র কেবল মণিমালার কথাই মনে পড়ে।

বাপের দোহাইটা মিথ্যা। একমাত্র ছেলে সে বাপের। মণিমালাকে সে বিয়ে করলে হরিধন সরকার তাকে শেষ পর্যন্ত যে বধূ বলে মেনে নেবেই, তাও জানত হাবুল। তাই শেষ পর্যন্ত স্থির করে হাবুল মণিমালাকে সে বিয়েই করবে এবং যে মুহূর্তে মন স্থির করে আর সে দেরি করে না। মিতালীর হোস্টেলের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে।

হাবুল মিতালীকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে মৃদু সংকোচের হাসি হেসে উঠে দাঁড়ায়, বড়দি আমি এসেছি।

এসেছ!

হ্যাঁ—

কেন বল তো?

বাঃ আপনিই তো বলে এসেছিলেন—

কি?

মণিকে বিয়ে করতে প্রস্তুত থাকলে আমি যেন আসি। আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

প্রস্তুত হয়েই এসেছ?

হ্যাঁ। আপনি সব ব্যবস্থা করে দিন।

খুব ভাল। কিন্তু—

বুঝতেই পারছেন, আমার একটু দেরি হয়ে গেল—সব যোগাড়-যন্ত্র করতে হবে তো। তাই—

একটু বেশী দেরি করে ফেলছ হাবুল।

বেশী দেরি করে ফেলেছি!

হ্যাঁ—মণি তার মত বদলেছে।

কি বললেন?

বললাম—মণি তার মত বদলেছে। দশ দিন আগে খুব সহজেই যে বিয়ে ত পারত আজ আর তার কোন সম্ভাবনাই নেই।

আমি ঠিক আপনার কথাটা—

বুঝতে পারছ না, তাই না। কিন্তু না বুঝতে পারার মত তো এতে কিছু ই হাবুল। তাকে যে দিন তুমি ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাও তাকে এই

আশ্বাসই দিয়েছিলে, তাকে তুমি স্ত্রীর মর্যাদা দেবে। এবং কথাটা তুমি ভেবে বোধ হয় স্থির করেছিলে। অথচ সেটার অন্যরকম করতে তোমার একটুর দেরিও হল না। কাজেই আজকে যা স্থির করে এসেছ সেটাও অন্যরকম হবে ন আর দশ দিন পরে সেটাই বা বিশ্বাস করি কেমন করে বল?

না, না—আপনি বিশ্বাস করুন বড়দি। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি—

না হাবুল, মণিমালার যোগ্য তুমি নও।

যোগ্য নই!

না। অনেক সুকৃতির ফলে মণি তোমার ঘরে গিয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে ধরে রাখতে পার নি, কারণ সে যোগ্যতা তোমার ছিল না। আর সে যোগ্যতা তোমার নেই বলেই মণির পক্ষে আজ আবার তোমার ঘরে যাওয়া সম্ভব নয়।

কথাগুলো বলে মিতালী ঘর থেকে বের হয়ে যাবার জন্য ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়াতেই ব্যাকুল কণ্ঠে পিছনে থেকে ডাকে হাবুল, বড়দি, আপনি যাবেন না শুনুন।

সামান্য একটু মুখটা ঘুরিয়ে মিতালী বলে, আর তো আমার শোনবার কিছু নেই হাবুল। তোমার যা বলবার ছিল তুমি বলেছ, আমার যা বলবার ছিল আমিও বলেছি।

তা হলে সত্যি সত্যি আমি ফিরেই যাব?

হ্যাঁ, ফিরেই যেতে হবে।

বেশ। তাই যাচ্ছি। তবে মনে রাখবেন আপনিই আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

মৃদু হেসে মিতালী জবাব দেয়, তা মনে থাকবে বৈকি। এবং কথাটা বলে আর দাঁড়াল না মিতালী, ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

উপরে আসতেই ঊর্মিলা শুধায়, কে এসেছিল মিতালী? একটু আগে নীচে গিয়েছিলাম, ভিজিটার্স রুমের সামনে দিয়ে যেতে যেতে শুনলাম, মণিমালার নাম করছে—

ঐ তো আমাদের সেই হাবুল।

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

তা হঠাৎ আবার কি মনে করে ভদ্রলোক এলেন?

মণিকে রেজিস্ট্রী করে বিয়ে করবে বলে মন স্থির করে এসেছিল।

তাই নাকি! তা হলে সুবুদ্ধি হয়েছে!

হ্যাঁ—

তা তুমি কি বললে?

কি আবার বলব, বললাম মন স্থির করতে তোমার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে হাবুল, আজ আর তা সম্ভব নয়।

সে কি! তুমি ফিরিয়ে দিলে তাকে?

তাই। ফিরিয়েই দিলাম।

কাজটা কি ভাল করলে মিতালী? সে যখন স্বেচ্ছায়ই এসেছিল—

ওদের আজ জানা দরকার মেয়ে-জাতেরও একটা মূল্য আছে, মর্যাদা আছে, তারা মাটির বা কাচের পুতুল নয় যে যতক্ষণ খুশি তাদের নাড়াচাড়া করলাম, তাদের নিয়ে খেললাম, তার পর খুশি মত ফেলে দিলাম মাটিতে—

কিন্তু ভাই—

হ্যাঁ, সব স্বামীই হয়তো সব স্ত্রীকে ঐশ্বর্য, ঘর দুয়ার অলঙ্কার গাড়ি দিতে পারে না, কিন্তু ভাঙা ঘরের মধ্যে দারিদ্র্যের অন্নমুষ্টির সঙ্গে ভালবাসাটুকু দিতে পারার, মর্যাদাটুকু দিতে পারার মধ্যে তো ব্যয়বাহুল্য বা কষ্টসাধনা কিছু নেই।

কিন্তু ভাই তা নয়—আমি বলতে চাইছিলাম—

কি বলতে চাইছিলে?

ঐ হাবুলের সঙ্গেই তো মণিমালা দশ দিন দশ রাত স্বামী-স্ত্রীর মতই ঘর করেছিল?

তা করেছিল অবশ্য, কিন্তু তাতে করেই কি তার জাত গেছে তুমি বলতে চাও?

তা নয় তবে—

বুঝতে পারছি উর্মিলা, তুমি সঠিক কি বলতে চাও। কিন্তু তার জবাবে আমি কি বলব জান? দেহের একটা অঙ্গ কেটে গেলে বা কোনক্রমে পচে গেলেও সে দেহকে যদি আমরা বর্জন না করে চলতে পারি, তা হলে সেই দেহটাই দশ দিনই হোক এক মাসই হোক ভুল ক্রমে কোন এক পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়েছিল বলেই সে তার জাত ধর্ম ও শুচিতা সব গেল এই বা কোন যুক্তি বলতে পার?

তোমার ঐ সব যুক্তি তর্ক আমি বুঝি না মিতালী। তবে এইটুকু বুঝি নিজের

সহজ বিচার ও বুদ্ধিতে, হাবুলকে তুমি ফিরিয়ে না দিলেই বোধ হয় ভাল করতে।

শুধু ঊর্মিলা কেন, সব মেয়েই হয়তো ঊর্মিলার মত ঐ কথাটাই বলবে মিতালী কি তা জানে না। তাই ঊর্মিলার কথায় সে খুব বিস্ময় বোধ করে না।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলে, তোমার যুক্তি মেনে নিলেও একটা প্রশ্ন কিন্তু তবু থেকে যায় ভাই।

প্রশ্ন?

হ্যাঁ, আজকে হাবুলের আসাটার মধ্যেও কোন মিথ্যা ছিল না, কোন প্রবঞ্চনা বা ফাঁকি ছিল না তারই বা প্রমাণ কি?

কিন্তু—

এক বার যে জঘন্যভাবে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছে আবারও যে সে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করবে না তারই বা যুক্তি কি?

তা হয়তো নেই তবু—

তবু অনিশ্চয়তার মধ্যে যেতে হবে এই কি তোমার যুক্তি ঊর্মিলা? শোন ঊর্মিলা, সে যদি সত্যিই আজ মণিকে বিয়ে করবার স্থির মন নিয়েই এসে থাকে তো জেনো আবার সে আসবে। আবার যাতে করে ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয় সেটাই আমি চাই। আমি জানি, অনেক কষ্টে মণিমালা নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে—হয়তো সামলাতেও পারবে, কিন্তু আবার যদি আঘাত পায় তবে তার অবস্থাটা ভেবে দেখেছ কি?

ঊর্মিলা এবারে আর প্রত্যুত্তরে কোন কথা বলে না। চুপ করেই থাকে।

॥ ১৯ ॥

উমা জানত না যে আজকের দিনে সুপারিশ না থাকলে বিদ্যার ঐ সামান্য মূলধনে চাকরি পাওয়া যায় না। তবু কিন্তু দিনের পর দিন চাকরি একটা খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হলেও সে মুষড়ে পড়ে না। হতাশায় ভেঙে পড়ে না।

দ্বিগুণ উৎসাহে সে এদিক ওদিক সন্ধানে ঘুরতে থাকে। যেমন করে যে ভাবেই হোক তাকে একটা সংস্থান করতেই হবে যে। হেরে সে যেতে পারে না। এত সহজে সে হার স্বীকার করে নিতে পারে না। নিজের দুর্ভাগ্যের কথাটা উমা যেমন নিকট ও দূরতম আত্মীয়ের কাছেও প্রকাশ করে নি, তেমনি কোন পরিচিত জনের কাছেও ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করে নি। বাইরে কারও কাছে সে নিজের আত্মমর্যাদাকে এতটুকুও ছোট করে নি।

জীবনের সঙ্গে জুয়া খেলতে গিয়ে সে হেরে গিয়েছে, হার-জিত আছেই, সেজন্য নিজের দুঃখটা অন্যের কাছে প্রকাশ করা মানেই তো নিজেকে অন্যের কৃপার পাত্র করে তোলা। তার নিজের দুঃখ, নিজের পরাজয় নিজেরই থাক।

দ্বিরাগমনে মণিমোহন নিজেই গোবরডাঙায় নিতে এসেছিলেন জামাই-মেয়েকে, কিন্তু উমা যায় নি। বাপকে বুঝিয়েছে—শুধু মাত্র ঝিয়ের উপর ভরসা করে বাড়ি-ঘর ছেড়ে এক দিনের জন্যও কোথাও যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

মণিমোহন কিছুতেই উমাকে সম্মত করাতে পারেন নি। মনে মনে ভেবেছেন, আজকালকার মেয়েরা এক দিনেই স্বামীর ঘরকে নিজের ঘর বলে আঁকড়ে ধরে।

সে যাই হোক, উমা শেষ পর্যন্ত একটা অখ্যাতনামা নারী-শিক্ষামন্দিরে চাকরি জুটিয়ে নিল। নারী-শিক্ষামন্দিরটা খুব বেশী দূরে নয়। যাদবপুরে। বাসে যায় না, হেঁটেই যায়। সকাল নটায় সামান্য ডাল ভাত ও একটা ভাজা দিয়ে খেয়ে বের হয়ে যায়, ফিরতে সেই সন্ধ্যা হয়।

রঞ্জিতের সঙ্গে একই বাড়িতে আছে, রাত্রে খেতেও বসে একত্রে। কিন্তু দু-জনার মধ্যে কথাবার্তা বড় একটা হয় না।

সারদার কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন একটু দুর্বোধ্যই লাগে। নতুন স্বামী-স্ত্রী—নতুন বিয়ে হয়েছে কিন্তু কেমনধারা এদের চালচলন! কারও সঙ্গে কারও যেন সম্পর্কই নেই।

উমা আগে খেয়ে-দেয়ে বের হয়ে যায়, রঞ্জিৎ বের হয় অফিসে পৌনে দশটা নাগাদ। উমা ফেরে আগে, রঞ্জিৎ কোন দিনই রাত নটার আগে ফেরে না।

সারা দিনের পর অফিস থেকে স্বামী ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলে স্ত্রী যে তার পাশে গিয়ে বসবে, আদর যত্ন করবে সে সবও কিছু নেই। রাত্রে খাওয়ার টেবিলে বসেও দু-জনার মধ্যে কোন কথাবার্তাই হয় না।

এ কেমন ধারা বিয়ে, কেমন ধারা ঘর করা সারদার বুদ্ধিতে ঠিক যেন বোধগম্য হয় না। এক-এক বার মনে হয়েছে সারদার, দু-জনার মধ্যে হয়তো মিল হয় নি, গোলমাল আছে কিছু, কিন্তু কখনও তো ওদের দু' জনকে ঝগড়া-ঝাঁটি করতেও দেখে না।

মাঝখানে এক দিন রাত্রে উমা যখন প্রতিদিনের মত তার ঘরে প্রবেশ করে মধ্যবর্তী দরজাপথে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে, রঞ্জিৎ বলেছিল, উমা তুমি কি তা হলে একেবারে স্থিরই করেছ এইভাবেই আমাদের চলবে?

উমা প্রত্যুত্তরে কোন কথা না বলে রঞ্জিতের মুখের দিকে তাকিয়েছিল মাত্র।

এভাবে এক সঙ্গে থাকার প্রহসন করার চাইতে আমরা সত্যিকারের পৃথক হয়ে থাকলেই তো পারি।

তা পারা যায় বৈকি কিন্তু তাতে করে আমার চাইতে তুমিই বেশী ছোট হয়ে যাবে। তাছাড়া আমার দিকে তাকিয়ে লোকে অনুকম্পার হাসি হাসবে সে আমি চাই না।

কিন্তু এভাবেই বা কত দিন সবার চোখে ধুলো দিয়ে চলতে পারব আমরা?

আমাদের ঘরের ব্যাপার বাইরের লোক জানতেই বা পারবে কেন?

দুনিয়ার তো সবাই ঘাস খায় না উমা।

ঘাস খায় না যে তা আমিও জানি, কিন্তু এও আমি বিশ্বাস করি নিজের ঘরের কথা নিজে না গেয়ে বেড়ালে কারও পক্ষেই তা জানা সম্ভব নয়।

কথাটা বলে আর উমা দাঁড়ায় নি। ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিয়েছিল।

কিন্তু এক মাস পরে সেদিন রাত্রে শুতে যাবার আগে ত্রিশটা টাকা যখন রঞ্জিতের হাতে দিতে গেল উমা, রঞ্জিৎ ব্যাপারটা আঁচ করে যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

রঞ্জিৎ বলে. কি এ?

আমার খরচের জন্য সামান্য কিছু দিচ্ছি।

খরচের!

হ্যাঁ, যাহোক একটা কিছু যোগাড় করতে পেরেছি—

উমা, তোমার কোন ব্যাপারেই আজ পর্যন্ত আমি বাধা দিই নি আজও দেব না, কিন্তু হৃদয়হীনতারও বোধ হয় একটা সীমা আছে—

উমা যেন এতটুকু বিচলিতও হয় না।

স্থির ও নির্বিকার কণ্ঠে বলে, কিন্তু আমি তো তোমাকে বলেই ছিলাম—

হ্যাঁ, বলেছিলে তোমার খরচ তুমি চালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু উমা একটা কথা নিশ্চয়ই তুমি অস্বীকার করবে না—অগ্নি নারায়ণ সাক্ষী রেখে তোমাকে আমি বিবাহ করেছিলাম, তুমি আমার স্ত্রী—

অস্বীকার করব কেন? নিশ্চয়ই—

কিন্তু স্বামী যদি তার আগের জীবনে কোন পাপ বা অন্যায় করেই থাকে, স্ত্রীর চোখে কি কোন দিনই তার ক্ষমা নেই!

উমা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তার পর মৃদু শান্ত কণ্ঠে বলে, যা এক বার

আলোচনা হয়ে গিয়েছে—যা এক বার মীমাংসা হয়ে গিয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করে শুধু কি পুরোনো ঘাকে খুঁচিয়ে তোলাই নয় ?

তা হলে কি এই ভাবেই বাকী জীবনটা আমাদের চলতে হবে ?

তা ছাড়া আর উপায় কি !

কোন উপায় নেই ?

না। কারণ তুমি চিত্রার কথা ভুলে যেতে পারো কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে আমার পক্ষে তা ভোলা সম্ভব নয়।

বেশ, তা হলে আর কি বলব। কিন্তু একটা অনুরোধ—ও টাকা আমাকে নিতে বলো না উমা।

না, না—তা হবে না। টাকা তোমাকে নিতেই হবে।

এত বড় শাস্তি দিয়েও তোমার শখ মিটছে না!...আর ঐ শাস্তি তুমি আমাকে দিও না উমা, অন্তত এইটুকু দয়া তুমি আমাকে করো। বরং এতে করে তুমি যদি আমার এখানে নাও থাক তাও আমার সইবে কিন্তু ও আমি সহ্য করতে পারব না, কিছুতেই না—ক্ষমা করো, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। চোখে বোধ হয় জল এসে গিয়েছিল রঞ্জিতের, সে তাড়াতাড়ি মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়।

উমা স্তব্ধ হয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তার পর হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে নোটগুলো তুলে নিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

অফিস থেকে বেরোতেই সেদিন গেটের সামনে হাবুলের সঙ্গে মিতালীর একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

থমকে দাঁড়ায় মিতালী।

বড়দি! আবার আমি এসেছি। আপনি বিশ্বাস করুন সত্যিই মণিকে আমি বিয়ে করতে চাই।

কয়েক মুহূর্ত ভাবে মিতালী, তার পর মৃদু কণ্ঠে বলে, তোমার সঙ্গে তো এ ভাবে দাঁড়িয়ে কথা হতে পারে না হাবুল, এসো আমার সঙ্গে।

হাবুল সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানিয়ে বলে, চলুন কোথায় যেতে হবে।

হেঁটেই চলে মিতালী, হাবুল মিতালীকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে।

দু' জনে এসে মেমোরিয়ালের সামনে এসে বসল।

বল এবারে হাবুল, তুমি কি বলছিলে ?

আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছে, আমি তার জন্য ক্ষমা চাইছি বড়দি। আমি প্রস্তুত আপনি আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

সাত্যই তুমি মন স্থির করেছ তো হাবুল?

আপনার পা ছুঁয়ে আমি দিব্বি গেলে বলছি—

থাক থাক—পা ছুঁতে হবে না—কিন্তু একটা কথা—

বলুন?

বিয়ের আগে তোমাকে তোমার মা-বাবার কাছে কথাটা প্রকাশ করতে হবে—

মা বাবার কাছে? কিন্তু—বলছিলাম তাঁরা যদি মত না দেন? তা হলে—তা হলে কি বিয়ে আমাদের হবে না?

তা হলে কত বড় ঝক্কি তোমার ঘাড়ে পড়বে তুমি কি বুঝতে পারছ না হাবুল?

ঝক্কি!

নিশ্চয়ই। ধর তোমার বাবা যদি এক পয়সাও তোমাকে না দেন, দোকান থেকেও তোমাকে বঞ্চিত করেন, কি করে তুমি চালাবে ভেবে দেখেছ কথাটা?

সে জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না বড়দি। যাহোক একটা ব্যবস্থা আমি করবই।

কিন্তু—

বলছি তো আপনি কিছু ভাববেন না। তা ছাড়া ব্যাঙ্কে আমার নামে যে টাকা আছে সেও কম নয়। বাবা জানেন না আমি অনেক আগেই তা অন্য ব্যাঙ্কে সরিয়ে নিয়েছি—

তাই নাকি!

হ্যাঁ। আপনি সে জন্য নিশ্চিন্ত থাকুন।

বেশ। তা হলে আমি মণিকে সব কথা বলি? তারও তো একটা মতামত আছে।

নিশ্চয়। কিন্তু মণি কোথায় যদি বলেন তো আমি তার সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করে নিতে পারব।

না, মণির সঙ্গে তোমার দেখা হবার কোন উপায় নেই।

আপনি না হয় সে সময় আমাদের কাছেই থাকবেন।

উহুঁ। তুমি বরং আজ শনিবার, সোমবার আমার সঙ্গে ছুটির পর অফিসে দেখা করো।

সোমবার। কাল হয় না বড়দি? কত দিন মণিকে দেখি নি!

উপায় নেই হাবুল। সোমবারই দেখা হবে—কথাও হবে। চল আজ ওঠা যাক।

হাবুলের প্রস্তাবে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না মিতালীর। কারণ গত রবিবার মণিমালার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হেডমিস্ট্রেসের কাছ থেকে মিতালী মণিমালা সম্পর্কে যে রিপোর্ট পেয়েছিল তাতে করে বেশ চিন্তিতই হয়ে পড়েছিল মিতালী।

মণিমালা কান্নাকাটি করে না বটে, তবে পড়াশুনা কিছুই করে না। সর্বদাই কেমন যেন গুম হয়ে থাকে। ভাল করে খায় না, কারও সঙ্গে মেশা দূরে থাক, কথা পর্যন্ত নাকি বলে না। চেহারারও মণিমালার যেন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই ক দিনেই মুখটা শুকিয়ে গিয়েছে, চোখের কোলে কালি পড়েছে। মণিমালাকে যেন চেনা যায় না। এমন কি মিতালীর সঙ্গেও সেদিন বিশেষ কোন কথা বলে নি। তার সমস্ত কথার জবাবে হুঁ হাঁ করে গিয়েছে।

সেদিনের পর থেকেই মিতালী ভেবেছে, তবে কি ঊর্মিলার কথাই ঠিক। সে হাবুলকে ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায়ই করেছে! একটা অপরাধবোধ যেন এ কটা দিন কেবলই তাকে পীড়ন করেছে। তাই আজ হাবুলের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাকে আগের দিনের মত ফিরিয়ে দিতে পারে নি মিতালী।

পরের দিনই দ্বিপ্রহরের দিকে মিতালী মণিমালার বোর্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল।

কিন্তু বোর্ডিংয়ে পৌঁছে হেডমিস্ট্রেস লাবণ্য মুখার্জীর সঙ্গে দেখা হতেই মণিমালা সম্পর্কে তিনি যে সংবাদ দিলেন, শুনে যেন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায় মিতালী! ভোর বেলা থেকেই নাকি বোর্ডিংয়ে কোথাও মণিমালাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পাওয়া যাচ্ছে না?

না! আমি যে কি মুশকিলে পড়েছি সমস্ত বোর্ডিংয়ে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গিয়েছে, আমি তো আপনাকে খবর পাঠাব ভাবছিলাম। আপনি এসে পড়েছেন ভালই হল।

আমি তো ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না লাবণ্য দেবী, ম্লান কণ্ঠে বলে মিতালী।

আমি নিজেও তো কিছু বুঝতে পারছি না।

আচ্ছা, কোন চিঠিপত্র কিছু লিখে রেখে গিয়েছে কি ?

না। সমস্ত ঘর তার তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। সেরকম কিছুই পাই নি।

তাই তো। কি এখন করা যায় বলুন তো!

আমার তো মনে হয় পুলিশে একটা খবর দেওয়া উচিত আমাদের।

পুলিসে ?

হ্যাঁ, দেখুন এ ধরনের ব্যাপার—শেষ পর্যন্ত যদি দেখা যায় সে একটা কিছু—

একটা কিছু—কি ?

মানে বলছিলাম আত্মহত্যা-টত্যা—

নিজের অজ্ঞাতেই যেন ধক করে ওঠে মিতালীর বুকের ভিতরটা। মনে পড়ে যায় কৃষ্ণার কথা, চিত্রার কথা।

মণিমালা কি শেষ পর্যন্ত তা হলে সত্যি সত্যি আত্মহত্যাই করল! বিচিত্র নয় কিছু। এই ধরনের আত্মহত্যা করাটা যেন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একটা রেওয়াজ হয়ে উঠেছে ইদানীং। মণিমালাও তা হলে কি আত্মহত্যাই করল!

সত্যি, মিতালী যেন আর ভাবতে পারে না।

ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলে, আমি বরং এক বার চার দিকে খোঁজ করে দেখি—

দেখুন—তবে আমার মনে হয় পুলিসে একটা সংবাদ দেওয়া ভাল।

আগে আমি খোঁজ করে দেখি, তার পর যা হয় ভেবে-চিন্তে করা যাবে। আমি তা হলে চলি—

বিদায় নিয়ে মিতালী বোর্ডিং থেকে বের হয়ে এল।

সত্যিই মিতালীর যেন আর পা সরছিল না। সত্যিই যদি মণিমালা আত্মহত্যাই করে থাকে তো কি সান্ত্বনা সে আর দেবে নিজেকে। সেই কি তবে দায়ী হল না ব্যাপারটার জন্য! কেন সে মিথ্যে আগ বাড়িয়ে ওদের ব্যাপারে মাথা গলাতে গেল! কেমন যেন মুহ্যমানের মত ফিরে এল মিতালী হোস্টেলে।

মাথা নীচু করে ভাবতে ভাবতেই হোস্টেলের গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে যাবে, হঠাৎ হাবুলের ডাকে চমকে মুখ তুলে তাকাল।

বড়দি—

কে! হাবুল ?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ আপনার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

মিতালীর কণ্ঠ দিয়ে যেন শব্দ বের হয় না। কি বলবে বুঝতে পারে না।

আপনাকে একটি বার এখুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে বড়দি।

যেতে হবে, কোথায় ?

টালায়।

টালায় ?

হ্যাঁ, আমি ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েই রেখেছি চলুন—

চলুন বড়দি। আর দেরি করবেন না।

কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না হাবুল—

কি ?

মণিমালা যেখানে ছিল সেখানে নাই।

তার কথা পরে হবে, আগে আপনি চলুন আমার সঙ্গে।

মিতালীকে যেন আর কোন কথা বলবার অবকাশ মাত্রও না দিয়ে সেই ট্যাক্সিতে তাকে নিয়ে গিয়ে তুলল হাবুল। এবং হাবুলের নির্দেশমত ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। ট্যাক্সি ছুটে চলেছে মিতালী যেন মুহ্যমানের মত ট্যাক্সির মধ্যে বসে থাকে। হাবুল সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসেছে।

সহসা কেন না জানি, মিতালীর দু' চোখের কোল ছাপিয়ে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। মণিমালা, মণিমালা কি তবে সত্যি সত্যি আত্মহত্যাই করল ?

॥ ২০ ॥

মণিমালার চিন্তায় এমন তলিয়ে ছিল মিতালী যে টেরও পায় নি, কখন এক সময় টালায় হাবুলের বাসাবাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি থেমেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে তখন জমাট বেঁধে উঠেছে।

বড়দি নামুন—

হাবুলের ডাকে চমকে উঠে মিতালী শুধায়, কোথায় ?

নামুন !

মিতালী শ্লথ পায়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে এল।

সদরে তালা দেওয়া ছিল। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হাবুল পকেট থেকে চাবি বের করে সদর দরজার তালা খুলে আহ্বান জানাল, আসুন বড়দি।

কোথায় ?

একটা আনন্দ আর নিশ্চিন্ততা নিয়ে যেন মিতালী হোস্টেলে ফিরে এল।

ঊর্মিলা শুধায়, ফিরতে এত দেরি হল যে তোমার! কোথায় গিয়েছিলে?

মিতালী তখন সংক্ষেপে মণিমালা ও হাবুলের সমস্ত ব্যাপার খুলে বলে ঊর্মিলাকে।

বল কি, এত কাণ্ড!

হ্যাঁ!

তা হলে আর দেরি করো না। তাড়াতাড়ি এবারে ওদের বিয়েটা দিয়ে দাও।

তা তো দিতেই হবে।

বলতে বলতে তোয়ালে আর সোপ কেসটা নিয়ে বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল মিতালী; ঊর্মিলা বলে, তোমার একটা চিঠি আছে ঐ টেবিলে।

চিঠি!

হ্যাঁ—ঐ যে—দেখ না টেবিলে রয়েছে।

ঢং ঢং করে ঐ সময় হোস্টেলে খাবার ঘণ্টা পড়ে। ঊর্মিলা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিতালীর আর যাওয়া হল না বাথরুমে। চিঠিটা তুলে নিল টেবিল থেকে। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করে। করণ সিংয়ের চিঠি। খামের উপরে ইংরাজী হস্তাক্ষর দেখেই অবিশ্যি মিতালী বুঝতে পেরেছিল করণ সিংয়েরই চিঠি। অনেক দিন পরে করণ সিংয়ের চিঠি এল। প্রায় মাস খানেকেরও বেশী পরে।

করণ সিং লিখেছে:

মিতালী,

আজ এসেই তোমার চিঠি পেলাম। চিঠিটা এসে আমার অফিসের ঠিকানাতেই পড়েছিল। এক মাস প্রায় বাইরে বাইরে টুর করে এলাম।

প্রথমেই শুধাই তোমার বোন মণিমালার কথা। নতুন জীবন সে মেনে নিতে পেরেছে কি! তবে আমার কিন্তু মনে হয় তার বিয়ে দিতে পারলেই ভাল হত। অবিশ্যি কথাটা তোমার একেবারে অতিশয়োক্তি নয়। কে এমন ছেলে আছে আজকের দিনে যে সব জেনে-শুনে বিয়ে করবে মণিমালাকে। কিন্তু তবু বলব সারা দুনিয়াকে একেবারে অমনি এক চোখের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করো না। এমন মানুষ তো আজও থাকতে পারে যে জাত-ধর্মের গোঁড়ামি মানে না। এবং যে সাহসের কথা তুমি বলছ সে সাহসের পরিচয়ও দিতে পারে।

যাক গে সে কথা। এদিকে এক মজার ব্যাপার হয়েছে। মা তোমার সব কথাই আমার মুখ থেকে শুনেছে। তোমার সব কথাই মাকে আমি বলি। ইদানীং মা আমাকে প্রায়ই বিয়ের তাগাদা দিচ্ছেন অথচ তাঁর কথায় আমি কিছুতেই কান দিচ্ছি না। তাই সেদিন আমাকে কি বললেন জান! যদি আমার ইচ্ছা হয়ে থাকে তোমাকেই বিয়ে করার, তা হলে তোমাকেই কেন বিয়ে করি না।

সত্যি কথা বলতে কি, কথাটা শুনে আমি যেন চমকে উঠেছিলাম। কারণ কখনও তো সে কথাটা আমার মনে হয়নি। ভাবা তো দূরের কথা। তবে মা হঠাৎ ওকথাই বা বললেন কেন? তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় সামনা-সামনি নয়, যা কিছু পরিচয় গত তিন-চার মাসে চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়েই। সে কথা তিনিও জানেন। তবে হঠাৎই বা ঐ কথাটা বলতে গেলেন কেন! আচ্ছা মিতালী ও কথা মানে মায়ের কথা যাক; চিঠি-পত্রের ভিতর দিয়েই না হয় তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় কিন্তু তবু তো সেটা পরিচয়ই। তবু তো আমরা পরস্পরের আজ অচেনা নয়। এবং সেই পরিচয়ের দাবিতেই যদি একটা কথা আজ সত্যি সত্যিই জিজ্ঞাসা করি রাগ করবে কি? তুমি কি এই ভাবেই জীবনটা কাটাতে চাও? যদি কেউ তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়, সে ডাকে সাড়া দেওয়া কি তোমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

আচ্ছা আজ আর তোমাকে বিরক্ত করব না। এইখানেই ইতি করে পত্রের আশায় রইলাম।

করণ সিং

সত্যিই, মিথ্যা লেখে নি কিছু করণ সিং। তাদের পরস্পরের আলাপ চিঠির মধ্যে দিয়েই। কিন্তু আলাপ যা কিছু চিঠির মধ্যে দিয়ে হলেও, দীর্ঘ দিন মিতালী করণ সিংকে কি দেখে নি!

করণ সিং ভদ্র শিক্ষিত বিনয়ী এবং স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এক কর্মঠ যুবক। সারা জীবনের সঙ্গী হিসাবে এর চাইতে বেশী কি আর একটি মেয়ের কাম্য থাকতে পারে। তা ছাড়া করণ সিং তো মিথ্যা কিছু বলে নি। সত্যিই কি এইভাবে জীবনটা তার শেস করতে সে চায় নাকি। ক্রমশঃ যত দিন যাচ্ছে সে কি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে না বর্তমান জীবনের এই একঘেয়েমিতে। ছুটো খেয়ে পরে কোন মতে এই ভাবে এক ঘেয়ে উত্তেজনাহীন ক্লান্তিকর জীবনটাকে কাটিয়ে দেওয়াটাই কি একটি মেয়ের সব! সেইটাই কি তার আকাজ্ক্ষার শেষ!

সে রাত্রে মিতালীর ভাল করে ঘুম হল না। বার বার করণ সিংয়ের চিঠির কথাটাই মনের পাতায় যেন তার ভেসে উঠতে লাগল। মিতালী জানত না যে চিরন্তন ঘর বাঁধার স্বপ্ন প্রত্যেক মেয়ের মনের মধ্যে থাকে, সে স্বপ্ন তারও মনের মধ্যে ছিল এবং প্রবীরের কাছ থেকে রূঢ় আঘাত পেয়ে এবং চিত্রা ও কৃষ্ণার দুর্ভাগ্যে ক্ষণেকের জন্য সেটা গুটিয়ে গেলেও মণিমালা ও হাবুলের ঘটনা এবং করণ সিংয়ের পত্রে সেটা আবার নিজের অজ্ঞাতেই মনের জেগে উঠেছিল।

কিন্তু সেই সত্যটাকে কেবল স্বীকার করে নেবার মত সাহস তার ছিল না।

পরের দিন অফিসে গিয়েই মিতালী ছুটি নিয়ে বের হয়ে পড়ল হাবুলের টালার বাসার উদ্দেশ্যে। এবং সেখানে পৌঁছে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মণিমালার মুখের দিকে তাকিয়ে, তার মুখেব পরিবর্তন দেখে যেন সে বিস্মিত হয়ে যায়।

হাসিতে আনন্দে গর্বে সে মুখখানা যেন আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মণি-মালার মুখের দিকে যত বার তাকায় মিতালী, তত বারই যেন মনে হয় এ-ই বুঝি মেয়েদের আসল রূপ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যে তারা এক দিন স্ত্রী হবার মা হবার দাবি নিয়ে এ পৃথিবীতে আসে।

মিতালী মণিমালা আর হাবুলকে নিয়ে রেজিস্ট্রী অফিসে গিয়ে যথারীতি নোটিস দিয়ে এল এবং ঠিক হল পাঁচ দিন বাদে তাদের বিয়ে হবে।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিতালী বেরুতে যাবে এমন সময় বাইরের দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

মিতালীই দরজা খুলে দিল। দরজার গোড়ায় যে ছেলেটি চিঠি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল সে মিতালীর অপরিচিত নয়। রামধন মিত্র লেনে তাদের পাশের বাড়ির ছেলেটি। নাম তার সুশীল।

আপনি এখানে আছেন! আমি আপনার অফিসে ও হোস্টেলে গিয়ে ঘুরে এখানে আসছি—

কেন? কোন দরকার ছিল কি?

আজ নটার সময় অফিস বেরুবার মুখে শশিবাবু হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গিয়েছেন।

সেকি!

মণিমালাও ইতিমধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে।

হ্যাঁ, দেখুন না চিঠিটা, টেপীদিই চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন—

শশিভূষণ মারা গিয়েছেন।

চিঠিটা মিতালী দেখলেও না, পড়লও না। সুশীলের দিকে তাকিয়ে বললে কেবল, চল—

মিতালী বেরুতে যাবে, হাবুল পিছন থেকে বললে, একটু দাঁড়ান দিদি, আমি চট করে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি। আমরা সকলেই যাব।

হাবুল তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে ওরা ট্যাক্সি থেকে যখন রামধন মিত্র লেনের বাসার সামনে এসে নামল, সমস্ত বাড়িটা যেন একেবারে অদ্ভুত রকম স্তব্ধ এবং পাড়া প্রতিবেশী কয়েক জন ভদ্রলোক নিঃশব্দে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। মিতালী আগে ও তার পিছনে পিছনে সকলে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করল।

॥ ২১ ॥

শশিভূষণের মৃত্যুতে রামধন মিত্র লেনের বাড়িটা যেন শোকে একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল! শশিভূষণের মৃত্যু নয়, যেন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারেব মৃত্যু হয়েছে। নিত্যদিনের মত অফিসে যাবেন বলে জামা-কাপড় পরে শশিভূষণ স্ত্রীর কাছে এক গ্লাস জল চেয়েছিলেন। সরস্বতী এসে জলের গ্লাস স্বামীর হাতে দেন। এক চুমুক জল পান করেই শশিভূষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সব কিছু শেষ হয়ে যায়। ডাক্তার ডাকবার সময়ও পাওয়া যায় নি।

মেঝেতে জামা-কাপড়-পড়া অবস্থাতেই শশিভূষণের মৃতদেহ একটা পাটির উপর শায়িত ছিল। চক্ষু দুটি মুদ্রিত। মৃত্যু নয়, কোথাও এতটুকু বিকৃতি নেই, যেন তিনি শান্তভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন। অকাতরে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন শশিভূষণ। ঘরের মধ্যে কেউ ছিল না এক মাত্র শশিভূষণের স্ত্রী সরস্বতী ব্যতীত। সরস্বতী শশিভূষণের পায়ের কাছে নিঃশব্দে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। অদ্ভুত শান্ত স্তব্ধ যেন বাড়িটা।

টেপীর মুখেই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনল মিতালী। দাহ করবার কোন ব্যবস্থা পর্যন্ত এখনও হয় নি। মিতালীর ব্যাগে মাত্র বারটি টাকা ও কিছু খুচরো পয়সা ছিল। হোস্টেলেও সুটকেসে কিছু নেই। মিতালী কি করবে যেন ভেবে পায় না। ঐ সময় হাবুল এগিয়ে এল, আপনাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না বড়দি। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

সাত্য, দু'ঘণ্টার মধ্যেই হাবুল সব ব্যবস্থা করে ফেলল। এবং পাড়ার ছেলেদের ডেকে সন্ধ্যা-নাগাদ মৃতদেহ নিয়ে হাবুল বের হয়ে গেল।

শশিভূষণ কিছুই সঞ্চয় করে যেতে পারেন নি। শশিভূষণের ব্যাগে মাত্র কুড়িটি টাকা ছিল। সরস্বতী কোন দিনই সংসারের কোন ধার ধারেন নি। যেমন শশিভূষণ দিয়েছেন তেমনি তিনি চালিয়েছেন। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে কোন খবরই রাখতেন না।

শশিভূষণ বে-সরকারী অফিসে অর্থাৎ এক মার্চেন্ট অফিসে কাজ করতেন। সংবাদ নিয়ে জানা গেল অফিসে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকেও অনেক টাকা ধার করে রেখে গিয়েছেন শশিভূষণ। টেপী মাসে আজকাল সামান্য বিশ-পঁচিশ টাকা উপার্জন করছে। এতগুলো প্রাণীর খাওয়া পরা বাসা খরচ যে কি ভাবে চলবে মিতালী ভেবে পায় না। এবং এ ব্যাপারে যে কার সঙ্গে দুটো পরামর্শ করবে তাও বুঝতে পারে না মিতালী।

সরস্বতী তো স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে কেমন যেন জবুথবু হয়ে গিয়েছেন। কারও সঙ্গে কথাও বলেন না কিছু, সর্বদা মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকেন। হাবুল অবিশ্যি তার যথাসাধ্য করছে, কিন্তু সে তো পরের ছেলে। কত দিন সে আর করবে। মিতালীর ঘাড়েই যে সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল।

হোস্টেল থেকে আবার ফিরে এল মিতালী রামধন মিত্র লেনের বাসাতেই।

গত কাল কোন মতে শশিভূষণের শ্রাদ্ধ চুকে গিয়েছে।

দশ দিনের ছুটি নিয়েছিল মিতালী অফিসে। কাল থেকে আবার অফিসে জয়েন করতে হবে। ইতিমধ্যে মিতালীর তাগিদেই হাবুলের সঙ্গে মণিমালার বিয়েটা রেজিস্ট্রী করে হয়ে গিয়েছে। হাবুল মণিমালাকে নিয়ে কাল তাদের টালার বাসায় চলে যাবে।

হাবুলের বাবা ছেলের বিয়ের সংবাদ শুনে ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছেন। বলেছেন, একমাত্র ছেলে হলেও হাবুলের সঙ্গে নাকি কোন সম্পর্কই তাঁর আর রইল না। অমন ছেলের মুখদর্শনও তিনি আর করবেন না। তবে হাবুলের মা ইতিমধ্যে গোপনে রাত্রিতে এসে এক দিন পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে গিয়েছেন।

নীচে বিকেলের দিকে রান্না-ঘরের সামনে ছোট বারান্দায় বসে বঁটি পেতে তরকারী কুটতে কুটতে ভাবছিল মিতালী, শেষ পর্যন্ত তাকে আবার কি বিচিত্র ভাবেই না রামধন মিত্র লেনের বাড়িতে ফিরে আসতে হল। আর এও ঠিক,

জীবনটাও হয়তো এই ভাবেই কাটাতে হবে তাকে। মাত্র এগারটা দিন, তারই মধ্যে যেন সব একটা আকস্মিক ঝড়ের ঝাপটায় ওলট-পালট হয়ে গেল। কিন্তু মিতালীর কাছে আজ যে চিন্তাটা সব চাইতে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, সে কি পারবে, এই গুরুদায়িত্ব কি সে বহন করতে পারবে?

বাইরে সদর দরজায় কড়াটা নড়ে উঠল। টেপী রান্নাঘরের মধ্যে ছিল, সে শুনতে পায় না, কিন্তু মিতালী শুনতে পায় কড়ানাড়ার শব্দ।

সবাই উপরে। মিতালীই বঁটিটা রেখে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলেই কিন্তু মিতালী চমকে ওঠে। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রবীর হাজরা। কয়েকটা মুহূর্তে কোন কথাই যেন সরে না মিতালীর মুখ দিয়ে। বোবা দৃষ্টিতে কেবল চেয়ে থাকে প্রবীরের মুখের দিকে মিতালী।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। গলি-পথে ম্লান আলো।

তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল মিতালী, প্রবীরই বললে।

বলুন!

কিন্তু এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো হতে পারে না। ভিতরে গিয়ে বসতে পারলে—

আপনার তো অজ্ঞাত নয় মিঃ হাজরা, আমাদের এ বাড়িতে আপনার মত সম্মানিত এক জনকে এনে বসাবার মত সত্যিই কোন স্থান নেই।

মৃদু অথচ শান্ত কণ্ঠে কথাটা বলে মিতালী।

আমি তো আজ অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে তোমার এখানে আসি নি মিতালী। আমি এসেছিলাম কোন এক সময় তুমি যে প্রবীর হাজরাকে চিনতে সেই প্রবীর হাজরা হয়েই।

কথাটা আপনার একান্ত হাস্যকর শোনাচ্ছে নয়।

হাস্যকর!

তাই। কারণ অধীনস্থ এক সামান্য কর্মচারী হিসাবে আপনি তো আমাকে যে কোন সময়েই আপনার অফিস-কামরাতে ডেকে পাঠালেই আমি যেতাম যেতে আমাকে হতই।

তা হয়তো যেতে, কিন্তু অফিসের প্রয়োজনে তো আসি নি।

তবে?

এসেছি আমার নিজের প্রয়োজনেই।

নিজের প্রয়োজনে!

শোন মিতালী, তুমি আমাকে আজ তোমার বাড়িতে ঢুকতেও দেবে না বুঝতে পারছি কিন্তু সত্যিই আজ আমি এসেছিলাম আমাদের পুরানো সম্পর্কটাকে যদি বাঁচিয়ে তোলা যায় তারই একান্ত ইচ্ছা নিয়ে আর সেটা অফিসে সম্ভব নয় বলেই অফিসের মধ্যে হুকুম না পাঠিয়ে এসেছিলাম তোমার বাড়িতেই।

আপনি তা হলে সেটা সম্ভব বলেই মনে করেছিলেন মিঃ হাজরা ?

করেছিলাম। আর এখনও করছি বৈকি।

প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসল মিতালী।

প্রবীর আবার ডাকে, মিতালী—

না, মিঃ হাজরা।

তা হলে কি সত্যিই বুঝব সেটা কোন দিনই আর সম্ভব নয় এ জীবনে তাই—

প্রবীর হাজরা অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, এই তা হলে তোমার শেষ কথা ?

আমি দুঃখিত মিঃ হাজরা।

বেশ। তবে তাই হোক। আচ্ছা চলি—প্রবীর হাজরা কথাটা বলেই আর দাঁড়াল না রাস্তায় নেমে হাঁটাতে হাঁটতে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

মিতালী খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়েই থাকে। এবং কতক্ষণ যে যে দাঁড়িয়ে ছিল নিজেও জানে না। হঠাৎ টেঁপীর কণ্ঠস্বরে ফিরে তাকাল।

কে এসেছিল বড়দি ?

অ্যাঁ, কিছু বলছিস।

কে এসেছিল ?

কই কেউ না তো। চল—

দরজাটায় পুনরায় খিল তুলে দিল মিতালী।

পরের দিন অফিসে গিয়ে মিতালী যথারীতি নিজের টেবিলে বসে কাজ শুরু করে। কিন্তু কাজে বসলেও মনটা তার চঞ্চল হয়ে থাকে। প্রতি মুহূর্তেই সে প্রবীরের কামরা থেকে তার ডাকের অপেক্ষা করে। কিন্তু বেলা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত কোন ডাক এল না যখন এবং মিতালী মনে মনে একটু বিস্মিতই বোধ করেছে, এমন সময় রামদীন বেয়ারা পিওন বুকে করে একটা চিঠি নিয়ে এল অফিসের খামে ভরা।

পিওন বুকে সই করে মিতালী চিঠিটা নিল। শুধু চিঠিই নয়, চিঠি ও সেই সঙ্গে চার্জ শীট। চিঠির মর্মার্থ হল, অস্থায়ী ভাবে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হল। এবং চিঠির সঙ্গে পৃথক টাইপ করা চার্জ শীট।

চিঠিটা পড়ে চার্জ শীটটা আর পড়বার কথাও মনে থাকে না যেন মিতালীর। একটা কথাই কেবল তার মনে হয়, প্রবীর হাজরা তাকে শেষ পর্যন্ত দাঁত বের করে কামড় বসিয়েছে। কয়েকটা মুহূর্ত ঝিম দিয়ে বসে রইল মিতালী।

কিছুক্ষণ পূর্বে যে কাজটা করছিল, তার কাগজপত্র এবং চার্জ শীটের চিঠিটাও সামনের টেবিলের উপরে খোলাই পড়ে থাকে। হাত দুই ব্যবধানে অফিসের অফিসের অনিলবাবু ও সীতাংশু হেসে হেসে কি যেন সব বলাবলি করছে। চিত্রাদির জায়গায় কিছু দিন হল যে মেয়েটি অফিসে এসে ঢুকেছে মীরা দত্ত, টাইপ জানে মেয়েটি—বি. এ. পাশ করে শর্টহ্যাণ্ড-টাইপিংও শিখেছে, টাইপ-রাইটিং মেশিনে কি যেন একটা খুট খুট করে টাইপ করছে। অফিসের হল ঘরে উত্তরের দেওয়ালে বড় গোলাকার বহু পুরাতন হ্যামিলটনের ওয়াল ক্লকটি সময় সংকেত করছে—সওয়া চারটে। অফিসের ছুটির সময় ঘনিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে সকলেই যে যার টেবিলের কাগজপত্র সেদিনকার মত গোছাতে ব্যস্ত।

প্রবীর তাহলে শেষ পর্যন্ত এমনি করেই মিতালীর উপরে আক্রোশটা মিটাল। কিন্তু তার চাইতেও বড কথা, কাল থেকে অনিশ্চিত কারণের জন্য তার আর চাকরি নেই। অনিশ্চিত কালের মত তার উপার্জনও বন্ধ। অন্য সময় হলে অন্য কথা ছিল, কিন্তু আজ যে কাকার সমস্ত সংসারটা তার ঘাড়ের উপর। মাথাটা ঝিম ঝিম করে চারিদিক যেন কেমন শূন্য মনে হয় মিতালীর।

একে একে কর্মচারীরা সব অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটি একটি করে চেয়ার খালি হয়ে যাচ্ছে। তাকেও এবারে উঠতে হবে।

কিন্তু তবু উঠি উঠি করেও উঠতে উঠতে মিতালীর সন্ধ্যা হয়ে গেল। শীতের বেলা, অনেক আগেই ম্লান হয়ে আসতে শুরু করে এবং পৌনে ছটা নাগাদ সন্ধ্যাই হয়ে যায়। মিতালী যখন চেয়ার ছেড়ে উঠল, সে ও অফিসের কয়েক জন বেয়ারা দারোয়ান ব্যতীত কেউই তখন আর অফিসে নেই। দীর্ঘ পাঁচ বছর এই অফিসে চাকরি করছে মিতালী। স্থায়ী হয়েছে অবিশ্যি মাত্র বছর দুই।

দীর্ঘ পাঁচ বছরের কর্মস্থল মিতালীর। এই পাঁচ বছরে ছুটিছাটা অবিশ্যি নিয়েছে মিতালী, কিন্তু তাও বেশী নয়। বছরে ছুটি পাওনা থাকা সত্ত্বেও আট-দশ দিনের বেশী কখনই বড় একটা ছুটি নেয় নি। এবং অফিসে কাজ করতে

করতে কেমন যেন একটা নেশা ধরে গিয়েছিল মিতালীর। ছুটি নিলেও মনটা পড়ে থাকত যেন অফিসেই। কাল থেকে অনিশ্চিত কালের জন্য তাকে অফিসে আসতে হবে না।

অফিস থেকে বের হয়ে নিত্যকারের মত ট্রামে চাপল না মিতালী, ফুটপাথ ধরে হেঁটেই চলল। ইউনিয়নে কালই ব্যাপারটা রিপোর্ট করতে হবে। জানাতে হবে ইউনিয়ন সেক্রেটারীকে তার সাসপেণ্ডের ব্যাপারটা। দুই পক্ষে অতঃপর হয়তো বাগবিতণ্ডা শুরু হবে তার সাসপেণ্ডের ব্যাপার নিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত যে কি হবে কেউ জানে না।

প্রবীর হাজরা যখন কামড় বসিয়েছে, সে আটঘাট বেঁধেই কামড় বসিয়েছে। কি চার্জ তার বিরুদ্ধে সে অবিশ্যি এখনও পড়ে দেখে নি, তবে এটা মিতালী স্পষ্টই বুঝতে পারছে, যে চার্জই প্রবীর হাজরা তার বিরুদ্ধে আনুক—সেগুলো শক্ত চার্জই।

রাত তখন প্রায় আটটা হবে। শ্লথ অবসন্ন পায়ে রামধন মিত্র লেনে প্রবেশ করতেই একেবারে গলির মুখেই হাবুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মিতালীর। হাবুল এসেছিল বিকেলে মিতালীর সঙ্গে দেখা করতে এবং এতক্ষণে বসে বসে অপেক্ষা করবার পর ফিরে যাচ্ছিল।

গলির মুখে মিতালীর সামনাসামনি পড়তেই হাবুল বলে ওঠে, এই যে বড়দি, ফিরতে এত দেরি হল যে, আপনার জন্য এতক্ষণ বসে বসে—

কথাটা শেষ হয় না হাবুলের। গলির গ্যাস পোস্টের আলোয় মিতালীর ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখের প্রতি নজর পড়ায় একটু যেন বিস্মিত কণ্ঠেই প্রশ্ন করে, কি হয়েছে বড়দি?

কিছু না ভাই।

তবে মুখটা আপনার অত শুকনো; ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে বড়দি! শরীরটা কি ভাল নয়?

মুহূর্তকাল কি যেন ভাবল মিতালী। আর কাউকে না হোক্, অন্তত হাবুলকে বোধ হয় সে বলতে পারে ব্যাপারটা। কেন যেন ঐ মুহূর্তে মনে হয় মিতালীর, আজকের এই সংকটের মুহূর্তে হাবুলের উপরে সে বিশ্বাস রাখতে পারে। নির্ভর করতে পারে।

মিতালী তাই বলে, তোমার কাছে ব্যাপারটা আর গোপন করব না হাবুল। অনিশ্চিত কালের জন্য অফিসে চাকরি থেকে আমাকে সাসপেণ্ড করেছে।

কি বললেন, সাসপেণ্ড করেছে ?

হ্যাঁ, অনিশ্চিত কালের জন্য চাকরি থেকে আমাকে বরখাস্ত করেছে—

কে এমন কাজ করল বড়দি !

সে ভাই অনেক কথা। কাল দুপুরে এসো, সব বলল।

বেশ আসব, কিন্তু একটা কথা বড়দি।

কি ?

আমার হাতে যতক্ষণ টাকা আছে আপনি কিছু ভাববেন না।

মিতালী কিন্তু এবার হেসে ফেলে।

হাসছেন যে ?

সম্পর্কে তুমি আমার কি হও জান তো ! ভগ্নিপতি। কিন্তু যাক সে কথা। কাল এসো, সব কথা হবে।

আসব।

মণিকে কাল সঙ্গে এনো।

আনব। একটা কথা আজ আপনাকে বলতে এসেছিলাম বড়দি।

কি বল তো ?

বাবা বলেছেন টালার বাসা তুলে দিয়ে মণিকে নিয়ে এখনকার বাড়িতে চলে আসতে।

তাই নাকি ! সত্যিই সুখবর।

আমার অবিশ্যি যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মণি জিদ ধরেছে আসতেই হবে।

আসবে বৈকি। নিশ্চয়ই আসবে। বাবা ডেকেছেন—আসবে না। আসবে বৈকি ? সোৎসাহে বলে মিতালী।

কিন্তু আমি কেন যাব ? বাবা এসে তার ছেলের বৌকে নিয়ে যেতে পারে না। ছেলের বৌ বলে যখন স্বীকার করছেই তখন নিজে এসে নিয়ে যাবে না কেন ?

তা হোক। বাবা যখন ডেকেছেন আর দেরি করো না। কালই মণিকে নিয়ে এখানে চলে এসো।

বেশ। আপনি যখন বলছেন, আসব।

অতঃপর হাবুল বিদায় নিয়ে চলে। সেই সঙ্গে মিতালীর ভারাক্রান্ত মনটাকেও যেন অনেকটা হাল্কা করে দিয়ে যায়।

অফিসের চিঠিটা পাওয়া অবধি মিতালীর মনটা যে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই অবসন্নতাটা যেন অনেকটা দূর হয়ে যায়। মনটা অনেকটা হাল্কা হয়ে যায়।

বিপর্যয় এসেছে, তাই বলে মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? তাদের মত মধ্যবিত্তদের ঘরে ঘরে এ ধরনের বিপর্যয় তো পদে পদে। হতাশা আর বেদনা, বিপর্যয় আর সংঘাত তো প্রতি মুহূর্তে, তাই বলে হার স্বীকার করবে কেন সে! না, কিছুতেই না। মিতালী হারবে না।

॥ ২২ ॥

মাসখানেকের মধ্যেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে বাণু। একটা মাস সে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কেবলই ঘুরে ঘুরে বেড়াল। অশান্ত মনটাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু মনের শূন্যতা যেন ভরল না। মাঝ থেকে কেবল নিজেকে আরও ক্লান্ত মনে হতে লাগল। সব কিছু যেন ভার হয়ে গিয়েছে। এমনি মনের অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে এক দিন আবার বাণু বোম্বাই এসে উঠল।

উঠল সেই হোটেলে যে হোটেল থেকে এক দিন চার বছর পূর্বে সে পার্থকে বিদায় দিয়েছিল। এবং ঐমান সময় অনেক ডাক-ঘরের ছাপ নিয়ে তার কলকাতার ব্যাংক থেকে রিডাইরেক্টেড হয়ে পার্থর জবানীতে হাসপাতালের নার্সকে দিয়ে লেখা চিঠিখানা বাণুর হাতে এসে পড়ল।

পার্থ লিখেছে

বাণু,

চিঠির হস্তাক্ষর দেখেই বুঝতে পারবে আর এক জনকে দিয়ে এই চিঠিটা তোমায় লিখিয়ে নিচ্ছি। কারণ যে হাত দিয়ে চিঠি লিখব সে হাতটা আজ ডাক্তারের নির্দেশে প্লাস্টার করা এবং স্পিলনটের (Splint) উপরে রাখা।

ডাক্তার অবিশ্যি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন—আগের মতই হাতটা আবার আমার সুস্থ হয়ে উঠবে, কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি তা হবার নয়। কারণ এরা আমাকে যতই আশ্বাস দিক আমি তো জানি হাড়ের সারকোমা, দুরারোগ্য ব্যাধি। এবং শুধু হাতটাই নয়, আমাকেও হয়তো এক দিন অনতিবিলম্বেই গ্রাস করবে।

ক্যানসার ব্যাধির কোষ (সেল) গুলো নাকি অদ্ভুত কর্মিতকর্মা এবং অত্যাশ্চর্য বুদ্ধি তাদের। কিন্তু যাক সে সব ডাক্তারী শাস্ত্রের অবান্তর কথা। আদার ব্যাপারী আমি, জাহাজের সংবাদে আমার কি প্রয়োজন বল। আমি কি

ভাবছিলাম জান, হাসপাতালের নার্সকে দিয়ে আমার চিঠিটা লেখাতে লেখাতে? হাতটা আমার যাবার আগে কেন লিখে রাখি নি তোমাকে আমার শেষ চিঠিটা। তখন না পাঠালেও চিঠিটা আজ তো পাঠাতে পারতাম। তোমার পরিচয়ের শেষ সেতু হয়ে থাকত চিঠিটা।

গত কাল ডাক্তার এসে বলে গিয়েছেন দু-এক দিনের মধ্যে শেষ চেষ্টা এক বার করে দেখবেন—অর্থাৎ অপারেশন করবেন।

আমি অবিশ্যি বহু বার বলেছি প্রয়োজন নেই তার কিছু। হাতটা এবং সেই সঙ্গে আমারও যদি আজ যাবার প্রয়োজন হয়ে থাকে তো যাব। তুলি বাঁশী ও গীটার সবই যখন আজ আমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেল তখন বাকী দিনগুলোর জন্য কি আর সান্ত্বনা রইল আমার।

তোমাকে সব কথা জানালাম কারণ তোমাকে না জানালে প্রত্যবায়ের ভাগী হতে হবে যে আমাকে। আর একটা কথা: কলকাতার ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপজিটে কিছু টাকা আমার আছে এবং ইনস্ট্রাকশনও সেখানে দেওয়া আছে। সেই টাকাগুলো তোমাকে আমি নিতে বলছি না, কিন্তু অনুরোধ জানাচ্ছি এমন কিছুতে খরচ করো যাতে করে—। কি বলি বল তো? আমার আত্মা তৃপ্তি পাবে, না সেরকম কোন সেন্টিমেণ্ট আমার নেই—তবে এটুকু বলা রইল, দেখো যেন অন্তত মানুষের কোন কাজে লাগে টাকাগুলো।

ভালবাসা নিও। ইতি তোমার পার্থপ্রতিম

চিঠিটা পড়ে যেন রাণু স্তব্ধ হয়ে যায় এবং চিঠিটা হাতে করে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। তার পর এক সময় খেয়াল হতে চিঠির তারিখটা খোঁজ করতে গিয়ে দেখে চিঠির তারিখ থেকে কুড়ি দিন গত হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ কি মনে হয় রাণুর, উঠে পড়ে তখনই হোটেল থেকে বের হয়ে পড়ে। তার পর দিন দশেক আরও লেগে যায় রাণুর দৌড়াদৌড়ি করে পাসপোর্ট ও প্লেনের প্যাসেজ যোগাড় করতে। বার দিনের দিন লণ্ডনে এসে পৌঁছল রাণু।

জানুয়ারীর গোড়ার দিক তখন। পরের দিন সকালে গিয়ে মিড্‌ল-সেক্সের যে হাসপাতালের ঠিকানাটা দেওয়া ছিল, ট্যাক্সি করে সেই হাসপাতালের সামনে এসে নামল। আগের দিনই অবিশ্যি ফোনে সংবাদ নিয়ে জেনেছিল রাণু, পার্থ তখনও ঐ হাসপাতালেই আছে। কিন্তু তার অবস্থা আদৌ ভাল নয়।

সকালবেলা। হাসপাতালের কেবিনে বেডে শুয়েছিল পার্থ। রাণু কেবিনে এসে প্রবেশ করল।

নীচে ডাক্তারের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল রাণু, মিঃ চৌধুরী অর্থাৎ পার্থর সঙ্গে বেশী কথা বলবার চেষ্টা সে করবে না। কারণ রোগী কনডিশন খুবই লো। ইদানীং রাত্রে নাকি যন্ত্রণায় ঘুমই হচ্ছে না রোগীর। প্রায়ই পেথিডিন্ ইনজেশন দিতে হচ্ছে যন্ত্রণার জন্য। চিকিৎসা শাস্ত্রানুযায়ী যতটা সম্ভব সবই করা হয়েছে কিন্তু অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনা সম্ভব হয় নি।

তবে রোগীর মনের জোর ও রেজিসটেন্স খুব বেশী, তাইতেই রোগের সঙ্গে আজও যুদ্ধ করে চলেছে হাসি মুখে।

হাসপাতালের বিরাট কাচের সার্সি পথে সূর্যের আলো এসে পড়েছে কেবিনে। নার্স ফিডিং কাপে করে একটু একটু করে ফলের রস খাইয়ে দিচ্ছিল পার্থকে। কেবিনের দরজাটা মাথার দিকে, তাই রাণু এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়ালেও পার্থ তাকে দেখতে পায় না। কিন্তু নার্স ন্যাপকিন দিয়ে পার্থর মুছিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই তার দৃষ্টি পড়ল দরজার উপরে। কিন্তু নার্স কিছু বলবার আগেই ঠোঁটের আঙ্গুল তুলে ইশারায় তাকে কথা বলতে নিষেধ করে দরজার কাছে ডাকল রাণু তাকে!

নার্স সামনে এসে দাঁড়াতেই তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাণু শুধাল, কেমন আছে ও?

নার্স নিঃশব্দে মাথা হেলাল। প্রশ্ন করল, কিন্তু তুমি কে?

আমি!

হ্যাঁ। তা ছাড়া রোগীর কাছে আসবার আগে ডাক্তারের পারমিশন নিয়েছ?

নিয়েছি?

কিন্তু বললে না তো তুমি কে?

আমি! কথাটা বলতে গিয়ে যেন এক বার একটু ইতস্তত করল রাণু, তার পর শান্ত মৃদু কণ্ঠে বললে, আমি ওর স্ত্রী!

স্ত্রী!

হ্যাঁ

কিন্তু মিঃ চৌধুরী তো বলেছিল—

কি?

ওর নাকি বিয়ে হয় নি। ত্রিসংসারে কেউ নেই।

শান্ত মৃদু হাসি হাসল প্রত্যুত্তরে রাণু। তার পর পূর্ববৎ মৃদু কণ্ঠে বললে, আমি ভিতরে যেতে পারি?

নিশ্চয়ই, যাও, তবে—

কি?

বেশী কথা বলবার চেষ্টা করো না কিন্তু এখন ওর সঙ্গে।

পিছনে থেকে এসে নিঃশব্দে শায়িত পার্থর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রাণুর দু' চোখের কোল জলে ঝাপসা হয়ে যায়।

এ কি চেহারা হয়েছে পার্থর। ঐ কি দুর্দান্ত পুরুষ পার্থ চৌধুরী। জীবনের প্রাচুর্যে এক দিন যার দেহের প্রতিটি অঙ্গ উপচে পড়েছে, আজ একি তার চেহারা! জীর্ণ শীর্ণ, কালি ঢেলে দিয়েছে যেন সর্বাঙ্গে। মুখটা ভেঙে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। মাথার রুক্ষ চুলগুলো শীর্ণ কপালের উপরে এসে লুটোচ্ছে। ধীরে সন্তর্পণে হাতটা বাড়িয়ে পার্থর মাথা স্পর্শ করল রাণু।

চমকে ওঠে পার্থ, কে!

পার্থ!

এগিয়ে এল রাণু।

তুমি! সত্যিই তুমি এসেছ রাণু? আমি যে এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। সত্যি, সত্যিই তুমি তো!

আমাকে তুমি আগে খবর দাও নি কেন পার্থ?

পার্থ বাঁ হাত দিয়ে রাণুর হাতটা ধরে ছিল।

আগে খবর দিলে তো তুমি আসতে না।

সত্যিই কি তোমার তাই মনে হয় পার্থ!

না, না—এমনি ঠাট্টা করছিলাম। আসতে বৈকি! আসবে না। আমি ডাকলে তুমি আসবে না এ যে আমার চিন্তারও অতীত।

কথা বলো না, চুপ কর।

ডাক্তার বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ।

কিন্তু আজ আমি কেমন করে চুপ করে থাকি।

পার্থ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—কত দিন চুপ করে আছি বল তো! চুপ করে থেকে থেকে যে কথা বলতেই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। না রাণু—আজ আমাকে কথা বলতে দাও।

না, চুপ কর। লক্ষ্মীটি।

আরও কিছুক্ষণ পরে। পার্থ ডাকে, বাপু।

বল।

কাল রাত্রে অসহ্য যন্ত্রণায় যখন কিছুতেই ঘুমোতে পারছিলাম না, ডাক্তার পেথিডিন দিয়ে গেল তবু ঘুম নেই চোখে, তখন কবিগুরুর মহুয়ার একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি মনে পড়ছিল, তুমি কবিতাটা পড়েছ কিনা জানি না।

কোন কবিতাটা?

কবিতার নামটা মনে নেই। সব পংক্তি মনে নেই, মনে আছে শেষের পংক্তিগুলি।

মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করে পার্থ

উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নিবারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত মাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হোক সে নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে।

। ২৩।

রাত্রে চার্জ শীটটা খুলে ভাল করে পড়ে দেখল মিতালী।

পর পর পাঁচটি চার্জ আনা হয়েছে মিতালীর বিরুদ্ধে। ইরেগুলার অ্যাটেনডেন্স, ছুটি না নিয়ে অফিস কামাই, কাজের মধ্যে মারাত্মক সব ভুলত্রুটি এবং অসাবধানতার জন্য কোম্পানির বড় টাকার একটা টেণ্ডার হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। চার্জগুলোর জন্য তার কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে এবং সেই জন্যই ব্যাপারটা বিচারাধীন ও কালীন সময়ের জন্য তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

পরের দিনই ইউনিয়নের সেক্রেটারী মহিম চক্রবর্তীকে ব্যাপারটা সব জানাল মিতালী। কিন্তু মহিম চক্রবর্তী মিতালীর ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত শোনার পরও যেন বিশেষ উৎসাহ দেখায় না এবং মিতালীকে বিশেষ আশ্বাসও দেয় না। মিতালী জানত না যে মহিম চক্রবর্তী প্রবীর হাজরারই এক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

এবং মিতালী কিছু বলবার আগেই প্রবীর মহিমের কানে কথাটা তুলে মিতালী উপরে তার মনটা ভারী করে রেখেছিল।

বিকেলের দিকে ইউনিয়নের অফিস থেকে মিতালী যেন একটু নিরুৎসাহ হয়েই ফিরে এল। হাবুল বাড়িতেই অপেক্ষা করছিল মিতালীর জন্য। মিতালী ফিরে আসতেই শুধাল, কি হল বড়দি! সেক্রেটারী কি বলল?

বিশেষ কিছুই না। কেবল বললেন, প্রবীরের সঙ্গে নাকি দেখা করবেন তিনি।

আমি জানতাম বড়দি এমনিই হবে!

তুমি জানতে?

হ্যাঁ। তোমাদের ঐ ইউনিয়নের সেক্রেটারীটিকে আমি জানি। একের নম্বরের স্বার্থান্ধ আর সুবিধাবাদী মানুষটা। তা ছাড়া—

কি?

আজ আমার এক বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম। তার মহিম চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশেষ মাখামাখি আছে। কিন্তু সে বললে মহিম চক্রবর্তীর বিশেষ বন্ধু নাকি ঐ প্রবীরবাবু।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। তাই আমি বলছিলাম—

কি?

আপনি বরং অন্য কোথাও চাকরির চেষ্টা করুন বড়দি।

তুমি তো জান না হাবুল, আজকালকার দিনে একটা চাকরি পাওয়া কি দুঃসাধ্য ব্যাপার।

দুঃসাধ্য তো বটেই, তা হলেও চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? একটা কাজ করবেন বড়দি—

কি কাজ?

সন্তোষ বোস, এ পাড়ার কাউন্সিলার ছিলেন এক সময়—

তিনি তো এখন এম. পি.—

জানি আমি। ইলেকশনের সময় তাঁর জন্য আমি খেটেছিলাম—আমাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করেন।

ওসব বড়লোকের স্নেহের কথা তো জান না তুমি। তা ছাড়া—

কি?

ভদ্রলোকের স্বভাব-চরিত্র বিশেষ সুবিধার নয় শুনেছি।

হাবুল হেসে ফেলে, তা অবিশ্যি সত্যি। কিন্তু আমার সঙ্গে তো যাবেন আপনি।

কিছুই হবে না। তবে তুমি যখন বলছ যাব।

তা হলে আর দেরি নয়। কালই চলুন।

বেশ।

কাল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে যাব আমরা। আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

হাবুল চলে যাবার পর মিতালী ভাবে, হাবুলকে তো বলে দিল কাল সে সন্তোষ বোসের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। কিন্তু এক দিন ওই সন্তোষ বোসের জন্যই এ পাড়ার অন্নপূর্ণা গার্লস স্কুলের চাকরিটি তাকে ছাড়তে হয়েছিল, কথাটা সে তো ভোলে নি। ছ বছর আগেকার ব্যাপার।

এ পাড়ার প্রতিপত্তিশালী সন্তোষ বোস তখন ঐ অন্নপূর্ণা গার্লস স্কুলের সেক্রেটারী। সন্তোষ বোসের সঙ্গে দেখা করেই তার এক কথায় চাকরিটা হয়েছিল। এবং চাকরি পাবার দিন দশেক পরেই সন্ধ্যের দিকে সন্তোষ বোসের বাড়িতে তার ডাক পড়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এসেই সে চাকরিতে রেজিগনেশন দেয়।

আবার সেই সন্তোষ বোসের কাছে যাবে মিতালী। প্রবীর হাজরা আর সন্তোষ বোসের মধ্যে তো কোন পার্থক্যই নেই। ওদের সব এক জাত, এক ধর্ম ও এক নীতি অথচ মজা এই, ওদের হাতেই মজুত থাকে কিছু না কিছু ক্ষমতা। সন্তোষ বোস লোকটা যে কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট জন তাই নয়, স্বনামে বেনামে প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক। সব কিছু মিলিয়েই আজকের সমাজে সন্তোষ বোসের বিশেষ প্রতিষ্ঠা। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ যদিও ডিঙোয় নি, কিন্তু আজ আর সে কথা বলবার উপায় নেই কারও। কারণ বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে যে সব সারগর্ভ বক্তৃতা তিনি দেন সেগুলোর ভার এবং ধার দুইই আছে। এবং তিনি ইচ্ছা করলে যে মিতালীর একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না তাও নয়। হাবুলের আশাটা সে দিক দিয়ে অন্যায় নয়।

কিন্তু সন্তোষ বোসের কাছে যাওয়ার ব্যাপারটা যতই ভাবে মিতালী ততই তার মনে হয় তা হলে প্রবীর হাজরার কাছেই বা যেতে তার আপত্তিটা কোথায়? প্রবীর হাজরার কাছে এক বার গিয়ে দাঁড়াতে পারলেই যে তার সব মুশকিলের আসান হবে সে কথা মিতালীর চাইতে কে বেশী জানে।

রাত্রে শয্যায় শুয়ে যখন সবঐ চিন্তাই মনের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছিল মিতালীর, পাশ থেকে টেঁপী ডাকে, বড়দি ঘুমোলে নাকি ?

না। কেন ?

সংসার খরচের যে টাকা ছিল আমার হাতে সব কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে।

কিছুই নেই ?

না।

তা ছাড়া তোমাকে একটা কথা বলা হয় নি।

কি রে ?

পরশু দুপুরে যখন তুমি বাড়ি ছিলে না, বাড়িওয়ালা বলাইবাবু এসেছিলেন।

বলাইবাবু ?

হ্যা। বাবা থাকতে থাকতেই তিন মাসের বাড়ি ভাড়া বাকী পড়েছিল। এ মাসের ভাড়াটাও দেওয়া হয় নি—

তার মানে চার মাসের বাড়ি ভাড়া ?

হ্যা। এমন কথাও বলে গিয়েছেন ভাড়া দিতে না পারলে বাড়ি ছেড়ে দিতে। বাড়ি ছেড়ে দিলে নাকি দু শ টাকায় এ বাড়ি ভাড়া দিতে পারেন তিনি।

কথাটা বলাইবাবুর অত্যুক্তি নয়। সেই পুরোনো আমলের ভাড়াই আজও তারা দিয়ে আসছে। পঁয়ত্রিশ টাকা।

মাসের তো আজ আটাশ তারিখ—টেঁপী আবার বলে, তোমার মাইনে পেতে পেতে তো মাসের সেই দু তারিখ।

বলা বাহুল্য, একমাত্র হাবুল ছাড়া মিতালীর চাকরির ব্যাপারটা বাড়িতে আর কেউ এখনও জানে না। মিতালী নিজেও বলে নি, হাবুলকে বলতে মানা করে দিয়েছিল। তা ছাড়া আরও একটা দুশ্চিন্তা কাকীমাকে নিয়ে দেখা দিয়েছিল। একের পর এক সন্তান ধারণে সরস্বতীর দেহটা একেবারেই ভেঙে গিয়েছিল। কয়েক দিন আগে টেঁপীই সরস্বতীকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে এনেছিল। অত্যধিক রক্তাল্পতায় নাকি ভুগছেন সরস্বতী। হাসপাতালের ডাক্তার বাইরের একগাদা ওষুধ লিখে দিয়েছেন। এখনও সে সব ওষুধ কেনাই হয় নি। মিতালী টেঁপীর কথার কোন জবাব দেয় না। চুপ করেই থাকে। বিছানায় শুয়ে ভাবতে থাকে। অতঃ কিম ! প্রবীর হাজরা না সন্তোষ বোস। কিন্তু সন্তোষ বোসের চাইতে কি প্রবীর হাজরাই ভাল নয়। প্রবীর হাজরা—

এক দিন তো তার সঙ্গে মিতালীর রীতিমত একটা হৃদ্যতাই ছিল। শুধু হৃদ্যত কেন, তাকে ঘিরে কি সে মনোরম এক স্বপ্নও রচনা করে নি। আজই না হ ঘৃণায় মনটা প্রবীর হাজরার প্রতি তার বিষিয়ে উঠেছে। উপায় নেই। মনের দাম আজ আর কেউ দেবে না। নিষ্ঠুর উলঙ্গ প্রয়োজন, তার দাবি অনেক অনেক বেশী। সেখানে অনুভূতি অর্থহীন। লজ্জা বিড়ম্বনা মাত্র। সংশয় মানেই মূর্খতা।

হঠাৎ এক সময় চমকে ওঠে মিতালী। অন্ধকারে কখন এক সময় যে তার দু' চোখের কোল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু নেমে এসেছে তা সে টেরও পায় নি। এবং কাঁদতে কাঁদতেই বুঝি এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে মিতালী।

পরের দিন সকালে সবার আগে ঘুম ভাঙে মিতালীর। নীচে নেমে এসে উনুনে আগুন দেয়। কালকের রাত্রেই সে ঠিক করে রেখেছিল, স্যুটকেসের তলায় অনেক দিন আগেকার একটা পাঁচ টাকার নোট ছিল, সেটা দিয়েই আজকের ব্যবস্থা করা যাবে। চায়ের জল চাপিয়ে সবে মিতালী বাইরে এসেছে, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। এত সকালে আবার কে এল! দরজা খুলতেই সামনে হাবুলকে দেখতে পায় মিতালী।

কি ব্যাপার হাবুল, এত সকালে?

সুখবর আছে বড়দি।

সুখবর!

হ্যাঁ, চলুন ভিতরে বলছি। তার আগে এই ঠোঙা দুটো ধরুন।

কি আছে এতে?

টেঁপী কাল বলেছিল, চা চিনি নাকি নেই।

এসো।

হাবুলেরই আনা চা ও চিনি দিয়ে চা করে মিতালী নিজে এক কাপ চা নেয়, হাবুলকে এক কাপ দেয়।

কাল আমি এখান থেকে ফিরে সন্তোষবাবুর ওখানে গিয়েছিলাম। প্রয়োজনটা যখন আমাদের, বলেই ফেললাম কথাটা। সব শুনে ভদ্রলোক আজই নিয়ে যেতে বলেছেন আপনাকে।

চা খেতে খেতে হাবুল এক সময় কথাটা বলে।

কিন্তু কি চাকরি?

অন্য কোন চাকরি নয়। যে চাকরি করছিলেন সেই চাকরিই।

তার মানে?

আপনাদের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সিং যে সন্তোষবাবুর বিশেষ পরিচিত। তার নামেই চিঠি দিয়ে দেবেন।

মিতালী চুপ করে থাকে।

তা হলে আপনি আজ বেলা দুটো নাগাদ ওর বাড়িতে যাবেন।

তুমি যাবে না?

না। বলে দিয়েছেন আপনি একা গেলেই হবে।

কিন্তু···

কোন ভয় নেই আপনার। যান না আপনি।

হাবুল আর দাড়াল না।

চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। শূন্য কাপটা নামিয়ে রেখেই চলে গেল।

অনেক চিন্তা করল মিতালী। যাবে কি যাবে না। শেষ সম্বল পাঁচটি টাকাও আজ শেষ হয়ে গেল। তার পর?

প্রবীর, প্রবীর—তোমারই শেষ পর্যন্ত জয় হল। হেরে গেল মিতালী, হেরে গেল।

কিন্তু কেন হেরে যাবে মিতালী?

একা মানুষ সে: যদি আজ এখান থেকে বেরিয়ে চলে যায়, একটা না একটা কিছু উপায় সে করে নিতে পারবে না? পারবে, খুব পারবে।

আবার মনে হয় এতগুলো অসহায় মুখ তারই দিকে চেয়ে আছে। স্বার্থ-পরের মত এদের সব ভাসিয়ে দিয়ে সে চলে যাবে? মিতালীর সমস্ত শুভ বুদ্ধি যেন তার পথ রোধ করে দাড়ায়।

ঘড়ির কাটাটা ঠিক এগিয়ে চলেছে নির্দিষ্ট দুইয়ের ঘরে। দুটো বাজতে আর খুব বেশী দেরি নেই। পাশের ঘরে কাকীমা বিশ্রী ভাবে কাসছেন। ক দিন থেকে ঐ কাসিটা আবার দেখা দিয়েছে সরস্বতীর।

না, আর মনের ভাবালুতাকে অন্যায় প্রশ্রয় দেওয়া নয়। নিষ্ঠুর প্রয়োজন, সংসারের নিষ্ঠুর দাবি, বেঁচে থাকবার অতি সহজ কথাগুলো তার দিকে যেন চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। যেতে তাকে হবেই। মনকে শক্ত করেই যেন মিতালী দৃঢ় পদে ঘরে ঢুকে কাপড়টা বদলে একটা ধোয়া পরিষ্কার কাপড় পরে নিল। মাথার চুলটা একটু ঠিক করে নিল। সিঁড়ির ধার থেকে জুতোটা পায়ে

পায়ে গলিয়ে আন্নাকে সদরটা দেবার জন্ত ডেকে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ল। গলির শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড গেটওয়ালা চারতলা বাড়িটাই সন্তোষ ঘোসের বাড়ি। এগিয়ে চলল মিতালী সেই দিকে।

কিন্তু গেটের কাছাকাছি এসে মিতালীর মনে হল, এ কোথায়, কার কাছে সে চলেছে? সেই চাকরিই সে ফিরে পাবে! কিন্তু সেই চাকরিতেই যদি ফিরে যেতে হয় তো সন্তোষ বোসের সুপারিশ নিয়ে কেন? তার চাইতে সোজা সে প্রবীরের কাছেই তো যেতে পারে। প্রবীর, হ্যাঁ, প্রবীরের কাছেই সে যাবে। ঘুরে দাঁড়াল মিতালী।

আজ রবিবার। অফিস নেই। প্রবীর নিশ্চয়ই তার হোটেলেই আছে। হাতের ব্যাগটা হাতড়ে দেখল, আনা পাঁচেক পয়সা অবশিষ্ট আছে ব্যাগে। আর চিন্তা করে না মিতালী। দ্রুত ট্রাম রাস্তার দিকে হেঁটে চলে।

প্রবল একটা নেশায় আচ্ছন্ন হয়েই যেন মিতালী ট্রাম থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের সামনে এসে হাজির হয়। এবং মাথাটা নীচু করে হোটেলের দরজাপথে ভিতরে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই কার কণ্ঠস্বরে যেন মিতালী থমকে দাঁড়ায়।

একি, মিতালী দেবী!

কে?

চিনতে পারছেন না আমি করণ সিং।

করণ সিং? মৃদু আত্মগত কণ্ঠে যেন কথাটা উচ্চারণ করে মিতালী।

হ্যাঁ, করণ সিং। চিনতে পারছেন? এ সময়ে এখানে?

মিতালীর চোখের কোল দুটো যেন সহসা জলে ঝাপসা হয়ে যায়। সমস্ত চেতনার উপর যেন একটা কুয়াশার ঘোর তাকে মুহূর্তের জন্য আচ্ছন্ন করে ফেলে, মাথাটা কেমন ঘুরে ওঠে।

টলে পড়ে যাচ্ছিল বুঝি মিতালী, কিন্তু তার আগেই বলিষ্ঠ দুটি বাহু বাড়িয়ে চোখের পলকে করণ সিং মিতালীকে ধরে ফেলে, কি হল কি হল?

মিতালীর তখন জ্ঞান নেই।

করণ সিং মিতালীর হতচেতন দেহটা বুকে তুলে নিয়ে সোজা লিফটের দিকে এগিয়ে যায়। মাত্র সেই দিনই সকালে করণ সিং অফিসেরই একটা জরুরী কাজে কলকাতায় এসে পৌঁছেছিল। এবং ঐ হোটেলেই উঠেছিল।

মিতালীকে নিয়ে করণ সিং হোটেলে তারই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

চোখে মুখে জল দিয়ে পাখার হাওয়ার নীচে শুইয়ে দিতেই কিছুক্ষণ পরে মিতালী চোখ মেলে তাকায়।

করণ সিং মিতালীর মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে।

করণ সিংয়ের চোখের দিকে তাকায় মিতালী।

সেখানে শুধু আশ্বাসই নয়, সান্ত্বনা আর বিশ্বাসও যেন রয়েছে।

কেমন আছ এখন ?

ভাল।

না—না—উঠো না—আর একটু শুয়ে থাক।

কিন্তু মিতালী তার কথায় কান দেয় না। উঠে বসেছে ততক্ষণে।

আরও কিছুক্ষণ পরে।

করণ সিং শুধায়, কিন্তু এখানে এ সময় কোথায় এসেছিলে ?

তোমার কাছে! বিস্ময়ে তাকায় করণ সিং যেন মিতালীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ।

সত্যি বলছ!

বাঃ মিথ্যা বলব কেন!

কিন্তু আমিও যে তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

আমার কাছে!

হ্যাঁ।

কেন ?

অনেক কথা বলবার ছিল যে তোমাকে আমার।

কি কথা ?

মা এসেছেন আমার সঙ্গে।

মা!

হ্যাঁ, আমার মা।

কোথায় তিনি ?

টালিগঞ্জে আমার বোনের বাড়িতে উঠেছেন। কিন্তু কেন এসেছেন জান ?

কেন ?

তাঁর ছেলের কথা তাঁর বিশ্বাস হয় না, তাই তিনি নিজে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

কি কথা ?